Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας Ἀθανάσιος Α’ (আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ সাধু আথানাসিউস)

Κατὰ Ἑλλήνων (গ্রীকদের বিপক্ষে)

Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας αὐτοῦ (বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ও আপন দেহের মাধ্যমে আমাদের মাঝে তাঁর আগমন বিষয়ক আলোচনা)

Ρρὸς Μαρκελλίνον εἰς τὴν Ἑρμηνείαν τῶν Ψαλμῶν (সামসঙ্গীত ব্যাখ্যা বিষয়ে মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র)

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου ρατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου (আমাদের পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী ও কর্মকাণ্ড)

লাতিন পাঠ্য : গ্রীকদের বিপক্ষে, বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ, মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র, পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2023

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : June 30, 2023

Version 1.0.0 (June 30, 2023)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক’রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

সাধু আথানাসিউস

গ্রীকদের বিপক্ষে

বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র

পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

প্রাচীন মিশরের মানচিত্র

ভূমিকা

- সাধু আথানাসিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী
- আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পদে সাধু আথানাসিউস
- সাধু আথানাসিউসের লেখাসমূহ

গ্রীকদের বিপক্ষে

বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র

পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)

যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)

গণনা (গণনা পুস্তক)

দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)

১ শামু (শামুয়েল ১ম পুস্তক)

১ রাজা (রাজাবলি ১ম পুস্তক)

২ রাজা (রাজাবলি ২য় পুস্তক)

সাম (সামসঙ্গীত-মালা)

প্রবচন (প্রবচনমালা)

উপ (উপদেশক)

প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)

সিরা (বেন-সিরা)

ইশা (ইশাইয়া)

যেরে (যেরেমিয়া)

দা (দানিয়েল)

হো (হোশেয়া)

হাবা (হাবাকুক)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)
গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)
এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)
ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)
কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)
১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)
২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)
তীত (তীতের কাছে পলের পত্র)
হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ভূমিকা

সাধু আথানাসিউসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু আথানাসিউস মিশরে অবস্থিত আলেক্সান্দ্রিয়ায় আনুমানিক ২৯৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ও তাঁর ছেলেবেলা সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য না থাকলেও তবু এ

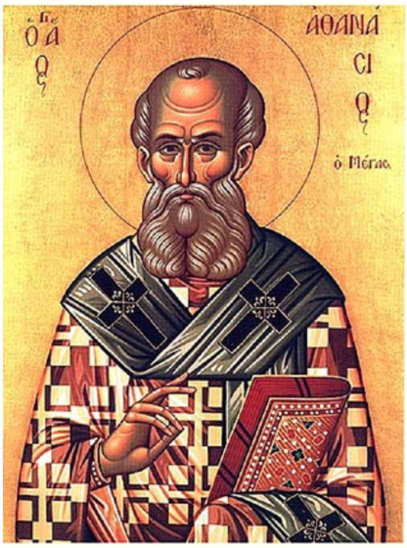

নিশ্চিত যে, কোন প্রকারের উচ্চশিক্ষা লাভ না করলেও তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত বলে পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট গুণাবলির অধিকারী ও গভীরতম ভক্তির মানুষ, তা এতে প্রমাণিত যে, আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দার, আনুমানিক ৩১২ সালে, তাঁকে আগে পরিসেবক পদে, ও পরে নিজের ব্যক্তিগত সচিব পদে উন্নীত করেন। ৩২৮ সালে বিশপ আলেক্সান্দারের মৃত্যু হলে আথানাসিউস আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পদে নিযুক্ত হন ও সাথে সাথে আলেক্সান্দ্রিয়ায় ও বিদেশেও তাঁর যথেষ্ট সমস্যা শুরু হয়।

এসমস্ত সমস্যা বুঝবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটে বিষয় উল্লেখযোগ্য যা সেই চতুর্থ শতাব্দী চিহ্নিত করে, তথা, (১) ৩১৩ সালে রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুসের জারীকৃত বিধিনির্দেশ যা অনুসারে খ্রিষ্টধর্ম রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ ধর্ম বলে পালনীয়; (২) আরিউসের ভ্রান্তমত; ও (৩) ৩২৫ সালে অনুষ্ঠিত নিকেয়া (আজকালের তুরস্কে অবস্থিত ইজ্‌নিক) মহাসভা।

সম্রাট কনস্তান্তিনুসের বিধিনির্দেশ

কনস্তান্তিনুস ৩০৬ সালে রোম-সম্রাট পদ গ্রহণ করেন। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদিকাল থেকে সেসময় পর্যন্ত খ্রিষ্টমণ্ডলী রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ বলে গণ্য না হওয়ায় বারে বারে এমন কড়া নির্যাতন ভোগ করে যে নির্যাতনে অগণন খ্রিষ্টবিশ্বাসী খ্রিষ্টবিশ্বাস ত্যাগ না করার কারণে সাক্ষ্যমর হয়; এ বহুসংখ্যক সাক্ষ্যমরদের মধ্যে প্রেরিতদূত পিতর ও পল, আন্তিওখিয়ার বিশপ সাধু ইগ্নাসিউস, সাধু পলিকার্প, সাধু ইউস্তিনুস, সাধু ইরেনেউস, সাধু চিপ্রিয়ানুস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এদিকে খ্রিষ্টিয়ানদের প্রতি কনস্তান্তিনুসের ব্যবহার অন্য রকম, সম্ভবত এই কারণেও যে, নিজে পৌত্তলিক হলেও তাঁর মা হেলেনা (সাধ্বী হেলেনা) খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন। ৩১০ সালে মাক্সেন্তিউস নামক তাঁর এক সেনাপতি রাজদ্রোহ করে নিজেকে রোম-সম্রাট ঘোষণা ক'রে দু' বছর ধরে কনস্তান্তিনুসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে, যে পর্যন্ত ২৮শে অক্টোবর ৩১২ সালে কনস্তান্তিনুস রোমের মিল্বিয় সেতুতে তাকে অবশেষে পরাভূত করেন। এ শেষ সংগ্রাম উপলক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়টা হল এ যে, কনস্তান্তিনুসের সৈন্যদের ঢালগুলো অচেনা একটা চিহ্নে (☧) চিহ্নিত ছিল। চিহ্নটার

অর্থই 'খ্রিষ্ট' যেহেতু সেই দুই অক্ষর হল গ্রীক ভাষায় খ্রিষ্ট নামের (ΧΡΙΣΤΟΣ -খ্রিস্তোস) প্রথম দুই অক্ষর। সেকালের ইতিহাস-লেখক এউসেবিউসের বর্ণনা অনুসারে, কনস্তান্তিনুস দুপুর বারোটায় আকাশে, সূর্যের উপরে, ক্রুশের উজ্জ্বল এমন বিজয়-চিহ্ন দেখতে পান যাতে 'In hoc signo vinces' (ইন্ হক্ সিগ্নো বিঞ্চেস -এই চিহ্নেই তুমি জয়ী হবে) লেখা ছিল। সেই রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, স্বয়ং খ্রিষ্ট সেই একই স্বর্গীয় চিহ্ন বহন ক'রে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে সেই জয়চিহ্ন সৈন্য-পতাকা হিসাবে ব্যবহার করতে বলেন। কনস্তান্তিনুস তেমনটাই করে জয়ী হন ও সংগ্রাম শেষে রোমে প্রবেশ করে রীতিমত নির্দিষ্ট পৌত্তলিক মন্দিরে ধন্যবাদ বলি উৎসর্গ করতে না যাওয়ায় জনগণকে দেখান, তিনি খ্রিষ্টবিশ্বাসী। কয়েক মাস পরে, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ৩১৩ সালে তিনি উত্তর ইতালির মিলান শহরে এমন বিধিনির্দেশ জারি করেন যা অনুসারে খ্রিষ্টধর্ম রোম-সাম্রাজ্যে বৈধ ও পালনীয় বলে জারীকৃত।

সুতরাং, ১৮ বছর বয়স থেকে আথানাসিউস অন্যান্য খ্রিষ্টিয়ানদের সঙ্গে প্রকাশ্যে ও নিরাপদে খ্রিষ্টবিশ্বাস পালন করতে পারেন।

আরিউসের ভ্রান্তমত ও নিকেয়া মহাসভা

আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর প্রবীণসভার আরিউস নামক একজন সদস্য পুরোহিত এমন ধারণা প্রচার করে এসেছিলেন যা অনুসারে ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট অসৃষ্ট পিতার সঙ্গে সহ-চিরকালীন নন, কেননা পুত্র হওয়ায় নিম্ন স্তরের ঈশ্বরত্বের অধিকারী বিধায় খ্রিষ্ট সৃষ্ট হয়েছিলেন, অনাদিও ছিলেন না যেহেতু ঈশ্বর-জনিত ছিলেন। অজনিত বলে কেবল পিতা ঈশ্বরই স্বীকার্য। ফলত খ্রিষ্টের ভূমিকা ছিল পিতা ও জগতের মধ্যবর্তী ভূমিকা। তেমন ভ্রান্তমতের সম্মুখীন হয়ে মিশরীয় মণ্ডলী দু'ভাগে বিভক্ত হয়, এমনকি সমস্যাটা মিশরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। তেমন অবস্থায়, খ্রিষ্টমণ্ডলীর রক্ষাকর্তা বলে রোম-

সম্রাট কনস্তান্তিনুস ৩২৫ সালে বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত নিকেয়া শহরে আন্তমণ্ডলিক একটা মহাসভা আহ্বান করেন। তেমন মহাসভায় আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দারের সঙ্গে তাঁর সচিব হিসাবে আথানাসিউসও যোগ দেন। সেই মহাসভায় আরিউসের ভ্রান্তমত দণ্ডিত হয় ও 'নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র' বলে পরিচিত সেই বিশ্বাস-সূত্র জারীকৃত হয় যেখানে খ্রিষ্ট 'পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী' বলে ঘোষিত হন। কিন্তু মহাসভা শেষে যখন সকল বিশপ নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশে ফিরে যান, তখন দেখা যায় যে, মণ্ডলীতে আরিউসের সমর্থনকারীরা মহাসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত নয়।

নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র :

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα,
πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·

আমরা এক-ঈশ্বরে, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি ;

2. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ,

এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের পুত্র সেই যিশুখ্রিষ্টে [বিশ্বাস করি],

γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς μονογενῆ, τοὐτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός,

যিনি পিতা থেকে, তথা পিতার সত্তা থেকে একমাত্র জনিত [পুত্র],

Θεὸν ἐκ Θεοῦ, Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,

ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, প্রকৃত ঈশ্বর থেকে প্রকৃত ঈশ্বর ;

γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,

তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ;

δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,

স্বর্গে ও মর্তে যা কিছু রয়েছে তা সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,

3. τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα,

মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি অবরোহণ করলেন ও মাংস হলেন ও মানুষ হলেন,

4. παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,

তিনি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন, ও তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন,

ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

5. Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

এবং আমরা পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]।

এতে আমরা দেখতে পাই, নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র ঐশতাত্ত্বিক ভাষা ব্যবহার করে, ও সাধু আথানাসিউস নিজের ঐশতাত্ত্বিক লেখায় (যেমন 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে' লেখায়) সেই ভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু, যেমন উপরে বলা হয়েছে, 'গ্রীকদের বিপক্ষে' ও 'বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ' লেখাদ্বয়ে তিনি সেই কঠিন ভাষা ব্যবহার না করে খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন শ্রোতাদের কাছে বোধগম্য হবার জন্য সরল-সোজা ভাষা ব্যবহার করেন, উদাহরণ স্বরূপ, বাণী 'মাংস হলেন' এর বদলে তিনি 'বাণী মানব-স্বরূপ ধারণ করলেন' কথাই ব্যবহার করেন।

যাই হোক, নিকেয়া মহাসভার পরে, ৩৮১ সালে, কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভায় নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র পরিবর্ধিত হয়; সেটা এমন বিশ্বাস-সূত্র যা আজকালেও সকল মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত ও ব্যবহৃত; তথা সেই বিশ্বাস-সূত্র যা নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্র বলে পরিচিত, ও যা সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষায় সন্নিবিষ্ট রয়েছে।

আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পদে সাধু আথানাসিউস

৩২৮ সালে, আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আলেক্সান্দারের মৃত্যুতে তাঁর উত্তরসূরী হিসাবে আথানাসিউসকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি নিজের ধর্মপ্রদেশ চারদিকে ভ্রমণ করে দৃঢ়তার সঙ্গে নিকেয়া মহাসভার শিক্ষা কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু আরিউস-পন্থীরা বিরোধিতা ক'রে তাঁর বিরুদ্ধে বারে বারে বিশ্বাস সংক্রান্ত নানা মিথ্যা অভিযোগ সম্রাটের কাছে ও পোপ মহোদয়েরও কাছে উপস্থাপন করার ফলে আথানাসিউস নিজের ধর্মপ্রদেশ থেকে পাঁচবার বিচ্যুত হয়ে প্রবাসী হিসাবে বিদেশে সময় কাটাতে বাধ্য। অবশেষে, কেবল ১লা ফেব্রুয়ারী ৩৬৬ সালেই তিনি আলেক্সান্দিয়ায় ফিরে এসে নিজের জীবনকালের শেষ সাত বছর শান্তিতে কাটাতে পারেন। তিনি ২রা মে ৩৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন; তাই যদিও বিশপ হিসাবে তিনি সর্বমোট ৪৬ বছর কাটান, তবু নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে বা মিশরের মরুবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে লুকোনো অবস্থায় ১৭ বছর কাটান। খ্রিষ্টবিশ্বাস নিকেয়া মহাসভা অনুযায়ী অক্ষুণ্ন ও নিখুঁত রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর জীবনকালীন অদম্য প্রচেষ্টার জন্য তিনি সেকাল থেকে 'মণ্ডলীর স্তম্ভ' ও 'সদ্‌গুণের আদর্শ' বলে অভিহিত। তিনি খ্রিষ্টমণ্ডলীর আচার্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সাধু আথানাসিউসের লেখাসমূহ

যদিও একথা স্বীকার্য যে, আথানাসিউস দর্শনশাস্ত্র ভিত্তিক মনা মানুষ ছিলেন না ও নিজের লেখায় একই বিষয়ে বারে বারে পুনরাবৃত্তি করেন, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, বাইবেল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট গভীরতার অধিকারী ছিলেন, নিজের মেষপালের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খুবই চিন্তিত ছিলেন, ও সেকালের সন্ন্যাস জীবনের শক্তিশালী পক্ষসমর্থক ছিলেন।

তাঁর লেখাসমূহের মধ্য থেকে এ পুস্তকে উপস্থাপিত '**গ্রীকদের বিপক্ষে**' ও '**বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ**' লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তকের এমন দুই খন্ড বলে বিবেচনাযোগ্য যা তিনি খ্রিষ্টিয়ানদের জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের তখনও বিপুল পৌত্তলিকদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন। লেখাদ্বয় সম্ভবত তাঁর প্রথম নির্বাসনকালে, আনুমানিক ৩৩৪ সালে, লেখা হয়। 'গ্রীকদের বিপক্ষে' লেখায় তিনি প্রতিমাপূজার যুক্তি খণ্ডন করতে অভিপ্রেত; ও 'বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ' লেখায় তিনি পতিত মানুষের জন্য খ্রিষ্ট-সাধিত মুক্তিকর্মের কথা উপস্থাপন করেন; তেমন মুক্তিকর্ম বিষয়ে দু'টো দিক লক্ষণীয়, তথা: (১) খ্রিষ্ট মানুষের আদিপাপের ফল সেই দৈহিক মৃত্যুর উপর জয়ী হন, ও (২) নিজের মৃত্যুতে তেমন বিজয় লাভ ক'রে তিনি মানুষের প্রাণ ও আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনেন যাতে মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার ফলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি ক'রে ও উত্তরাধিকার হিসাবে অমরতা প্রাপ্ত হয়ে ঐশ্বরিক হয়ে উঠতে পারে। এসমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঐশতাত্ত্বিক ভাষা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে সরল-সোজা ভাষায় খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষকে খ্রিষ্টবিশ্বাসে আকর্ষণ করতে অভিপ্রেত।

এ লেখাদ্বয় ছাড়া তিনি পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যাধর্মী নানা পুস্তক, বিশেষভাবে '**সামসঙ্গীত ব্যাখ্যা বিষয়ে মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র**' নামক একটা পুস্তক, পাস্কা উপলক্ষে বেশ কয়েকটা পত্র, ও 'আরিউসপন্থীদের বিপক্ষে উপদেশ' নামক তিনটে পুস্তক লেখেন। এই উপদেশগুলোতে তিনি নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্রকে ভিত্তি করে আরিউসপন্থীদের ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করে মণ্ডলীর প্রকৃত ও নির্ভুল শিক্ষা উপস্থাপন করেন।

কিন্তু তাঁর যে লেখা সেসময় থেকে বহু যুগ ধরে তাঁর নাম স্মরণীয় করে আসছে, তা হলো '**আমাদের পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী ও কর্মকাণ্ড**' নামক একটা পুস্তক যা দ্বারা তিনি তাঁর সময়কালীন সন্ন্যাসী সাধু আন্তনির জীবনের আকর্ষণীয় ও গঠনমূলক বিবরণী দেন।

গ্রীকদের বিপক্ষে

[আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ আমাদের পবিত্র পিতা আথানাসিউস লিখিত ‘গ্রীকদের বিপক্ষে’]

‘গ্রীকদের বিপক্ষে’ ও **‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’** লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তকের এমন দুই খণ্ড বলে বিবেচনাযোগ্য যা তিনি খ্রিষ্টিয়ানদের জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের তখনও বিপুল পৌত্তলিকদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন।

‘গ্রীকদের বিপক্ষে’ লেখায় সাধু আথানাসিউস প্রতিমাপূজার যুক্তি খণ্ডন করতে অভিপ্রেত।

যে শব্দ ও বাক্যগুলো বর্গাকার বন্ধনীতে অন্তর্ভুক্ত (যেমন ‘[দুর্বল] আখিল্লেস’ ইত্যাদি), সেই শব্দ ও বাক্যগুলো সাধু আথানাসিউসের লেখায় নেই; সেগুলো পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থেই যোগ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭

১। ভূমিকা: খ্রিষ্টতত্ত্ব বিষয়ে, বিশেষভাবে ক্রুশ বিষয়েই পক্ষসমর্থন

[১] ধর্ম সংক্রান্ত ও বিশ্ব বিষয়ে সত্য সংক্রান্ত জ্ঞান যেহেতু আপনা আপনি অর্জন করা যায়, সেজন্য সেই জ্ঞান সম্পর্কে তত মানবীয় শিক্ষা দরকার হয় না। কেননা সেই জ্ঞান প্রায়ই দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের মাধ্যমে নিজের বিষয়ে স্পষ্ট শিক্ষাদান করে ও খ্রিষ্টের শিক্ষা দ্বারা সূর্যের চেয়ে আরও উজ্জ্বলতর ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। [২] তা সত্ত্বেও, যেহেতু তুমি এবিষয়ে কিছুটা শুনতে ইচ্ছা কর, সেজন্য, হে সুখী বন্ধু, এসো, আমাদের সাধ্যমত আমরা খ্রিষ্টবিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা উপস্থাপন করি। তুমি পবিত্র শাস্ত্রের বাণী থেকে এসমস্ত আবিষ্কার করতে পারলেও তবু অন্যান্যদের কাছ থেকেও

কিছুটা শুনতে আগ্রহী। [৩] অবশ্যই, সত্যকে উপস্থাপন ক্ষেত্রে পবিত্র ও ঐশঅনুপ্রাণিত শাস্ত্র যথেষ্ট, কিন্তু তাছাড়া আমাদের ধন্য শিক্ষাবিদগণের বহু লেখা রয়েছে যা ঠিক এই লক্ষ্যে লিখিত হয়েছিল, আর যে কেউ সেগুলো পড়ে, সে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন না কোন ধারণা অর্জন করবেই, ও সে যে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছা করে সেই লেখাগুলো পড়ে সেই জ্ঞান পেতে পারবে। কিন্তু, যেহেতু সেই শিক্ষাবিদগণের লেখা আমাদের হাতে নেই, সেজন্য আমরা সেই শিক্ষাবিদগণের কাছ থেকে যা কিছু শিখেছিলাম (আমি ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টে বিশ্বাসের কথাই বলছি), তা তোমার জন্য লিখিত আকারেই আমাদের উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যাতে করে কেউই আমাদের তত্ত্বসমূহ মূল্যহীন গণ্য না করে অথবা খ্রিষ্টবিশ্বাস যুক্তিহীন বলে ধরে না নেয়। এসমস্ত বিষয় গ্রীকেরা ভ্রান্তিমূলক ভাবে বর্ণনা করে ও বিদ্রূপ করে, ও তেমনটা ক'রে তারা আমাদেরও যথেষ্টই বিদ্রূপ করে, যদিও আপত্তি হিসাবে উপস্থাপন করার মত খ্রিষ্টের ক্রুশ বাদে তাদের কিছুই নেই। বিশেষভাবে এক্ষেত্রেই একজন তাদের অসংবেদনশীল মনোভাব ক্ষমার চোখে দেখবে, কেননা ক্রুশের নিন্দা করায় তারা এমনটা দেখে না যে সেই ক্রুশের পরাক্রম গোটা জগৎকে পরিপূর্ণ করেছে ও সেই ক্রুশের মাধ্যমে ঈশ্বরজ্ঞানের ফলাফল সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে। [৪] কেননা তারা যদি তাঁর ঈশ্বরত্ব বিষয়ে গভীর ভাবে মন দিত, তাহলে এত মহৎ চিহ্নকে বিদ্রূপ করত না বরং এ মেনে নিত যে, তিনি হলেন বিশ্বের ত্রাণকর্তা, ও ক্রুশটা সৃষ্টির বিনাশ নয়, তার প্রতিকার হয়ে উঠেছে। [৫] কেননা ক্রুশ-প্রতিষ্ঠার পরে যখন সমস্ত প্রতিমাপূজা উলট-পালট হয়ে গেছে ও সেই চিহ্ন দ্বারা অপদূতদের সমস্ত কর্মকাণ্ড বিতাড়িত হল ও কেবল খ্রিষ্টই হয়ে উঠলেন উপাসনার পাত্র ও তাঁর দ্বারা পিতা জ্ঞাত হয়েছেন ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের লজ্জায় ফেলে দেওয়া হয়েছে ও সেইসঙ্গে প্রতিটি দিন তিনি অদৃশ্যভাবে নতুন নতুন মানুষদের মন নিজের দিকে ফেরান, তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে একজন যুক্তিসঙ্গত ভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারত, এসমস্ত কিছু কেমন করে এখনও মানবীয় যুক্তি অনুসারে বিবেচিত? কেন এমনটা স্বীকার করা হয় না যে, যিনি ক্রুশে আরোহণ করলেন তিনি হলেন ঈশ্বরের বাণী ও বিশ্বের ত্রাণকর্তা? (ক)। আমি মনে করি, এই সমস্ত মানুষ সেই একই ধরনের বিভ্রম ভোগ করছে কেমন যেন একজন মেঘে লুকোনো সূর্যকে অমূল্যায়ন করে কিন্তু সে যখন দেখে সারা

বিশ্ব সূর্য দ্বারা আলোকিত হয় তখন তার আলোতে বিস্মিত হয়। [৬] কেননা আলো যেমন সুন্দর কিন্তু সেই আলোর কারণ তথা সূর্য তার চেয়ে আরও সুন্দর, তেমনি, একইপ্রকারে, গোটা জগৎ যে ঈশ্বরজ্ঞানে পরিপূর্ণ তা যখন ঐশ্বরিক বিষয়, তখন তেমন কর্মকীর্তির সাধক ও কারণও অবশ্যই হবে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বাণী।

[৭] তাই আমরা আমাদের সাধ্যমত আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনে এগিয়ে চলব। আগে অবিশ্বাসীদের অজ্ঞতা খন্ডন করব যাতে মিথ্যা খন্ডন করা হলে সত্য নিজে থেকেই নিজের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে, ও তুমিও, হে বন্ধু আমার, যেন এতে নিশ্চিত হতে পার যে, তুমি তোমার বিশ্বাস সত্যেই রেখেছ ও খ্রিষ্টকে জানা ক্ষেত্রে প্রবঞ্চিত হওনি। আমি মনে করি, তোমার মত খ্রিষ্টপ্রেমিক একজনের সঙ্গে খ্রিষ্ট বিষয়ে কথা বলা উপযুক্ত, কেননা আমি এতে নিশ্চিত যে, তুমি তাঁকে জানা ও বিশ্বাস করা অন্য কিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে কর।

২। সৃষ্টিকালে অনুগ্রহে ও ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষকে প্রতিষ্ঠা

[১] অনিষ্ট যে আদি থেকেই ছিল তা নয়, এমনকি, এখনও পবিত্রজনদের (ক) মধ্যে অনিষ্ট নেই ও তাদের স্বরূপেও বিদ্যমান নয়। কিন্তু মানুষই পরবর্তীকালে অনিষ্টের কথা ভাবতে লাগল ও এমনটা কল্পনা করল যে, অনিষ্ট তাদের নিজেদের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী। সেসময় থেকে তারা যা শূন্য তা শূন্য নয় বলে গণ্য ক'রে নিজেদের জন্য প্রতিমাপূজাও পরিকল্পনা করল। [২] কেননা যিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও মানব ধারণার অতীত, সেই বিশ্বনির্মাতা ও সকলের রাজা মঙ্গলময় ও উত্তম হওয়ায় তাঁর আপন বাণী আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা মানবজাতিকে নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়লেন, ও মানুষকে তাঁর নিজের অনন্ততা বিষয়ে একটা ধারণা ও জ্ঞান দান ক'রে এমনটা করলেন যেন তাঁর সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য (খ) গুণে মানুষ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ও বুঝতেও পারে, যাতে করে যতদিন মানুষ তেমন সাদৃশ্য রক্ষা করে ততদিন সে যেন তার ঈশ্বর বিষয়ক ধারণা ত্যাগ না করে বা পবিত্রজনদের সঙ্ঘ থেকে সরে না যায়, বরং যিনি তার উপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন তাঁর সেই অনুগ্রহ নিজের অধিকারে রেখে ও পিতার বাণী যে বিশেষ অধিকার তাকে দিয়েছিলেন তাও নিজের অধিকারে রেখে সে যেন সুখী ও সত্যিকারে ধন্য ও অমর জীবন যাপন ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে উল্লাস করতে ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও

উপভোগ করতে পারে। কেননা যা দিছু ঐশ্বরিক তেমন জ্ঞান বিষয়ে কোন বাধা না থাকায় মানুষ, যাঁর সাদৃশ্যে নিজেই গড়া, নিজের শুদ্ধতা গুণে পিতার প্রতিমূর্তি সেই ঈশ্বরের বাণীর উপরে অবিরতই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ও বিশ্বের প্রতি তাঁর পূর্বজ্ঞান উপলব্ধি ক'রে বিস্ময়ে পূর্ণ হয়, কেননা মানুষ ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে ও দৈহিক অনুভূতির চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে রয়েছে ও নিজের মনের প্রভাব দ্বারা সেই দিব্য ও উপলব্ধ বিষয় আঁকড়িয়ে ধরে যা স্বর্গে রয়েছে। [৩] কেননা যখন মানুষের মন দেহের সঙ্গে কোন সংস্পর্শ রাখে না ও বহিরাগত দৈহিক কামনা-বাসনার সঙ্গে মিশ্রিত বলতে তার মনের কিছু থাকে না, কিন্তু মন যেভাবে আদিতে গড়া হয়েছিল সেইভাবে নিজের মধ্যে বসবাস ক'রে সেই সমস্ত কিছুর চেয়ে একেবারে ঊর্ধ্বতর অবস্থায় অবস্থান করে, তখন মন ইন্দ্রিয়গুলো ও মানবীয় সমস্ত কিছু অতিক্রম করে জগতের উপরে উঁচুতে আরোহণ করে ও বাণীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাণীর মধ্যে বাণীর পিতাকেও দেখে, তাঁর সংদর্শনে উল্লাস করে, ও তাঁর আকাঙ্ক্ষায় নবায়িত হয়, [৪] সেইভাবে যেভাবে পবিত্র শাস্ত্র এমনটা বলে যে, সেই যে প্রথম মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল ও হিব্রু ভাষায় যার নাম আদম, সেই মানুষ লজ্জাহীন সৎসাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের উপর মন নিবদ্ধ রাখত ও পবিত্রজনদের সঙ্গে উপলব্ধ বাস্তবতা-দর্শনে জীবনযাপন করত ; এমন বাস্তবতা যা সেই স্থানে উপভোগ করত যা পবিত্র মোশি প্রতীকমূলক ভাবে পরমদেশ বলে অভিহিত করেছিলেন। বাস্তবিকই প্রাণের শুদ্ধতা এমনটা করে যাতে প্রাণ নিজে থেকে ঈশ্বরের উপরেও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারে, যেইভাবে প্রভু নিজেই বললেন, *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে* (গ)।

৩। মানুষের পতন

[১] তাই, যেমন বলেছি, স্রষ্টা মানবজাতিকে এইভাবে গড়লেন, ও এমনটা ইচ্ছা করলেন মানবজাতি সেইভাবে থাকবে। কিন্তু শ্রেয়তর বিষয়গুলো অবজ্ঞা করে ও সেগুলোকে আঁকড়িয়ে রাখা থেকে সরে গিয়ে মানুষ বরং যা কিছু তার নিকটস্থ ছিল তারই অন্বেষণ করল। [২] কিন্তু যা তার নিকটস্থ, তা ছিল দেহ ও দেহের ইন্দ্রিয়গুলো ; ফলে তারা নিজেদের মনকে উপলব্ধ বিষয় থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কথা ভাবতে লাগল। এবং নিজেদের কথা ভাবতে ভাবতে ও দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলোকে আঁকড়িয়ে ধরতে

ধরতে তারা নিজেদের স্বার্থ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে স্বার্থপর কামনা-বাসনায় পতিত হল ও যা ঐশ্বরিক সেটার দর্শনের চেয়ে নিজেদের যা তা বেশি পছন্দ করল। এভাবে সময় নষ্ট করে ও যা কিছু নিকটস্থ তা থেকে দূরে সরে যেতে অনিচ্ছুক হয়ে তারা নিজেদের প্রাণ দৈহিক কামনা-বাসনায় বন্দি করল, সেই যে প্রাণ ইতিমধ্যে সবরকমের কামনা দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল ও দূষিত হয়েছিল; এবং অবশেষে, আদিতে ঈশ্বর থেকে যে প্রভাব পেয়েছিল তারা সেই প্রভাব ভুলে গেল।

[৩] একজন এমনটা দেখতে পারত যে, যে মানুষ প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, সেই মানুষ থেকেই এই সমস্ত কিছু শুরু হয়েছিল, যেইভাবে শাস্ত্রে সেবিষয়ে বর্ণনা দেয়। কেননা যতদিন ধরে মানুষ নিজের মন ঈশ্বরে ও তাঁর সংদর্শনে নিবদ্ধ রাখল, ততদিন ধরে সে দেহ-দর্শন থেকে নিজেকে দূরে রাখল; কিন্তু যখন সাপের প্ররোচনায় সে ঈশ্বর-উপলব্ধি ত্যাগ করল ও নিজের কথা ভাবতে লাগল, তখন তারা দু'জনেই দৈহিক কামনায় পতিত হল ও জানতে পারল, তারা উলঙ্গ ছিল, ও তা জেনে লজ্জাবোধ করল। তারা বুঝল যে, তারা যে কাপড়বিহীন, তা তত নয়, তারা বরং ঐশ্বরিক বিষয়ই বিহীন ছিল; এও বুঝল যে, তারা নিজেদের মন বিপরীত দিকে ফিরিয়েছিল; কেননা সেই প্রকৃত একমাত্রজনের তথা ঈশ্বরের চিন্তা ও বাসনা প্রত্যাখ্যান করে তারা সেই সময় থেকে দেহের নানা ও বিচ্ছিন্ন কামনা-বাসনার হাতে নিজেদের তুলে দিল। [৪] পরে, যেইভাবে সাধারণত ঘটে, প্রতিটি কামনার প্রতি ও সমস্ত কামনারও প্রতি লিপ্ত হয়ে তারা সেই সমস্ত কিছুর প্রতি এমন আসক্তিতে আসক্ত হল যে, সেই সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলবে বলে ভয় পেল। এইভাবে প্রাণ ভয়, অতঙ্ক, কামনা ও মরণশীল ভবনার আশ্রয় হল। কেননা সেসমস্ত কামনা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় প্রাণ এখন মৃত্যুকে ও দেহ থেকে বিচ্ছেদকে ভয় করে। আরও, বাসনা ক'রে কিন্তু তৃপ্তি না পেয়ে প্রাণ হত্যাকাণ্ড ও অপকর্ম করতে শিখেছে। তেমনটা যে কেমন করে ঘটে, তা আমরা সাধ্যমত দেখাব।

৪। স্বাধীন ইচ্ছার ফল: সত্য থেকে মিথ্যার প্রতি আকর্ষণ

[১] উপলব্ধ বিষয়গুলো-দর্শন ত্যাগ ক'রে ও দেহের প্রতিটি কার্যক্ষমতা অপব্যবহার ক'রে, দেহ-দর্শনে প্রীত হয়ে ও পরিতৃপ্তি উত্তম বিষয় বলে গণ্য ক'রে প্রাণ 'উত্তম' শব্দটা ভুলবশত অপব্যবহার করল ও মনে করল পরিতৃপ্তিই প্রকৃত উত্তম বিষয়।

অবস্থা এমন, কেমন যেন দুর্বলমনা একটা মানুষ যাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত একটা খড়্গ দাবি করবে একথা ভেবে যে, তেমনটা করা সঠিক ব্যবহার। [২] এবং পরিতৃপ্তি দ্বারা প্রজ্বলিত হয়ে প্রাণ নানা ভাবে ব্যবহার করতে লাগল। কেননা স্বভাবে গতি-বিশিষ্ট হয়ে প্রাণ উত্তম থেকে সরে গিয়ে থাকলেও নিজের গতিশীলতা বন্ধ করেনি; তাই প্রাণ সদ্‌গুণের পথে নয়, ঈশ্বর-দর্শনের লক্ষ্যে নয়, কিন্তু মিথ্যা বিষয় কল্পনা করার ফলে সে নিজের নানা কার্যক্ষমতা পরিবর্তিত ভাবে ব্যবহার করে ও নিজের পরিকল্পিত পরিতৃপ্তি পূরণ করার লক্ষ্যে সেই কার্যক্ষমতাসমূহ অপব্যবহার করে যেহেতু প্রাণ স্বাধীন ইচ্ছা বিশিষ্ট হয়ে গড়া, [৩] কেননা প্রাণ একাধারে ভালোর দিকেও ঝুঁকে পড়তে পারে আবার ভালো থেকে সরেও যেতে পারে। কিন্তু যখন প্রাণ ভালো ত্যাগ করে তখন এমন বিষয়ের কথা ভাবে যা ভালোর একেবারে বিপরীত, কারণ নিজের গতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে পারে না যেহেতু, যেমন উপরে বলেছি, প্রাণ স্বভাবে গাতি-বিশিষ্ট। এবং নিজের উপরে নিজের ক্ষমতা বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রাণ এমনটাও দেখে যে, সে নিজের দেহের অঙ্গগুলো উভয় দিকে তথা বাস্তব বা অবাস্তব বিষয় অন্বেষণের লক্ষ্যে সেই অঙ্গগুলো ব্যবহার করতে পারে। [৪] যা বাস্তব তা ভালো, ও যা অবাস্তব তা অনিষ্ট। যা বাস্তব তা আমি ভালো বলি কেননা যা বাস্তব তার আদর্শ সেই ঈশ্বরে রয়েছে যিনি বাস্তব; ও যা অবাস্তব তা আমি অনিষ্ট বলি কেননা যা কিছু প্রকৃত অস্তিত্বহীন তা মানুষের দর্প দ্বারা পরিকল্পিত হয়েছে। কেননা সৃষ্টিকর্ম দেখবার উদ্দেশ্যে ও সেটার সঙ্গতিপূর্ণ সুবিন্যস্ততার মাধ্যমে স্রষ্টাকে চিনে নেবার উদ্দেশ্যে যদিও দেহের চোখ থাকে; ঐশউক্তি ও প্রভুর বিধানের কথা শুনবার উদ্দেশ্যে যদিও দেহের কানও থাকে, ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে ও প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের প্রতি হাত দু'টো প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তার হাতও থাকে, তবু প্রাণ ভালো-দর্শন ও সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট কর্ম ত্যাগ করল ও সেই ক্ষণ থেকে প্রবঞ্চিত হয়ে বিপরীত দিকের দিকে চলল। [৫] তারপর, যেমন উপরে বলেছি, নিজের কার্যক্ষমতাগুলো দে'খে ও সেগুলো অপব্যবহার ক'রে প্রাণ উপলব্ধি করল, সে দেহের অঙ্গগুলোও বিপরীত দিকের দিকে চালাতে পারে; ফলে সৃষ্টিকর্ম-দর্শনের বদলে নিজের চোখ নিজের পছন্দের দিকে ফেরাল, তাতে দেখাল সে তেমন কার্যক্ষমতারও অধিকারী। এবং প্রাণ এমনটা ভাবল

যে, নিজের গতিশীলতা অনুশীলন করতে করতে সে নিজের অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখবে ও নিজের কার্যক্ষমতাসমূহ অনুশীলন করতে করতে সে কোন পাপকর্মের দায়ী হবে না; এতে প্রাণ এমনটা উপলব্ধি করল না যে সে এমনিই গতিশীল হবার জন্য নয়, কিন্তু ন্যায্য লক্ষ্যের দিকে চলার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। কেননা এজন্যই প্রেরিতদূত পল এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন, *সবই বিধেয়, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়* [ক]।

৫। অনিষ্ট সম্পর্কে

[১] কিন্তু নিজের দুঃসাহসে মানুষ যা মঙ্গলজনক ও উপযুক্ত তার দিকে নয়, কিন্তু যা নিজের আয়ত্তে ছিল তারই দিকে সম্মান দেখাল ও সেইভাবে যা কিছু বিপরীত তেমনটাই করতে লাগল। তাই মানুষ নিজের হাত বিপরীত ব্যবহারে চালিয়ে নরহত্যা করল, নিজের কান অবাধ্যতার দিকে ফেরাল ও অন্য যত অঙ্গ বৈধ প্রজননের বদলে ব্যভিচারের দিকে, জিহ্বা শালীন কথনের বদলে ঈশ্বর-নিন্দা, পরনিন্দা ও মিথ্যা শপথের দিকে, হাত আবার চুরি ও ভাই-মানুষকে আঘাত করার দিকে, ঘ্রাণ-শক্তি কামোত্তেজক সুগন্ধির দিকে, পা রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত করার দিকে [ক] ও পেট মাতলামি ও অতৃপ্তিকর পেটুকতার দিকে ফেরাল। [২] এসমস্ত কিছু হলো অনিষ্ট, ও এসমস্ত কিছু হলো প্রাণের পাপকর্ম, কিন্তু এসব কিছুর কোন কারণ নেই, একমাত্র কারণ হলো শ্রেয়তর কিছু থেকে দূরে সরে যাওয়া। ব্যাপারটা এমন, যেন কোন রথচালক দৌড় প্রতিযোগিতায় রথে উঠে যে লক্ষ্যের দিকে তার চালানো দরকার সেই লক্ষ্য অবজ্ঞা করত ও সেই লক্ষ্য থেকে সরে অন্যদিকে চালিয়ে ঘোড়াগুলো এমনিই যত দ্রুতপদে চালাত, বা অন্য কথায়, নিজের ইচ্ছাক্রমেই চালাত, এমনকি সময় সময় অন্য কারও কারও গায়ে, সময় সময় খাড়া স্থানে চালাত, সবসময়ই সেই দিকে চালিয়ে যেদিকে ঘোড়াগুলো তাকে নিয়ে যেত, একথা ভেবে যে, এভাবে চালালে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না; কেননা তার চোখ শুধু দৌড়ের দিকে নিবদ্ধ ও সে এমনটা দেখে না যে সে লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তেমনি ভাবে, ঈশ্বর অভিমুখে যে পথ, যখন প্রাণ সেই পথ থেকে সরে যায় ও দেহের অঙ্গগুলো অনুপযুক্ত ব্যবহারে ব্যবহার করে, এমনকি যখন অঙ্গগুলোই প্রাণকে তাদের ইচ্ছাকৃত পথে চালায়, তখন প্রাণ পথভ্রষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা সে এমনটা দেখে না যে, সে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও সত্যের সেই শেষ সীমা হারিয়ে

ফেলেছে যার দিকে খ্রিষ্টের বাহক সেই ধন্য পল দৃষ্টি রাখছিলেন যখন বলেছিলেন, *আমি যিশুখ্রিষ্টের ঊর্ধ্ব আহ্বানের পুরস্কারের জন্য শেষ সীমার দিকে ছুটে দৌড়োতে থাকি* (খ)। সুতরাং, যা ভালো তা নিজের লক্ষ্য ক'রে সেই পবিত্র ব্যক্তি কখনও কোন অনিষ্ট সাধন করেননি।

৬। অনিষ্ট সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা

[১] এইভাবে কোন না কোন গ্রীক মানুষ পথভ্রষ্ট হতে হতে ও খ্রিষ্টের বিষয়ে অচেতন হয়ে এমনটা বলল যে, অনিষ্ট আছে ও তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র (ক)। কিন্তু তারা এই বিষয় দু'টোতে ভ্রান্ত ছিল, কেননা হয় তারা স্রষ্টাকে সবকিছুর নির্মাতা বলে অস্বীকার করছিল, এই কারণে যে, তাদের অভিমত অনুসারে যদি অনিষ্টের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকত তবে স্রষ্টা সৃষ্টির প্রভু হতেন না; না হয়, অন্য দিকে, তিনি যে সবকিছুর স্রষ্টা তাও মেনে নিলে তারা একথা সমর্থন করতে বাধ্য হত যে, তিনি অনিষ্টেরও স্রষ্টা। কেননা তাদের মতে অনিষ্ট স্বতন্ত্র ও নিজস্ব অস্তিত্বের অধিকারী। [২] কিন্তু একথা যুক্তিহীন ও অসম্ভব, কেননা অনিষ্ট ভালো থেকে উদ্গত নয়, ও ভালোর মধ্যেও বিদ্যমান নয় ও ভালোর ফলাফলও নয়। কেননা ভালোর প্রকৃতি মিশ্রিত ধরনের প্রকৃতি হলে, অথবা ভালো অনিষ্টের কারণ হলে তবে ভালো আর ভালো নয়।

[৩] এবং সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা যারা মণ্ডলীর শিক্ষা থেকে সরে গেছে ও বিশ্বাস ক্ষেত্রে যাদের *নৌকাডুবি হয়েছে* (খ), তারাও ভুলবশত এমনটা ধরে নেয় যে অনিষ্ট নিজস্ব একটা অস্তিত্বের অধিকারী। খ্রিষ্টের সত্যকার পিতার পাশাপাশি ক'রে তারা নিজেদের জন্য আর একটা ঈশ্বরকে কল্পনা করে যে ঈশ্বর অনিষ্টের অজনিত নির্মাতা, অনিষ্টের মাথা ও সৃষ্টির সাধক (গ)। একজন এই ভ্রান্তমতপন্থীদের কথা সহজে খণ্ডন করতে পারে, হয় শাস্ত্রে অবলম্বন ক'রে, না হয় সেই একই মানব যুক্তির ভিত্তিতে যা তাদের তেমন উন্মাদ কল্পনায় চালনা করেছে। [৪] এক্ষেত্রে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্ট নিজের সুসমাচারগুলোতে মোশির উক্তি সত্য বলে সপ্রমাণ করে বলেন, *ঈশ্বর প্রভু এক* (ঘ) ও *হে পিতা, হে স্বর্গমর্তের প্রভু, আমি তোমাকে ধন্য বলি* (ঙ)। আচ্ছা, যখন ঈশ্বর এক, ও তিনি হলেন স্বর্গমর্তের প্রভু, তখন তাঁর পাশাপাশি কেমন করে আর একটা ঈশ্বর থাকতে পারে? ও তাদের সেই ঈশ্বর কোথায়? কেননা স্বর্গে ও মর্তে যা

কিছু অন্তর্ভুক্ত, সেই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর সেসমস্ত কিছ নিজের ঈশ্বরত্বে পরিপূর্ণ করে থাকেন। অথবা, কেমন করে সেই সমস্ত কিছুর অন্য এক স্রষ্টা থাকতে পারে যখন ত্রাণকর্তার উক্তি অনুসারে ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের পিতা নিজেই প্রভু? [৫] তেমনটা হতে পারে না, যদি না তারা এমনটা সমর্থন করে যে, অনিষ্টকর সেই ঈশ্বর সৃষ্টির মঙ্গলময় ঈশ্বরও হতে পারে, দু'জনেই যেন সমকক্ষ। কিন্তু তারা তেমনটা বললে, তবে দেখ তারা কেমন অভক্তির মধ্যে পতিত হয়। কেননা যারা একই প্রতাপের অধিকারী, তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ কেউই হতে পারে না, কেননা একজন অন্যজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও থাকে; দু'জনের প্রতাপ ও দুর্বলতাও সমান: প্রতাপ সমান, কেননা দু'জনে নিজ নিজ অস্তিত্বের গুণে পরস্পরের ইচ্ছার উপরে জয়ী হয়, এবং দু'জনে সমানভাবে দুর্বল, কেননা সবকিছু তাদের ইচ্ছাক্রমে ঘটে না, এমনকি তাদের অভিপ্রায়ের বিপরীতে ঘটে। কেননা মঙ্গলময় সেই ঈশ্বর অনিষ্টকর ঈশ্বরের অভিপ্রায় সত্ত্বেও আছে, ও অনিষ্টকর সেই ঈশ্বর মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রায় সত্ত্বেও আছে।

৭। এবিষয়ে মণ্ডলীর শিক্ষাই নির্ভরযোগ্য

[১] তাছাড়া একজন তাদের বিপক্ষে এই আপত্তিও উত্থাপন করতে পারে: যদি দৃশ্যমান এই জগৎ হলো অনিষ্টকর ঈশ্বরের কাজ, তাহলে মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাজ কী? কেননা নির্মাতার সৃষ্টি ছাড়া কিছুই দেখা যেতে পারে না। এবং যদি মঙ্গলময় ঈশ্বরের এমন কোন কর্ম নেই যা দ্বারা তিনি জ্ঞাত হতে পারে, তাহলে মঙ্গলময় ঈশ্বর যে আছে, সেবিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি? কেননা নির্মাতার নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারাই জ্ঞাত। [২] পরস্পর বিপরীত দু'টো কর্মকাণ্ড কেমন থাকতে পারে? অথবা, সেই দু'টো কর্মকাণ্ড যাতে এক একটা আলাদা ভাবে থাকতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে কীবা সেই দু'টোকে পৃথক রাখতে পারে? কেননা সেই দু'টো কর্মকাণ্ড যে একই সময় থাকবে, তা তো সম্ভব নয়, কেননা দু'টোই পরস্পর ধ্বংসাত্মক প্রতাপের অধিকারী। এমনটাও হতে পারে না যে, একটা অপর একটায় বিদ্যমান, কেননা দু'টোর প্রকৃতি অমিশ্রিত ও বৈসদৃশ। তেমনটা হলে তবে তৃতীয় একটা কিছু থাকবে যা সেই দু'টোকে পৃথক রাখে ও সেটা নিজেই ঈশ্বর। কিন্তু সেই তৃতীয় কিছু কোন্ স্বরূপের অধিকারী হবে? সেই স্বরূপ যে মঙ্গলময় বা

অনিষ্টকর, ব্যাপারটা যথেষ্ট অস্পষ্ট, কেননা সেই স্বরূপ একই সময় মঙ্গলময় ও অনিষ্টকর হতে পারে না।

[৩] সুতরাং যেহেতু মনে হচ্ছে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের ধারণা অকার্যকর, সেজন্য মণ্ডলীর ঐশতত্ত্বের সত্য প্রকাশ্য করা একান্ত প্রয়োজন, তথা, অনিষ্ট ঈশ্বর থেকেও আগত হয়নি, ঈশ্বরেও বিদ্যমান ছিল না, আদিতেও ছিল না, তার স্বতন্ত্র কোন বাস্তবতাও নেই। কিন্তু মঙ্গল বিষয়ক ধারণা পরিত্যাগ করে মানুষ নিজের জন্য ও নিজের খুশিমত এমন বস্তুগুলো ভাবতে ও উদ্ভাবন করতে লাগল যেগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। [৪] মানুষেরা ছিল এমন একজনের মত যে যখন সূর্য উজ্জ্বল ও পৃথিবী সূর্যের আলোতে আলোকিত, তখন চোখ বন্ধ ক'রে এমন অন্ধকার কল্পনা করে যা প্রকৃতপক্ষে নেই, ও তেমন ব্যবহারের ফলে সে কেমন যেন অন্ধকারে রয়েছে পথ হারিয়ে ও প্রায়ই প'ড়ে ও খাড়া অতটের উপরে হোঁচট খেয়ে এদিক ওদিক চলাচল করে একথা ভেবে যে, আলো নয়, অন্ধকার বিরাজ করছে, কেননা এ কল্পনা করে যে সে দেখতে পাচ্ছে আসলে মোটেই কিছু দেখে না; তেমনিভাবে মানুষের প্রাণ, যা দ্বারা ঈশ্বরকে দেখা যেতে পারত, সেই চোখ বন্ধ করে অনিষ্ট কল্পনা করল ও এদিক ওদিক চলাচল করে এমনটা বুঝতে পারল না যে, যদিও সে মনে করছে সে কাজ করছে আসলে সে কিছুই করছে না, কেননা এমন কিছু কল্পনা করছে যা নেই। এবং সেই প্রাণকে যেভাবে গড়া হয়েছিল, তা সেইভাবে থেকে যায়নি, কিন্তু এমনভাবে দেখা দিল সে যেন নিজেকে দূষিত করেছিল। [৫] কেননা ঈশ্বরকে দেখবার জন্যই ও তাঁর দ্বারা আলোকিত হবার জন্যই প্রাণকে গড়া হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বদলে সে ক্ষয়শীল বস্তু ও অন্ধকার অন্বেষণ করল, যেভাবে [পবিত্র] আত্মা শাস্ত্রের কোন এক স্থানে বলেন, *ঈশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন, কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যানধারণা সন্ধান করল* [ক]। এইভাবেই অনিষ্টের উদ্ভাবন ও ধারণা মানুষদের মাঝে আবির্ভূত হল ও আদি থেকে পরিকল্পিত হল।

কিন্তু এখন আমাদের এবিষয় ব্যাখ্যা করতে হবে, তথা কেমন করে মানুষ প্রতিমাপূজার উন্মাদনায় পড়ল; এভাবে তুমি জানতে পারবে যে, প্রতিমাপূজার উদ্ভাবন যা মঙ্গল তা থেকে আদৌ উদ্ভূত হয়নি, অনিষ্ট থেকেই উদ্ভূত হল, কেননা যা কিছুর

উদ্ভব অনিষ্টে ঘটেছে, তা কোন মতেই মঙ্গল বলে গণ্য করা চলে না যেহেতু তা সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকর।

৮। প্রতিমাপূজা সম্পর্কে

[১] অনিষ্টকে উদ্ভাবন করায় তুষ্ট না হয়ে মানবজাতির প্রাণ ক্রমশ অধিকতর অনিষ্টকর বিষয়ের দিকে পিছিয়ে যেতে লাগল। কেননা তৃপ্তির নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা ক'রে ও ঐশ্বরিক বিষয় সংক্রান্ত বিস্মৃতি দ্বারা নিজের কোমর বেঁধে, দেহের উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগে ও কেবল ক্ষণিক বিষয়গুলোতে তৃপ্তি পেয়ে ও তেমন ক্ষণিক বিষয়গুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রাণ এমনটা ভাবল যে, দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া আর কিছুই নেই ও কেবল ক্ষণিক ও দৈহিক বিষয়গুলোই মঙ্গলময় (ক)। এইভাবে দূষিত হয়ে ও এবিষয়েও বিস্মিৃত হয়ে যে, সে মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, প্রাণ, যাঁর সাদৃশ্যে গড়া হয়েছিল, নিজের অভ্যন্তরে উপস্থিত প্রতাপ দ্বারা সেই বাণী-ঈশ্বরকে আর উপলব্ধি করল না, কিন্তু নিজের বাইরে সরে গিয়ে সেই দিকে লক্ষ রাখল ও কল্পনা করল যা শূন্যময়। [২] কেননা প্রাণ দৈহিক কামনা-বাসনার জটিলতার মধ্যে সেই আয়না লুকিয়ে দিয়েছিল যা কেমন যেন তার নিজের অভ্যন্তরে ছিল ও কেবল যা দ্বারাই সে পিতার প্রতিমূর্তি দেখতে পারত। প্রাণের যা উপলব্ধি করার কথা, প্রাণ তা আর দেখতে পেল না, কিন্তু সবদিকে আকর্ষিত হয়ে তা-ই মাত্র দেখল যা তার নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে, মাংসময় কামনা-বাসনায় পূর্ণ হয়ে ও সেই ইন্দ্রিয়গুলো-জনিত ধারণাসমূহ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে প্রাণ নিজের মনে যে ঈশ্বরকে ভুলে গেছিল সেই ঈশ্বরকে দৈহিক ও স্পর্শযোগ্য উপায়ে চিত্রিত করল, অর্থাৎ যা দৃশ্যমান তাতে 'ঈশ্বর' শব্দটা আরোপ করল ও সেই সবকিছুতেই মাত্র মনোযোগ দিতে লাগল যা সে পছন্দ করত ও তৃপ্তিকর বলে গণ্য করত। [৩] অতএব, অনিষ্টই হলো প্রতিমাপূজার প্রথম কারণ। কেননা মানুষ শূন্যময় অনিষ্ট সাধন করতে শিখে নিজের জন্য শূন্যময় দেব-দেবীকেও উদ্ভাবন করতে লাগল। যেমন, যে কেউ কোন একটা গহ্বরে পতিত হয়ে আলো আর দেখতে পায় না, আলোতে যা দৃশ্যগত তাও দেখতে পায় না কারণ তার চোখ নিচের দিকে নিবদ্ধ ও জল তার উপরে বর্ষিত হচ্ছে, ও গহ্বরে যা রয়েছে কেবল সেই বিষয়েই সচেতন হয়ে সে মনে করে সেই সবকিছু ছাড়া আর কিছু নেই ও সে যা উপলব্ধি করে তা-ই মাত্র সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনি পুরাকালের মানুষেরা নির্বোধের মত দেহের কামনা-বাসনা ও অদ্ভুত কল্পনাগুলোতে নিমজ্জিত হল ও ঈশ্বর সংক্রান্ত চিন্তা-ধারণা ভুলে গিয়ে দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে দেব-দেবীর মর্যাদা দিল ও স্রষ্টার বদলে সৃষ্টিকে গৌরব আরোপ করল [খ] ও তাদের নিজেদের কারণ, নির্মাতা ও প্রভু সেই ঈশ্বরের বদলে সৃষ্টবস্তুকেই ঈশ্বর করল। [৪] আর যেমন উপরোল্লিখিত উপমা অনুসারে যারা গহ্বরে নিমজ্জিত তারা যত গভীরে নেমে যায় অন্ধকার তত বৃদ্ধি পায়, তেমনি ঘটে মানবজাতির বেলায়। কেননা তারা প্রতিমাপূজাকে কেবল আঁকড়িয়ে ধরেনি বা তারা যেখানে শুরু করেছিল কেবল সেইখানে থেমে যায়নি, বরং নিজেদের আদি বিভ্রমে যত সময় কাটাল, তত নতুন নতুন কুসংস্কার উদ্ভাবন করল। এবং আদিকালের অনিষ্ট দ্বারা তৃপ্ত না হয়ে তারা উত্তরোত্তর নির্লজ্জার পথে এগোতে এগোতে ও নিজেদের অধর্ম আরও বেশি করে প্রসারিত করে অন্য অন্য অনিষ্ট দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করল। এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে পবিত্র শাস্ত্র বলে, *অপকর্মের গহ্বরে নেমে গেলে ভক্তিহীন মানুষ অবজ্ঞা করে* [গ]।

৯। নানা প্রকার প্রতিমাপূজা

[১] মানুষদের মন একবার ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেলে তাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি ক্ষেত্রে তাদের অধঃপতন ঘটল ও এমনটা ভেবে যে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র কেবল দেবতা নয় কিন্তু নিজেদের চেয়ে বাকি সমস্ত কিছুরও মূলকারণ ছিল, তারা ঈশ্বরকে দেয় সম্মান আগে সেই আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও তারানক্ষত্রকে আরোপ করল; তারপর তাদের অদ্ভুত যুক্তিতে নিম্নতর স্তরে নামতে নামতে তারা হাওয়া, বায়ু ও বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান সবকিছুও দেবতা বলে ডাকতে লাগল। আরও, নিজেদের কুচিন্তায় আরও বেশি করে এগিয়ে যেতে যেতে তারা এবার দেহের পদার্থসমূহ ও দেহের গঠনের মূলকারণসমূহকে তথা উষ্ণ ও শীতল, শুষ্কতা ও আর্দ্রতাকেও দেবতা বলে প্রশংসা করল। [২] যারা একেবারে পতিত ও সাপের মত মাটিতে বুকে হেঁটে বেড়ায়, তাদের মত এই অধিক ভক্তিহীন মানুষেরা ঈশ্বর-দর্শন থেকে নমিত হতে হতে এমন জীবিত বা মৃত মানুষদের ও মানুষদের মূর্তিকেও ঐশ্বরিক পর্যায়ে উন্নীত করল। কিন্তু তারা আরও খারাপ চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা করে পাথর ও কাঠ, সমুদ্রের বা স্থলের সরিসৃপ ও যুক্তিক্ষমতাহীন বন্য জন্তুদের প্রতি পূর্ণতর ঐশ্বরিক সম্মান প্রদান ক'রে ও খ্রিষ্টের পিতা

সেই সত্যকার ও প্রকৃত ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, এবার ঐশ্বরিক ও অতিমানবিক যে নাম তথা ঈশ্বর-নাম সেই সমস্ত কিছুর উপর আরোপ করল।

[৩] আহা, তেমন নির্বোধ মানুষদের দুঃসাহস যদি এই পর্যায়ে বন্ধ হত ও তারা যদি ঈশ্বর-নিন্দাজনক কর্মে আরও বেশি এগিয়ে না যেত! বস্তুতপক্ষে কেউ না কেউ নিজেদের উপলব্ধি-শক্তির এমন অধঃপতন ঘটাল ও নিজেদের মন এতই অন্ধকারময় করল যে, যা একেবারে শূন্যময় ও সৃষ্ট জগতেও অন্তর্ভুক্ত নয়, তেমন কিছুও তারা উদ্ভাবন করে ঈশ্বরীকৃত করল। কেননা তারা যা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট তা যা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট নয় তারই সঙ্গে এলোমেলো করল ও স্বরূপে বৈসদৃশ সমস্ত কিছু যুক্ত করে তা দেবতা বলে উপাসনা করল, যেমন মিশরীয়দের সেই দেব-দেবী যার মাথা কুকুর, সাপ ও গাধার মাথা, বা লিবীয়দের সেই আম্মোন যার মাথা ভেড়ার মাথা। অন্যান্য জাতি কেমন যেন গোটা দেহকে উপাসনা করায় তুষ্ট না হয়ে মাথা বা কাঁধ বা হাত বা পা দেহের এমন বিশিষ্ট অঙ্গ পৃথক পৃথক করে সেগুলোকে দেবতা বলে উন্নীত করে ঈশ্বরীকৃত করল। [৪] এবং অন্যান্য জাতির মানুষেরা নিজেদের অভক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রসারিত করল যে, নিজেদের উদ্ভাবন ও দুষ্টতার অজুহাত তথা তৃপ্তি ও কামুকতাকেও ঈশ্বরীকৃত করে পূজা করল, যেমন সেই এরোস ও [সাইপ্রাস দ্বীপের] পাফোসের আফ্রদিতে। অন্য কেউ কেমন যেন অনিষ্টতরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে, হয় নিজেদের শাসকদের সম্মানার্থে বা তাদের শাসনের ভয়েতে নিজেদের সেই শাসকদের বা তাদের ছেলেদের ঈশ্বরীকৃত করার দুঃসাহস দেখাল, যেমন ক্রীট দ্বীপে সেই বিখ্যাত জেউস, বা আর্কাদিয়ায় হের্মেস, বা ভারতে দিওনিসোস, বা মিশরে ইসিস, অসিরিস ও হোরুস, এবং বর্তমানকালে সেই আন্তিনো যে রোম সম্রাট হাদ্রিয়ানুসের প্রিয়তম। যদিও তারা এ জানে যে সেই আন্তিনো মানুষমাত্র ছিল, এমনকি সম্মাননীয় ব্যক্তি নয় কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ এক ব্যক্তি, তবু তারা শাসকের ভয়তে তাকে পূজা করে; কেননা [রোম সম্রাট] হাদ্রিয়ানুস মিশরে থাকাকালে তাঁর কামের দাস সেই আন্তিনো মারা গেছিল ও তিনি এমনটা জারি করেছিলেন যেন তাকে দৈব সম্মান আরোপ করা হয়, কারণ তিনি সেই যুবকের মৃত্যুর পরেও তাকে ভালবাসতেন; অথচ তিনি নিজেকে নিন্দার পাত্র করলেন ও এমন প্রমাণ উপস্থাপন করলেন যে, সমস্ত প্রতিমাপূজা মানুষদের দ্বারা একটামাত্র

কারণে উদ্ভাবন করা হয়েছে, কারণটা হলো এ, তাদেরই কামাসক্তি, যারা সেই প্রতিমাপূজা পরিকল্পনা করেছিল, যেইভাবে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা আগে এই বলে ইঙ্গিত করেছিলেন, *দেবমূর্তি তৈরি করার প্রথম কল্পনাই হলো ব্যভিচারের সূচনা* (ক)।

[৫] সুতরাং তুমি এতে বিস্মিত হয়ো না বা এমনটা ভেবো না যে, আমরা যা বলে এসেছি তা বিশ্বাস করা কঠিন, কেননা সম্প্রতিকালে, আর হয় তো এখনও রোমীয় প্রবীণসভা এমনটা জারি করে যে, তাদের যে সম্রাটগণ আদি থেকে রাজত্ব করে এসেছেন, তাঁরা সকলে বা সেই প্রবীণসভা যাঁদের বেছে নেয় ও যাঁদের বিষয়ে তেমনটা সিদ্ধান্ত করে, সেই সম্রাটগণ দেব-দেবীর অন্তর্ভুক্ত, এবং এমনটাও নির্দেশ করে যেন সেই সম্রাটগণ দেবতা বলে পূজিত হন। কিন্তু যাঁদের তারা ঘৃণা করে, তাঁদের শত্রু গণ্য ক'রে ও তাঁদের প্রকৃত মানব স্বরূপ মেনে নিয়ে, সেই তাঁদের তারা মানুষ বলে ডাকে; অন্যদিকে যাঁদের তারা প্রশংসার যোগ্য মনে করে, তাঁদের বিষয়ে এমনটা জারি করে তাঁরা যেন তাঁদের গুণাবলির খাতিরে পূজিত হন, কেমন যেন সেই প্রবীণসভা এমন এক ব্যক্তিকে ঈশ্বরীকৃত করার অধিকার রাখে যে ব্যক্তি নিতান্ত মানুষমাত্র, ও সেইসঙ্গে এমনটাও অস্বীকার করে না যে, সেই সম্রাটগণ মরণশীল। [৬] কিন্তু যারা মানুষকে ঈশ্বরীকৃত করে, তাদের পক্ষে ঈশ্বর হতে হত, কেননা যে তৈরি করে তাকে তার তৈরী বস্তুর চেয়ে মহৎ হতে হয়, বিচারকও অবশ্যই বিচারিতজনের উপর অধিকার রাখে, ও দাতা এমনটা দেয় যা তার নিজের সম্পদ; সেই অনুসারে এটাও আবশ্যক যে, যেকোন রাজা এমনটা দান করেন যা নিজের অধিকারে রাখেন ও গ্রহীতাদের চেয়ে তিনি শ্রেয়তর ও মহান। তাই যখন সেই প্রবীণসভা যাকে খুশি তাকে দেবতা বলে ঘোষণা করে, তখন এটাই আবশ্যক যে, আগে তাদের নিজেদেরই দেবতা হতে হবে। কিন্তু এটাই অদ্ভুত যে, মানুষের মত মৃত্যুবরণ করায় তারা এমনটা প্রমাণ করে যে, তারা যাদের ঈশ্বরীকৃত করেছে, তাদের বিষয়ে তাদের সেই বিধি মিথ্যা।

১০। মানুষকে ঈশ্বরীকৃত করার প্রক্রিয়া

[১] এই প্রথা নতুন নয়, প্রথাটা যে রোমীয় প্রবীণসভা নিয়ে শুরু হয়েছে তাও নয়, বরং অনেক দিন আগেও ছিল ও প্রতিমা উদ্ভাবন কালে কার্যকর ছিল। কেননা সেই জেউস, পসেইদোন, আপল্লোস, হেফাইস্তস ও হের্মেস, এরা পুরাকালে গ্রীকদের দ্বারা

দেব বলে ঘোষিত হয়েছিল, ও দেবীদের মধ্যে যথা হেরা, দেমেত্রা, আথেনা ও আর্তেমিস, এরা সেই থেসেওসের বিধিনির্দেশ দ্বারা দেবতা বলে জারীকৃত হয়েছিল যিনি গ্রীক ইতিহাসে উল্লিখিত। আর যারা সেই বিধি স্থির করেছিল, তারা যখন মানুষের মত মরল, তখন তাদের বেলায় শোক পালন করা হল, কিন্তু যারা বিধিনির্দেশে উল্লিখিত, তারা দেবতা বলে পূজিত। আহা, কেমন আশ্চর্য অসঙ্গতি ও উন্মাদনা! বিধিনির্দেশ যিনি জারি করেছিলেন তারা তাঁর কথা জানলেও, তবু তিনি যাদের বিষয়ে বিধিটা জারি করেছিলেন, তাঁর চেয়ে তারা তাদেরই বেশি সম্মান আরোপ করে। [২] এবং কমপক্ষে যদি এমনটা হত যে প্রতিমাপূজা বিষয়ে তাদের উন্মাদনা পুরুষ দেবদের নিয়ে বদ্ধ হত ও তারা স্ত্রীলোকদেরও দেবী বলে না বানাত! কেননা জাতীয় ব্যাপারে জনসভায় যাদের স্থান দেওয়া নিরাপদ নয়, সেই স্ত্রীলোকদেরও তারা পূজা করে ও তাদের প্রতি ঐশ্বরিক মর্যাদা দেখায়, যেমন, যেইভাবে উপরে বলেছি, সেই দেবীদের কথা যারা থেসেওসের বিধিনির্দেশে উল্লিখিত, মিশরীয়দের মধ্যে ইসিস, কোরে ও নেওতেরা, ও অন্য কোথাও সেই আফ্রদিতে। কেননা অন্যান্য দেবীদের নাম উল্লেখ করাও আমি শালীন মনে করি না, কেননা সেই নামগুলো অদ্ভুত। [৩] কেননা পুরাকালে শুধু নয়, এই বর্তমানকালেও অনেকে রয়েছে যাদের প্রিয়জনেরা, ভাই বা আত্মীয় বা স্ত্রী গত হয়েছে, ও সেই অনুসারে অনেক স্ত্রীও রয়েছে যাদের স্বামী গত হয়েছে, ও তাদের সকলের স্বরূপ মরণশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে; অথচ তাদের বড় দুঃখের খাতিরে তারা তাদের প্রতিকৃতি করেছে, সেই পরলোকগত পুরুষ বা স্ত্রীলোক যেই হোক না কেন, ও তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছে। তারপর পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা সেই প্রতিকৃতির খাতিরে ও সেগুলোর শিল্পীদের দক্ষতার খাতিরে তাদের দেব-দেবী বলে পূজা করতে লাগল; এ এমন পদক্ষেপ যা আদৌ সাধারণ নয়। কেননা দেবতা না হওয়ায় যাদের আত্মীয়স্বজনেরা শোকপালন করেছিল (কেননা তারা যদি তাদের দেবতা বলে মানত তাহলে তাদের জন্য পরলোকগতদেরই প্রতি উপযুক্ত শোকপালন করত না, কিন্তু যেহেতু তাদের দেবতা বলে মানত না ও এমনটা ভাবত তারা এমনি মারা গেছে, ঠিক এই কারণে তাদের জন্য প্রতিকৃতি তৈরি করিয়েছিল যাতে ছবিতে তাদের প্রতিকৃতি দেখার মধ্য দিয়ে তারা যে তাদের হারিয়েছিল তাতে সান্ত্বনা পেতে পারত), অথচ ঠিক এদেরই কাছে কেমন যেন

দেব-দেবীদেরই কাছে নির্বোধ মানুষেরা প্রার্থনা করল ও তাদের সত্যকার ঈশ্বরকে দেয় সম্মান তাদের প্রতি আরোপ করল। [৪] উদাহরণ যোগে, মিশরে আজকালেও অসিরিস, হোরুস, তিফোন ও অন্যান্যদের জন্য শোক-অনুষ্ঠান পালিত হয়; ও দদোনায় সেই দৈববাণী ও ক্রীটে সেই করিবান্তেস এমনটা প্রমাণ করে যে, জেউস দেবতা নয় কিন্তু মানুষমাত্র, এমনকি এমন মানুষ যে নরখাদক পিতা থেকে জন্ম নিয়েছিল। এব্যাপারে যা সবচেয়ে আশ্চর্য তা এ হলো যে, গ্রীকদের সেই মহান দার্শনিক যিনি ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন বিধায় সুনাম অর্জন করেছেন, সেই প্লেটো মানুষের তৈরী আর্তেমিসের ছবি পূজা করার জন্য সক্রেটিসের সঙ্গে সেই পেইরাইউসে যাত্রা করেছিলেন।

১১। গ্রীকদের দেব-দেবীর আচরণ

[১] অনেক দিন আগে শাস্ত্র এবিষয়ে ও প্রতিমাপূজার সাধিত সদৃশ উদ্ভাবন ক্ষেত্রে এই বলে শিক্ষাদান করেছিল, *দেবমূর্তি তৈরি করার প্রথম কল্পনাই হল ব্যভিচারের সূচনা, সেগুলোর উদ্ভাবনই আনল জীবনের অবক্ষয়। কেননা সেগুলি আদিতেও ছিল না, চিরকালেও থাকবে না। মানুষের অসারতাই সেগুলিকে জগতে আনল, এজন্য সেগুলির জন্য শীঘ্র পরিণাম নিরূপিত। একটি পিতা, অকাল মৃত্যুশোকে অতিদুঃখিত হয়ে পড়ে ব্যবস্থা করল, যেন তার সেই অতিশীঘ্রই-কেড়ে নেওয়া সন্তানের একটা মূর্তি তৈরি করা হয়; এর ফলে সে তাই দেবতা বলে সম্মান জানাল, কিছুক্ষণ আগে যা ছিল লাশমাত্র, ও নিজের লোকদের মধ্যে রহস্যময় উপাসনা-রীতি ও ধর্মানুষ্ঠানেরও প্রচলন করল। আর তেমন ভক্তি-বিরুদ্ধ প্রথা দিনের পর দিন সবল হয়ে উঠে শেষে বিধিরূপেই পালন করা হল! নৃপতিদের হুকুমেও একসময় মূর্তিপূজা করা হত: দূরে থাকায় তাদের প্রতি ব্যক্তিময় সম্মান দেখাতে পারত না বিধায় প্রজারা, দূরবর্তী সেই আকৃতির সূক্ষ্ম প্রতিকৃতি অনুসারে, তাদের সম্মানের বস্তু সেই রাজার দৃশ্য প্রতিমূর্তি তৈরি করল, যাতে যে অনুপস্থিত, তাকে ঠিক যেন উপস্থিত বলেই উদ্যোগের সঙ্গে তোষামোদ করতে পারে। এমন জাতি যারা সেই উপাসনা-রীতি সম্বন্ধে কিছুই জানত না, শিল্পীর উৎসাহই সেই পথে তাদের চালিত করল। কেননা প্রভাবশালীর প্রীতির পাত্র হওয়ার বাসনায় সেই শিল্পী শিল্পকর্ম দ্বারা তার প্রতিমূর্তি আরও সুন্দর করতে চেষ্টা করল; ফলে লোকেরা*

কিছুক্ষণ আগে যাকে মানুষ বলে সম্মান করত, শিল্পকর্মের কান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তাকে পূজার বস্তু বলে গণ্য করল। তেমন প্রথা জীবিতদের পক্ষে ফাঁদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, কারণ লোকেরা দুর্দশা বা স্বৈরশাসনের বন্দি হয়ে প'ড়ে পাথরকে ও কাঠকে সেই অনির্বচনীয় নামটি আরোপ করল! (ক)। [২] সুতরাং, শাস্ত্র যেইভাবে সাক্ষ্যদান করে, যেহেতু প্রতিমাপূজার আবিষ্কার মানুষদের মধ্যে এইভাবে শুরু হল ও উদ্ভাবন করা হল, সেজন্য এখন এমন সময় হয়েছে যাতে আমি তোমার কাছে প্রতিমাপূজার ধারণা খণ্ডন সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করি; এতে আমি বাইরে থেকে যুক্তি আনব না, বরং তারা নিজেরা সেই বিষয়ে যা ভাবে, তা থেকেই প্রমাণ উপস্থাপন করব।

এদিকে, একজন যদি সেসময় থেকে শুরু করে তাদের তথাকথিত দেব-দেবীর কাজকর্ম বিচার-বিবেচনা করত, তাহলে সে এমনটা দেখতে পেত যে তারা যে শুধু দেবতা নয় তা নয়, বরং এও দেখতে পেত যে তারা ছিল নিতান্ত ধরনের মানুষমাত্র। তাই একজন সেই কবিদের লেখায় জেউসের প্রেম-কাহিনী ও তার কামুকতা দেখতে পায়; অথবা সে শুনতে পায় সেই জেউস কেমন করে [যুবা সেই] গানিমেদেসকে ধর্ষণ করল ও নানা গুপ্ত ব্যভিচার সম্পাদন করল, ও পাছে ত্রোয়াবাসীদের নগরপ্রাচীর তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ্বংসিত হয় সে কেমন ভয় পাচ্ছিল ও কাঁপছিল। একজন তাকে তার ছেলে সার্পেদোনের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখতে পায়, এমনটাও দেখতে পায়, সে ছেলের সাহায্যে যাবার ইচ্ছা করলেও তবু তা করতে অক্ষম ছিল। একজন দেখতে পায়, সে অন্যান্য তথাকথিত দেব-দেবীর তথা সেই আথেনা, হেরা ও পসেইদোনের ষড়যন্ত্রের বস্তু ও কেমন করে সে থেতিস নামক একটা স্ত্রীলোক দ্বারা ও শতহাত সেই আইগায়ন দ্বারা সাহায্য পেয়েছিল। একজন তাকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পরাভূত অবস্থায় দেখতে পায়, দেখতে পায় সে কেমন স্ত্রীলোকদের দাস ছিল ও তাদের খাতিরে যুক্তিক্ষমতাহীন পশু, বন্যজন্তু ও পাখিদের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করতেও দুঃসাহসী ছিল; অথবা কেমন করে সে নিজের পিতার ষড়যন্ত্র থেকে লুকোচ্ছিল; সে ক্রনোসকেও বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায় ও জেউস নিজের পিতাকে অঙ্গচ্ছেদ করতেও দেখতে পায়। সুতরাং, একজন যে তত বড় জঘন্য কর্মের সাধক ও এমন অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্ত যা রোমের সাধারণ

বিধি দ্বারা সাধারণ লোকদের কাছেও নিষিদ্ধ, সেই জেউসকে দেবতা বলে মান্য করা কি ন্যায়সঙ্গত?

১২। অন্যান্য দেব-দেবীর লজ্জাকর আচরণ

[১] তেমন অপকর্ম এত বহুসংখ্যক হওয়ায় এখানে বহু উদাহরণের মধ্য থেকে কেবল কয়েকটাই উপস্থাপন করা হোক। তবে, সেই জেউস যে আইনবিরুদ্ধ ভাবে সেমেলে, লেদা, আল্ক্‌মেনে, আর্তেমিস, লেতো, মায়া, এউরোপা, দানাএ ও আন্তিয়পেকে ধর্ষণ করল তা দে'খে, অথবা নিজের বোনকে স্ত্রীরূপে নেওয়ায় নিজের বোনের বিষয়ে তার দর্পপূর্ণ মতলব দে'খে কেই বা তাকে বিদ্রূপ করবে না ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে না? সে যে শুধু ব্যভিচার করল তা নয়, বরং নিজের অপকর্ম গোপন করার জন্য ঈশ্বরীকরণকে চালাকি হিসাবে কল্পনা ক'রে সে তার ব্যভিচার থেকে উৎপন্ন ছেলেমেয়েকেও ঈশ্বরীকৃত করল; তেমন ঈশ্বরীকৃতজনদের মধ্যে দিওনিসোস, হেরাক্লেস, দিওস্কুরোই বলে পরিচিত কাস্তোর ও পল্লুক্স, হের্মেস, পের্সেওস ও সতেইরা অন্তর্ভুক্ত। [২] ইলিউম শহরে গ্রীকদের ও ত্রোয়াবাসীদের উপরে তথাকথিত দেব-দেবীর অদম্য ও পারস্পরিক লড়াই দেখে কেইবা তাদের দুর্বলতার নিন্দা করবে না? কেননা তাদের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে তারা মানুষকেও প্ররোচিত করল। অথবা, দিওমেদেস দ্বারা বিক্ষত আরেস ও আফ্রদিতেকে, ও হেরাক্লেস দ্বারা বিক্ষত হেরাকে, ও পের্সেওস দ্বারা বিক্ষত ভূতল থেকে আগত ও তথাকথিত দেবতা সেই আইদোনেউসকে, আর্কাস দ্বারা বিক্ষত আথেনাকে, ও [আকাশ থেকে] বিক্ষিপ্ত ও সেজন্য খোঁড়া সেই হেফাইস্তোসকে দেখে কেইবা তাদের প্রকৃতির নিন্দা করবে না ও তাদের এখনও দেবতা বলে অভিহিত করবে? কিন্তু এমনটা শুনে যে তারা মরণশীল ও যন্ত্রণাসাপেক্ষ, সে অবশ্যই এ মেনে নেবে যে, তারা মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়, এমনকি তারা দুর্বল মানুষ, ও যারা বিক্ষত হয়েছিল, তাদের চেয়ে সে তাদেরই প্রশংসা করবে যারা তাদের বিক্ষত করেছিল। [৩] এবং আফ্রদিতের সঙ্গে আরেসের ব্যভিচার ও সেই দু'জনের উপরে সাধিত হেফাইস্তোসের চালাকি দে'খে, ও সেই ব্যভিচারের সাক্ষী হবার জন্য সেই হেফাইস্তোসের ডাকা অন্যান্য তথাকথিত দেব-দেবীকে দে'খে, ও সেই দেব-দেবী যে এসে তাদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার দেখছিল, তা দেখে কেইবা হাসাহাসি করবে না ও তাদের

ক্ষুদ্রমনা আচরণ নিন্দা করবে না? অথবা, অম্ফালের প্রতি মাতাল হেরাক্লেসের প্রেমলীলার প্রচেষ্টা দেখে কেইবা হাসাহাসি করবে না?

তাদের কামুকতাপূর্ণ কর্ম ও হাস্যকর প্রেমলীলা, সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ, লোহা, পাথর ও কাঠে নির্মিত তাদের মূর্তি বিষয়ক ধারণা ধর্মাগ্রহের সঙ্গে খণ্ডন করা কোন দরকার হয় না, কেননা এসব কিছু আপনা আপনিই জঘন্য ও প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভুলভ্রান্তি বিষয়ে প্রমাণ দেয়। যারা তাদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছে, একজন তাদের প্রতি বরং অনুকম্পাই দেখাবে। কেননা যারা সেই ব্যভিচারীকে ঘৃণা করে যে নিজের স্ত্রীসকলকে আক্রমণ করে, তারা ব্যভিচারের শিক্ষকদের ঈশ্বরীকৃত করতে লজ্জাবোধ করে না; এবং যদিও তারা নিজেদের বোনদের সঙ্গে যৌন মিলনে মিলিত না হয়, তবু যারা তেমন ব্যবহার করে তাদের তারা পূজা করে। যদিও তারা এমনটা মেনে নেয় যে অশ্লীল বালকপ্রীতি পাপ, তবু যারা সেই দোষে অভিযুক্ত, তাদের তারা উপাসনা করে, ও বিধান যা মানুষদের মধ্যে নিষেধ করে, যাদের তারা দেব-দেবী বলে অভিহিত করে তাদের উপর তেমন অপকর্ম আরোপ করতেও লজ্জাবোধ করে না।

১৩। মূর্তিপূজা সম্পর্কে

[১] তাছাড়া, কাঠ ও পাথর পূজা করায় তারা এমনটা দেখে না যে, যার উপরে তারা হাঁটে ও যা পোড়ায় তেমন সদৃশ জিনিসের অংশগুলোকেও তারা দেবতা বলে ডাকে। অল্পক্ষণ আগে যা তারা ব্যবহার করছিল, তা খোদাই করে উপাসনা করে এমনটা আদৌ না দে'খে বা না বুঝে যে, তারা দেবতাদের নয়, ভাস্করের নৈপুণ্যকেই উপাসনা করে। [২] যত সময় পাথরটা কাটা নয় এমন অবস্থায় থাকে ও পদার্থটাও খোদাই করা নয় এমন অবস্থা থাকে তত সময় ধরে তারা তার উপরে হেঁটে বেড়ায় ও নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্য এমনকি নিম্নতর ধরনের প্রয়োজনের জন্য তা ব্যবহার করে। কিন্তু শিল্পী নিজের নৈপুণ্য দ্বারা সেই সবকিছু চিহ্নিত করলে ও পদার্থটা পুরুষ বা স্ত্রীলোকের আকারে গড়লেই তারা শিল্পীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও তার কাছ থেকে কাজের মূল্য জেনে তা শোধ ক'রে সেই ক্ষণ থেকে সেই মূর্তিগুলোকে দেবতা বলে পূজা করে। এবং ভাস্কর নিজে যা বানিয়েছে তা কেমন যেন সেই জিনিসটা ভুলে গিয়ে প্রায়ই নিজের কাজের ফলের কাছে প্রার্থনা করে, এবং কিছুক্ষণ আগে সে যা পালিশ করে খোদাই করেছিল,

শিল্পকর্মের শেষে তা দেবতা বলে ডাকে। [৩] এসমস্ত জিনিস সত্যিকারে আশ্চর্যের বিষয় হলে তবে শিল্পীর নৈপুণ্য মেনে নেওয়া আবশ্যক হত বটে, কিন্তু নির্মাতার চেয়ে তার নির্মাণকর্মকে বেশি মর্যাদা আরোপ করা আদৌ আবশ্যক হত না (ক)। কেননা পদার্থটা যে শিল্পীর কর্মকে অলঙ্কৃত ও ঈশ্বরীকৃত করল তা নয়, বরং শিল্পীর নৈপুণ্যই পদার্থকে মর্যাদা দিল। ফলে তাদের পক্ষে এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত হত যদি তারা শিল্পকর্মের চেয়ে শিল্পীকেই পূজা করত কেননা সে সেই দেবতাদের আগেই ছিল যারা তার নৈপুণ্যের ফল ও তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী গড়া। কিন্তু যা ন্যায়সঙ্গত তা বাদ দিয়ে ও যা জ্ঞান ও নৈপুণ্য তা তুচ্ছ করে তারা জ্ঞানও নৈপুণ্যের ফল উপাসনা করে, এবং সেগুলোকে যে তৈরি করেছিল তার মৃত্যুর পরে তারা তার কাজের ফল অমর বলে সম্মান করে যদিও সেই সমস্ত কিছু প্রতিদিন যত্ন না পেলে সময়মত পদার্থ হিসাবে নিঃশেষ হয়ে যেত। [৪] তারা যে দেখতে সক্ষম অথচ যে জিনিস দেখতে সক্ষম নয় তারা যে ঠিক তা-ই উপাসনা করে এবং যা শুনতে অক্ষম তারা যে ঠিক তারই কাছে প্রার্থনা অর্পণ করে, ঠিক এসমস্ত কারণের জন্য কেইবা সেই সমস্ত মানুষের প্রতি অনুকম্পা দেখাবে না? এবং নিজেরা জীবিত ও স্বরূপে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ হয়েও তারা যা একেবারে অচল ও প্রাণহীন তা দেবতা বলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে, যা কিছু তারা নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখে, তা নিজেদের প্রভু বলে সেবা করে। এবং তুমি এমনটা মনে কর না যে আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজের অসার কথা বা সেইসব কিছুর বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা, কেননা এসবকিছুর প্রমাণ সকল মানুষের চোখের সামনে দাঁড়ায় ও যে কেউ তেমনটা দেখতে ইচ্ছা করে, সে তা দেখতে পায়।

১৪। প্রতিমাপূজার বিপক্ষে শাস্ত্রের কথা

[১] কিন্তু এসবকিছুর বিপক্ষে শ্রেয়তর সাক্ষ্য সেই পবিত্র শাস্ত্রেই রয়েছে যা বহু দিন আগে এশিক্ষা দিয়েছিল যে, *বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা, মানুষেরই হাতে গড়া: চোখ আছে, তবু দেখে না, মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না, কান আছে, তবু শোনে না, নাক আছে, তবু ঘ্রাণ পায় না, হাত আছে, তবু স্পর্শ করতে পারে না, পা আছে, তবু চলতে পারে না, নিজেদের গলায় কোন শব্দই উচ্চারণ করে না। সেগুলির মত হোক তারা, সেগুলি গড়ে যারা* (ক)।

এবিষয়ে নবীদেরও নিন্দার অভাব নেই, বাস্তবিকই তাঁদেরও লেখায় এসব যুক্তির খণ্ডন পাওয়া যায়, যেইভাবে পবিত্র আত্মা বলেন, *‘যারা দেবতা ও অসার মূর্তিগুলো খোদাই করল তারা সবাই লজ্জিত হবে; ও যাদের দ্বারা সেগুলো নির্মিত হল, তারা শুকিয়ে গেল। এবং মানুষদের মধ্যে অন্ধ যারা তারা সকলে মিলে একত্র হোক, সকলে উঠে দাঁড়াক! তারা কম্পিত ও লজ্জিত হোক। কেননা কর্মকার লোহা ধারাল করল, কুড়াল দিয়ে তাতে কাজে লাগল, হাতুড়ি দিয়ে কিছুটা গড়ল, ও তার শক্তিশালী হাত দিয়ে তা প্রস্তুত করল; সে ক্ষুধায় দুর্বল হবে, শ্রান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু জল খাবে না। কেননা ছুতোর কাঠ বেছে নিয়ে কম্পাস দিয়ে সেটার মাপ ঠিক করল, আঠা দিয়ে তা গড়ল, পুরুষের আদল ও মানুষের সৌন্দর্য অনুসারে তা তৈরি করল ও নিজের ঘরে তা বসিয়ে দিল—হ্যাঁ, ঠিক সেই কাঠ যা সে বন থেকে কেটে ফেলেছিল, যা প্রভু পুঁতেছিলেন, ও যা বৃষ্টি পুষ্ট করেছিল যাতে তা জ্বালানি কাঠ হয়ে মানুষের ব্যবহারে আসে ও মানুষ তার একটা অংশ নিয়ে আগুন পোহায়। এবং সেই কাঠ আগুনে দিয়ে তারা সেটার উপরে রুটি বানাল। কিন্তু বাকি কাঠ দিয়ে তারা দেবতা গড়ে তার উদ্দেশে প্রণিপাত করল, ও বাকি সেসব কিছুর অর্ধেক অংশ আগুনে পোড়াল। সেটার অর্ধেক অংশের উপরে সে মাংস ঝলসিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেল; ও আগুন পোহিয়ে বলল, ‘আহা, আমি কেমন খুশি যে আগুন পোহালাম ও আগুন দেখলাম!’* পরে সেই কাঠ পূজা করে বলল: *‘আমাকে উদ্ধার কর, তুমিই যে আমার ঈশ্বর!’ তারা এমনটা বুঝল না যে তাদের অন্ধ করা হয়েছিল যাতে তারা নিজেদের চোখে না দেখতে পায় ও হৃদয়-গভীরে না ভাবতে পারে। সে তো মনে মনে ভাবেনি, প্রাণেও উপলব্ধি করেনি যে সে সেটার একটা অংশ আগুনে পুড়িয়েছিল ও সেটার উত্তপ্ত কয়লায় রুটি বানিয়েছিল, মাংস ঝলসে নিয়ে খেয়েছিল, ও বাকি অংশ দিয়ে একটা জঘন্য বস্তু তৈরি করেছিল যা তারা উপাসনা করে। জেনে রাখ, তাদের হৃদয় ছাইমাত্র, তারা পথভ্রষ্ট, ও তারা কেউই নিজের প্রাণ উদ্ধার করতে পারে না। দেখ, ও এমনটা বলো না যে, আমার ডান হাতে মিথ্যা নেই* (খ)। [২] তবে যারা ঐশশাস্ত্র দ্বারা অভক্তি দায়ে অভিযুক্ত, তারা কেমন করে সবার দ্বারা ঈশ্বরবিহীন বলে বিচারিত হবে না? অথবা, সত্যের বদলে প্রাণহীন বস্তুকে উপাসনা করার জন্য যাদের যুক্তি এত স্পষ্টভাবে খণ্ডিত, তারা কেমন করে অপদূতগ্রস্ত

নয়? এবং যুক্তিক্ষমতাহীন ও অচল বস্তুগুলোতে ভরসা রেখে যারা সত্যকার ঈশ্বরের বদলে সেগুলোকে উপাসনা করে , তারা কেমন প্রত্যাশা বা ক্ষমার পাত্র হতে পারবে?

১৫। সেই সমস্ত বেদ-দেবী শালীন মানুষও ছিল না

[১] আহা, শিল্পী যদি তাদের জন্য এমন নিরাকার দেব-দেবীকে গড়ত যাতে প্রতিমাগুলোর অনুভূতিশূন্যতা সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন প্রমাণ না থাকত। প্রতিমাগুলো যে ইন্দ্রিয়গুলোর অধিকারী এবিষয়ে শিল্পীরা সরল মানুষদের মন প্রবঞ্চিত করতে পারত যদি প্রতিমাগুলোর ইন্দ্রিয়গুলোর প্রতীক যথা চোখ, নাক, কান, হাত ও মুখ না থাকত বরং সেই প্রতিমাগুলো হত অচল ও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ক্ষেত্রে যুক্তিক্ষমতা ও উপলব্ধি বিহীন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাগুলো সেই ইন্দ্রিয়গুলোর অধিকারী আবার অধিকারী নয়; সেগুলো সোজা কিন্তু নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম; ও বসা অবস্থায় থাকলেও বসে না; কেননা সেগুলো নিজেদের দৈহিক অঙ্গগুলো ব্যবহার করতে অক্ষম, কিন্তু তাদের নির্মাতা যেভাবে ইচ্ছা করেছিল, সেগুলো সেই অবস্থায় থেকে যায়। সেগুলো যে ঈশ্বরত্বের অধিকারী সেবিষয়েও সেগুলো কোন লক্ষণ দেখায় না; না, সেগুলো একেবারে নিষ্প্রাণ, ও সেগুলো যে জীবিত বলে প্রতীয়মান, তা শুধু মানব নৈপুণ্যের ফলাফল।

[২] আহা, তেমন মিথ্যা দেবতাদের ঘোষক ও নবী যারা (আমি কবি ও ইতিহাস-লেখকদের কথা বলছি), তারা যদি শুধু এ লিখত যে, সেগুলো দেবতা কিন্তু সেগুলোর কাজকর্মের কথা বর্ণনা না করত যা দেবতাদের ঈশ্বরত্বহীনতা ও লজ্জাকর আচরণ প্রমাণসিদ্ধ করে। তারা কেবল 'ঈশ্বরত্ব' নাম দ্বারাই সত্যকে প্রতারিত করতে পারত, বা, আরও সূক্ষ্ম কথা বলতে গেলে, তারা বহু মানুষের অসংখ্য ভিড়কে সত্য থেকে পথভ্রষ্ট করতে পারত। কিন্তু আপাতত, জেউসের প্রেমলীলা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যান্যদের অশ্লীল বালকপ্রীতি, ও নারী-উপভোগ সংক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাদের আশঙ্কা-ভয় ও কাপুরুষতা, অর্থাৎ এসবকিছু বর্ণনা করায় সেই কবি ও ইতিহাস-লেখকেরা নিজেদের যুক্তি খণ্ডন করা ছাড়া অন্য কিছুই করে না, অর্থাৎ তারা এমনটা দেখায় যে, তারা যে দেবতাদের কথা বর্ণনা করছে না তা শুধু নয়, সম্মাননীয় মানুষদের কথাও তারা বলছে না, বরং দুশ্চরিত্র জীবদের বিষয়ে এমন বর্ণনা দেয় যা সদ্‌গুণ থেকে বহু দূরে।

১৬। প্রতিমা সংক্রান্ত যুক্তি খণ্ডন

[১] তথাপি এমনটা হতে পারে যে, ভক্তিহীনেরা কবিদের বিশিষ্ট বর্ণনার ভঙ্গিতে আশ্রয় নিয়ে এমনটা মেনে নেবে যে, যা শূন্য তা উদ্ভাবন করা ও শ্রোতাদের চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে সত্যহীন রূপকথা তৈরি করা কবিদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য; তাছাড়া সেই ভক্তিহীনেরা বলবে যে, ঠিক এ কারণেই কবিরা দেব-দেবী সম্পর্কে এসমস্ত গল্প বানিয়েছে। কিন্তু সেই কবিরা এসমস্ত দেব-দেবী সম্পর্কে যে ধারণা ধারণ করে ও সমর্থন করে, তা থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে, উপরে উপস্থাপিত ধারণা কাঁচা একটা অজুহাত মাত্র ছাড়া আর কিছু নয়। [২] কেননা কবিদের লেখায় যা পাওয়া যায়, তা যখন তাদের নিজেদের উদ্ভাবন ও মিথ্যাকথা, তখন জেউস, ক্রনোস, হেরা, আরেস ও অন্যান্য দেব-দেবীকে যে নাম দেওয়া হয়েছে তাও মিথ্যা মাত্র। কিন্তু, যেভাবে তারা নিজেরা বলে, সেই অনুসারে হয় তো সেই নামগুলোও উদ্ভাবন করা হল, ও জেউস, ক্রনোস ও আরেস বলতে কোন ব্যক্তি নেই, কবিরাই শ্রোতাদের প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যেই প্রকৃত জীব বলে তাদের উদ্ভাবন করল। কিন্তু যা শূন্যতা মাত্র, কবিরা যখন তা উদ্ভাবন করে, তখন কেনই বা তারা সেই দেব-দেবীকে সত্যকার বলে উপাসনা করে? [৩] অথবা, হয় তো তারা এমনটাও কি বলবে যে, তারা নামগুলো উদ্ভাবন করেনি, কিন্তু সেগুলোর কাজকর্মেরই মিথ্যা বর্ণনা করল? কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তাদের একথাও একেবারে কাঁচা, কেননা যখন তারা সেগুলোর কাজকর্ম বিষয়ে মিথ্যাকথা বলল, তখন যাদের কাজকর্ম বর্ণনা করল সেই দেব-দেবীর নাম বিষয়েও মিথ্যাকথা বলল। আর যদি তারা নামগুলো ক্ষেত্রে সত্যবাদী, তাহলে সেই দেব-দেবীর কাজকর্ম বিষয়েও তারা অবশ্যই সত্যবাদী। তাছাড়া, যারা সেই গল্প বানাল যা অনুসারে এগুলো দেবতা, তারা এ অবশ্যই জানে যে, তেমন দেবতাদের কেমন কাজ করার কথা, ফলে যেমন এমন কেউ নেই যে জলের উপর আগুনের কর্মশক্তি আরোপ করে, তেমনি তারাও দেবতাদের উপরে মানব ধারণা আরোপ করত না; কেননা আগুনের ফলে গরম হয়, কিন্তু জল ঠাণ্ডা। [৪] তাই, যদি কাজকর্ম দেবতাদের যোগ্য হয়, তাহলে যে কেউ তেমন কাজকর্ম সম্পাদন করে সেও একটা দেবতা হবে; কিন্তু যখন ব্যভিচার ও উপরোল্লিখিত কাজকর্ম হলো মানুষের কাজকর্ম, এমনকি অসৎ মানুষেরই কাজকর্ম, তখন যারা তেমন কাজকর্ম করল তারাও

দেবতা নয়, মানুষই হবে। কেননা কাজকর্ম স্বভাবের অনুরূপ হওয়া চাই যাতে করে যে কাজ করে তার স্বভাব তার কাজের ফল থেকে জ্ঞাত হয় ও কাজকর্ম নিজ স্বভাব থেকে জ্ঞাত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, এমন কেউ যদি আগুন ও জল সম্পর্কে কথা বলত ও সেগুলোর ফলাফল বুঝিয়ে দিত, তবে সে এমনটা বলত না যে জল জ্বলে ও আগুন ঠাণ্ডা। একইপ্রকারে, এমন কেউ যদি সূর্য ও পৃথিবীর কথা বলত, তবে সে কি এমনটা বলত যে, পৃথিবী আলো ছড়ায় ও সূর্য গাছ-গাছালি ও ফল ফলায়? সে তেমন কিছু বললে তবে সে সবচেয়ে বড় উন্মাদনাও ছাড়িয়ে যেত। একইপ্রকারে গ্রীকদের ইতিহাস-লেখকেরা ও বিশেষ ভাবে সবচেয়ে নাম করা কবি যদি এমনটা জানত যে জেউস ও বাকি সবাই দেবতা ছিল, তাহলে তাদের উপর তেমন কাজকর্ম আরোপ করত না; এতে প্রমাণিত হয় যে, সেগুলো দেবতা নয় বরং মানুষ, এমনকি কামুক মানুষ। [৫] অথবা, কবি হিসাবে তারা যদি মিথ্যা বলত ও তুমি তাদের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত কর, তবে কেনই বা তারা বীরদের পুরুষত্ব সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি বরং সাহসের বদলে দুর্বলতা ও দুর্বলতার বদলে সাহস উদ্ভাবন করল? কেননা যেমন জেউস ও হেরা ক্ষেত্রে করেছিল, তাদের তেমনি [সাহসী] আখিল্লেস ক্ষেত্রে কাপুরুষতা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে হত ও [দুর্বল] থের্সিতেস ক্ষেত্রে শক্তির প্রশংসা করতে হত; [বুদ্ধিমান] অদিসেওস ক্ষেত্রে নির্বুদ্ধিতা আক্রমণ করতে হত ও [প্রজ্ঞাবান] নেস্তর ক্ষেত্রে উন্মাদনা উদ্ভাবন করতে হত; [বীর্যবান] দিওমেদেস ও হেক্তরের নারীসুলভ কাজকর্ম সম্পর্কে ও [কোমল] হেকুবার প্রকাশিত সাহস সম্পর্কে রূপকথা বলতে হত [ক]। কেননা তারা নিজেরা যেমনটা বলে, কবিরা সব ক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও মিথ্যা বলতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ ক্ষেত্রে তারা সত্য বলল, কিন্তু তথাকথিত দেব-দেবী ক্ষেত্রে মিথ্যা বলতে ভয় পায়নি। [৬] কেননা তাদের মধ্যে কেউ না কেউ বলতে পারত যে, তারা যখন উচ্ছৃঙ্খল কর্মের কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে, কিন্তু তাদের প্রশংসাবাদে তারা যখন দেব-দেবীর পিতা, স্বর্গে রাজ্যভার বহনকারী সর্বোচ্চ ও অলিম্পীয় দেবতা সেই জেউসের কথা বলে, তখন তারা উদ্ভাবন করে না, সত্যিকথা বলে। কিন্তু আমি শুধু নয়, অন্য যেকোন একজনও এই যুক্তি তাদের বিপক্ষে ফেরাতে পারে, কেননা আগে উপস্থাপিত প্রমাণ এমনটা দেখাবে যে, সত্য তাদের বিপক্ষে, কেননা দেবতাদের কাজকর্ম এমনটা প্রমাণ করে যে তারা মানুষ

ছিল, কিন্তু তাদের প্রশংসাবাদ মানব স্বভাবের অতীত। তবে এসবকিছুর প্রতিটা যুক্তি অসঙ্গত, কেননা স্বর্গীয় প্রাণীরা যে সেইভাবে ব্যবহার করবে তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং এমন একজন নেই যে এমনটা মেনে নেবে যে, যারা সেইভাবে ব্যবহার করে তারা দেবতা।

১৭। দেবতাদের অশ্লীল কর্মকাণ্ড সত্য, ও তাদের ঈশ্বরত্ব মিথ্যা

[১] তবে দেবতাদের বিষয়ে প্রশংসাবাদ যে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত, কিন্তু তাদের উপরে আরোপিত কাজকর্ম যে সত্য, একথা ছাড়া আমাদের অন্য কী বা অনুমান করার আছে? যেকোন একজন স্বীকার করবে যে, এসমস্ত কিছু সাধারণ ব্যবহারের ফল। কেননা এমন কেউ নেই যে তারই প্রশংসা করে যার আচরণ সে নিন্দা করে, বরং যাদের কাজকর্ম অসম্মানজনক তাদের উপরে সেই কবিরা প্রশংসার পর প্রশংসা আরোপ করে যেহেতু সেই কাজকর্ম নিন্দনীয়, ও সেইভাবে নিজেদের অতি উচুঁ বানানো কথা দ্বারা তারা শ্রোতাদের প্রবঞ্চিত করে ও যাদের স্তুতিগান করে তাদের দুষ্কর্ম লুকিয়ে রাখে। [২] সেই অনুসারে, কেউ যদি অন্য একজনের স্তুতিবাদ করবে বলে মনস্থ ক'রে সেই ব্যক্তির লজ্জাকর ব্যবহারের কারণে তার আচরণ বা সচরিত্রতা থেকে নিজের স্তুতিবাদের জন্য কোন ভিত্তি না পেত, সে অন্য ভাবে অর্থাৎ অতিরিক্ত তোষামোদ দ্বারা সেই ব্যক্তির প্রশংসা করত। একইপ্রকারে, গ্রীকদের কবিদের মধ্যে যে সবচেয়ে নাম করা, তাদের তথাকথিত সেই দেবতাদের অসম্মানজনক কাজকর্মের সামনে বিহ্বল হয়ে সে তাদের উপরে অতিমানবীয় নাম আরোপ করলেন, একথা না ভেবে যে, সেই দেবতাগুলো সেই অতিমানবীয় পরিকল্পনা দ্বারা নিজেদের মানবীয় কাজকর্ম ঢেকে রাখতে পারত না, বরং নিজেদের মানবীয় দুর্বলতা দ্বারা এমনটা প্রমাণ করত যে, ঐশ্বরিক কোন ধারণা তাদের বিষয়ে শোভা পেত না। [৩] ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, সেই কবিরা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দেবতাগুলোর ভাবাবেগ ও কাজকর্ম বিষয়ে কথা বলল। কেননা যেহেতু সেই কবিরা শাস্ত্র অনুযায়ী সেই *অনির্বচনীয় নাম* [ক] ও ঈশ্বরকে দেয় সম্মান এমন জীবদের উপরে আরোপ করতে আগ্রহী ছিল যে জীবগুলো ঈশ্বর নয় বরং মরণশীল মানুষমাত্র—ও তাদের এ দুঃসাহস মহৎ ও অধিক নিন্দনীয়—সেজন্য এই কারণে তারা সেগুলোর ভাবাবেগ অনিচ্ছাকৃত ভাবে ব্যক্ত করতে সত্য দ্বারা বাধ্য হল যাতে করে পরবর্তী যুগের

সকল মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, দেবতাগুলো সংক্রান্ত বইগুলোতে উপস্থাপিত তাদের যে ভাবাবেগ, তাদের সেই লজ্জাকর ভাবাবেগই এমন একটা প্রমাণ যে তারা ঈশ্বর ছিল না।

১৮। দেবতাগুলো সম্পর্কে অতিরিক্ত বক্তব্য

[১] সেগুলো যে দেবতা, সেসম্পর্কে তাদের ভক্তরা কোন প্রতিরক্ষা বা কোন প্রমাণ দেখাতে পারত? কেননা যা আমরা উপরে বলে এসেছি, আমাদের উপস্থাপিত যুক্তি স্পষ্ট করল যে তারা মানুষমাত্র, এমনকি সম্মানের যোগ্য মানুষও নয়। তবু হয় তো এমনটা হতে পারে যে তারা অন্য একটা যুক্তি উপস্থাপন করতে চেষ্টা ক'রে সেই বিষয়ের উপর জোর দেবে যা জীবনের উপকারের লক্ষ্যে দেবতাদের দ্বারা উদ্ভাবন করা হল; এক্ষেত্রে তারা বলবে, দেবতারা এজন্যই প্রশংসার যোগ্য কারণ তারা মানুষের উপকার করল। সেই অনুসারে জেউস বিষয়ে বলা হয়, সে ভাস্কর্য সংক্রান্ত শিল্পকর্ম অনুশীলন করল, পসেইদোন কর্ণধার সংক্রান্ত, হেফাইস্তস কামারগিরি সংক্রান্ত, আথেনা বয়ন সংক্রান্ত, আপল্লোস গান-বাজনা সংক্রান্ত, আর্তেমিস শিকার সংক্রান্ত, হেরা বয়ন সংক্রান্ত, দেমেত্রা কৃষিকার্য সংক্রান্ত, ও অন্যান্য দেবতা নিজ নিজ শিল্পকর্ম অনুশীলন করল, যেভাবে তারা বর্ণনা করেছিল যারা তাদের বিষয়ে কথা বলেছিল। [২] কিন্তু উল্লিখিত ও সদৃশ শিল্পকর্ম কেবল দেবতাদের উপরে নয়, কিন্তু সাধারণ মানব প্রকৃতির উপরেও আরোপণীয়, কেননা প্রকৃতিকে লক্ষ করেই মানুষ শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করল, কেননা সাধারণত শিল্পকর্ম প্রকৃতির অনুকরণ বলে অভিহিত। ফলত, যখন দেবতারা যে যে শিল্পকর্ম অনুশীলন করত তাতে দক্ষ হল, তখন একজন অবশ্যই তাদের দেবতা বলে নয়, কিন্তু মানুষ বলে গণ্য করবে, কেননা শিল্পকর্ম তাদের উপর নির্ভর করেনি কিন্তু তেমন শিল্পকর্ম সম্পাদনে দেবতারাও প্রকৃতির অনুকরণ করল। [৩] কেননা যেহেতু সংজ্ঞার্থ অনুসারে মানুষ স্বভাবতই জ্ঞান লাভে সক্ষম, সেজন্য এতে বিস্মিত হওয়ার এমন কিছু নেই যে, দেবতারাও মানব উপলব্ধি দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি পরীক্ষা করল ও তেমন জ্ঞান অর্জন করার পর শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করল। অথবা, সেই কবিরা যদি এমনটা বলে যে, শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করল বিধায় সেগুলোকে দেবতা বলে ডাকা ন্যায়সঙ্গত, তাহলে এক্ষণি সেই ক্ষণ এসে উপস্থিত হয় যে ক্ষণে যে যে মানুষ অন্য শিল্পকর্ম উদ্ভাবন

করল তাদের সকলকেও দেবতা বলে ডাকা উচিত, সেই একই যুক্তির জোরে যা অনুসারে দেবতারা তেমন নামের যোগ্য বলে গণ্য হল। ফৈনিকিয়ার অধিবাসীরা বর্ণমালাকে, হোমের মহাকব্যকে, জেনো এলেয়া-দ্বন্দ্ববিদ্যাকে, সিরাকিউজ বাসী করাক্স অলঙ্কারশাস্ত্রকে, আরিস্তাইয়স মোউচাষকে, ত্রিপ্তলেমোস বপনবিদ্যাকে, স্পার্তা নিবাসী লিকুর্গোস ও এথেন্স নিবাসী সলোন আইনকে, পালামেদেস কলা, সংখ্যা, পরিমাপ ও ওজনকে উদ্ভাবন করল, এবং অন্যান্যরা এমন কিছু ব্যক্ত করল যা মানব জীবনের জন্য উপকারী—যেইভাবে ইতিহাস-লেখকগণ সাক্ষ্যদান করে। [৪] অতএব, শিল্পকর্ম যখন ঈশ্বরীকৃত করে ও শিল্পকর্ম আছে বিধায় খোদাই করা দেব-দেবী আছে, তখন এটা দাঁড়ায় যে, যারা পরবর্তী যত শিল্পকর্ম উদ্ভাবন করল, সেই কবিদের বিবেচনা ক্রমে তারাও দেবতা। এবং যদি তারা এদের ঐশ্বরিক মর্যাদার অযোগ্য মনে করে কিন্তু এদের মানুষমাত্র স্বীকার করে, তাহলে এমনটা দাঁড়ায় যে, জেউস, হেরা ও বাকি অন্যান্য দেবতাকে দেবতা বলে অভিহিত করা উচিত নয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে তারাও মানুষ ছিল, ও তাছাড়া তারা সম্মানেরও অযোগ্য ছিল, যেইভাবে তাদের খোদাই করা মূর্তি দ্বারা তারা মানুষমাত্র বলে প্রমাণিত।

১৯। দৃশ্যমান প্রতীকে ব্যক্ত ঐশস্বরূপ

[১] গ্রীকেরা নর-নারীর আকারে বা সব ধরনের পাখি, গৃহপালিত বা বন্য চতুষ্পদ, সরিসৃপ, স্থল, সমুদ্র ও জল-জগৎ যা কিছু উৎপাদন করে সেই সমস্ত কিছু অর্থাৎ তেমন যুক্তিক্ষমতাহীন নিম্নস্তরের জীবদের আকারে ছাড়া অন্য কোন্ আকারে নিজেদের মূর্তিগুলোকে খোদাই করে? কেননা যখন মানুষ উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অযুক্তির হাতে পতিত হল ও দৈহিক তৃপ্তি ও কামনা-বাসনা ছাড়া অন্য কিছুই আর দেখল না যেহেতু তারা এই সমস্ত যুক্তিক্ষমতাহীন বস্তুর উপরেই নিজেদের মন স্থির করছিল, তখন যা ঐশ্বরিক, তাও নিজেদের নানাবিধ ভাবাবেগ অনুসারে যুক্তিক্ষমতাহীন আকারে গড়ল ও তত সংখ্যক দেবতাকে খোদাই করল। [২] বাস্তবিকই তাদের চতুষ্পদ জন্তু, সরিসৃপ ও পাখির মূর্তি আছে, যেইভাবে দিব্য ও সত্যকার ভক্তির ব্যাখ্যাতা বলেন, *তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা অসার হয়ে গেছে, তাদের অবোধ মনও অন্ধকারময় হয়ে গেছে। নিজেদের প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে তারা মূর্খ হয়েছে, এবং অক্ষয়শীল ঈশ্বরের*

গৌরবকে ক্ষয়শীল মানুষের, পাখির, চতুষ্পদের ও সরিসৃপের সাদৃশ্যে গড়া প্রতিমূর্তির সঙ্গে বিনিময় করেছে। এজন্য ঈশ্বর অসম্মনের আবেগে তাদের ছেড়ে দিলেন (ক)। কেননা, আমি যেমন উপরে বলেছি, মানুষেরা নিজেদের প্রাণ যুক্তিক্ষমতাহীন পরিতৃপ্তির হাতে সঁপে দেওয়ার ফলে নিজেদের দেবতাগুলোকেও সেইভাবে গড়ায় পতিত হল, এবং একবার পতিত হলে মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করার ফলে নিজে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে সেইভাবে নিজের পরিতৃপ্তিতে গড়াগড়ি দেয় ও বাণীর পিতা সেই ঈশ্বরকে নানা পশুর আকারে অঙ্কিত করে।

[৩] নিজেদের দেবতাগুলো সম্পর্কে কিছুটা বলতে বাধ্য হলে গ্রীক সেই তথাকথিত দার্শনিকেরা ও প্রজ্ঞাবান মানুষেরা এমনটা অস্বীকার করে না যে, তাদের দৃশ্যমান দেবতাগুলো হলো মানুষের ও জন্তুদের আকারে ও আদলে গড়া। কিন্তু নিজেদের আত্মরক্ষায় তারা বলে, তারা সেগুলোকে রাখে যাতে সেগুলোর মাধ্যমে দৈবত্ব তাদের সাড়া দিতে ও আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কেননা যা অদৃশ্য, তা তেমন মূর্তি ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাড়া অন্য ভাবে জ্ঞাত হতে পারে না। [৪] এবং এদের চেয়ে যারা আরও শ্রেয়তর দার্শনিক ও যারা নিজেদের আরও বেশি গভীরতর দার্শনিক মনে করে, তারা এই যুক্তি উপস্থাপন করে যে, এই মূর্তিগুলো দিব্য দূতদের ও প্রতাপগুলোর আহ্বান ও আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যেই গড়া হয়েছে ও গঠন করা হয়েছে যাতে তেমন মাধ্যমগুলো দ্বারা আত্মপ্রকাশ করলে তারা মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পর্কে অবগত করতে পারে। এবং তারা বলে, তেমন মূর্তিগুলো মানুষের কাছে অক্ষর যেন, যাতে তা পড়ে মানুষ মূর্তিগুলোর মাধ্যমে ঘটিত দিব্য দূতদের আত্মপ্রকাশ থেকে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে আসতে পারে। এটা হলো তাদের পুরাণতত্ত্ব, কেননা এটা ঐশতত্ত্ব নয়; হ্যাঁ, এটা যে ঐশতত্ত্ব তা দূরের কথা। কিন্তু যে কেউ যত্ন সহকারে তাদের এ যুক্তি পরীক্ষা করবে, সে দেখতে পাবে যে তাদের এই অভিমত উপরে উপস্থাপিত সেই অন্যান্য অভিমত থেকে তত আলাদা নয়।

২০। এতক্ষণে উপস্থাপিত অভিমতসমূহ অসার

[১] সত্য বিচারাসনে (ক) এগিয়ে এসে একজন তাদের বলতে পারত: কেমন করে ঈশ্বর উত্তর দেন বা তেমন বস্তুগুলোর মাধ্যমে নিজেকে জ্ঞাত করেন? সেগুলো যে পদার্থ

দ্বারা গড়া সেই পদর্থের মাধ্যমে কি? নাকি সেগুলোর আকারের মাধ্যমে? কেননা তেমনটা পদার্থের মাধ্যমে ঘটলে তবে আকারের কী দরকার আছে ও কেনই বা ঈশ্বর সেগুলো নির্মিত হওয়ার আগে আদৌ যেকোন একটা পদার্থের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেননি? এবং তারা যে একটা মন্দিরের প্রাচীরের অভ্যন্তরে একটা পাথর বা এক টুকরো কাঠ বা একটু সোনা পরিবেষ্টন করে নিজেদের সেই মন্দিরগুলো নির্মাণ করল, তা বৃথা কাজ, কেননা গোটা জগৎ তেমন পদার্থে পূর্ণ। [২] তথাপি, সেগুলোতে যে আকার দেওয়া হল, সেই আকারই যদি দিব্য আত্মপ্রকাশের কারণ হয়, তাহলে পদার্থ, সোনা ও বাকি সবকিছুর কী দরকার আছে? এবং সেই মূর্তিগুলো যে প্রাকৃতিক জীবদের আকার বহন করে, ঈশ্বর কেনই বা সেই প্রাকৃতিক জীবদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেন না? কেননা একই যুক্তিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মানুষের ধারণা আরও শ্রেয়তর হত যদি তিনি যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট বা যুক্তিক্ষমতাহীন জীবন্ত প্রাণীদের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতেন, ও তাঁর বিষয়ে প্রাণহীন ও অচলা বস্তুগুলোর মাধ্যমে অনুসন্ধান করা না হত। [৩] এতেই তারা বিশেষভাবে নিজেদের বিরুদ্ধে অভক্তি-কর্ম সাধান করে; কেননা যদিও তারা প্রকৃত পশু, জন্তু, পাখি ও সরিসৃপদের জঘন্য মনে করে ও সেগুলোকে তাদের হিংস্রতা বা মলিনতার কারণে এড়ায়, তবু পাথর, কাঠ ও সোনা দিয়ে সেগুলোর মূর্তি তৈরি করায় তারা সেগুলোর প্রতিকৃতি ঈশ্বরীকৃত করে। অথচ তাদের পক্ষে এটাই আরও ভালো হত যদি তারা পশুগুলোর প্রতিকৃতির পায়ে না পড়ে প্রকৃত পশুদেরই পূজা করত। [৪] কিন্তু এমনটাও হতে পারে যে এ দু'টোর একটাও অর্থাৎ সেগুলোর আকার বা পদার্থই যে ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণ তা নয়, বরং আসল কারণ হলো সেই নিপুণ শিল্পকর্ম যা দৈবত্বকে আহ্বান করে যেহেতু তেমন শিল্পকর্ম হলো প্রকৃতির অনুকরণ। কিন্তু তবুও যদি নৈপুণ্যের জোরেই দৈবত্ব মূর্তিগুলোতে বিদ্যমান, তবে এবারও পদার্থের এমন কি দরকার আছে যখন নৈপুণ্য জিনিসটা মানুষের মধ্যে রয়েছে? স্বল্প কথায়, যদি ঈশ্বর শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকাশ্যমান হন ও সেই ভিত্তিতে মূর্তিগুলো দেবতা বলে পূজিত হয়, তাহলে যারা সেই শিল্পকর্মের নিপুণ কারিগর তাদেরই পূজিত ও সম্মানিত করা দরকার হত, যেহেতু তারা যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট ও নিজেরা তেমন নৈপুণ্যের অধিকারী।

২১। দিব্য দূতদের মাধ্যমে ঐশ আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে

[১] তাদের দ্বিতীয় ও গভীরতর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একজন যুক্তি সহকারে এই ধরনের আপত্তি ব্যক্ত করতে পারে। হে গ্রীকেরা, তোমরা যদি স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের জন্য এই মূর্তিগুলো নির্মাণ করে না থাক, কিন্তু সেই দূতদের উপস্থিতির জন্যই তেমনটা করে থাক, তাহলে যে প্রতাপগুলোকে তোমরা তাদের মাধ্যমে আহ্বান কর, কেনই বা সেই মূর্তিগুলোকে সেই প্রতাপগুলোর ঊর্ধ্বেই উন্নীত কর? কেননা তোমাদের নিজেদের দাবি অনুসারে যদি এমনটা হয় যে ঈশ্বরজ্ঞান অর্জনের খাতিরেই তোমরা মূর্তিগুলোকে খোদাই কর, ও তারপরে ঈশ্বরকে দেয় সম্মান ও নাম সেই মূর্তিগুলোতে আরোপ কর, তাহলে তোমরা ঈশ্বরনিন্দা অভিযোগে দায়ী। [২] কেননা তোমরা স্বীকার কর ঈশ্বরের প্রতাপ মূর্তিগুলোর ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে ও সেই ভিত্তিতে তোমরা ঈশ্বরকে নয় কিন্তু নিম্নতর প্রতাপগুলোই আহ্বান কর, কিন্তু তারপরে এই শেষ কথা পিছনে ফেলে রেখে তোমরা যাঁর উপস্থিতি ভয় পাও তাঁর নাম পাথর ও কাঠের উপর আরোপ কর ও সেগুলোকে পাথর ও মানব নৈপুণ্য বলে না ডেকে ঈশ্বর বলে ডাক ও উপাসনাও কর। কেননা তোমরা যেমন মিথ্যায় দাবি রাখ, সেই অনুসারে সেগুলো যদি তোমাদের জন্য ঈশ্বর-দর্শনের লক্ষ্যে অক্ষর স্বরূপ হয়, তাহলে প্রতীক যা নির্দেশ করে সেটার উপরে প্রতীককে উন্নীত করা অন্যায়। যে কেউ রাজার নাম লিখত, তার পক্ষে রাজার উপরে নিজের লেখাটা উন্নীত করা ভুল হত; তেমন মানুষ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত যেহেতু লেখাটা লেখকের নৈপুণ্যের দ্বারা গড়া। [৩] তেমনিভাবে, তোমাদেরও যদি বলবান যুক্তিক্ষমতা থাকত, তাহলে তোমরাও তেমন মহৎ বিষয়ে দৈবত্বের আত্মপ্রকাশ স্থানান্তর করতে না, মূর্তিকেও ভাস্করের ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে না। কেননা যদি অক্ষর হিসাবে সেগুলো সত্যিই ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ নির্দেশ করে, তাহলে সেই ভিত্তিতে ঈশ্বরের প্রতীক হিসাবে সেই অক্ষরগুলো দৈবত্বের অধিকারী হবার যোগ্য। কিন্তু সেই অনুসারে যে মানুষ অর্থাৎ যে শিল্পী সেগুলো খোদাই করল ও ঢালাই করল, সে যখন তার তৈরী মূর্তিগুলোর চেয়ে প্রতাপশালী ও ঐশ্বরিক, তখন তাকেই ঈশ্বরীকৃত হতে হত যেহেতু মূর্তিগুলো তার ইচ্ছামতই খোদাই করা হয়েছিল ও গড়া হয়েছিল। তাই যখন প্রতীকচিহ্নসমূহ সম্মানের যোগ্য, তখন সেগুলো যে লিখেছে সে নিজের শিল্পকর্ম ও স্বভাবগত নৈপুণ্যের ভিত্তিতে

আরও বেশি সম্মাননীয়। অতএব, যখন এই যুক্তির ভিত্তিতে সেগুলোকে ঈশ্বর বলে মনে করা ন্যায়সঙ্গত নয়, তখন একজন সেই গ্রীকদের কাছে পুনরায় প্রতিমাগুলোর উন্মাদনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারত যাতে করে সেই কারণ জানা যেতে পারে যার জন্য সেগুলো ঠিক সেইভাবে গঠিত।

২২। ক্ষয়শীল মূর্তি অক্ষয়শীল ঈশ্বরকে দেখাতে অক্ষম

[১] দৈবত্ব মানব গঠনের অধিকারী বলেই মূর্তিগুলোও সেইভাবে গঠিত, ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে তারা কেন দৈবত্বকে পশুদের গঠন আরোপ করে? এবং তার গঠন যুক্তিক্ষমতাহীন পশুদের গঠন হলে, কেন তারা তাকে যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণীদেরও গঠন আরোপ করে? কিন্তু দৈবত্ব যদি একইসঙ্গে দু'টোই হয় ও গ্রীকেরা ঈশ্বরকে উভয়ভাবে উপলব্ধি করে যেহেতু তিনি যুক্তিক্ষমতাশূন্য ও যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট জীবদের গঠনের অধিকারী, তাহলে যা সংযুক্ত তারা কেন তা বিযুক্ত করে এবং পশু ও মানুষের মূর্তিগুলোর মধ্যে পার্থক্য রাখে, এমনকি তাকে সবসময় বহুরূপী বলে প্রদর্শন করে না যেইভাবে পুরাণের প্রতিকৃতি সেই স্কিল্লা, খারিব্দিস, সেই হিপ্পকেন্তাউরোস ও মিশরীয় কুকুর-মাথা বিশিষ্ট সেই আনুবিস বহুরূপী বলে প্রদর্শিত? কেননা সেগুলো প্রকৃতিতে যেমন, সেই অনুসারে হয় সবসময় শুধু দ্বৈতভাবে প্রদর্শিত করা উচিত, না হয় সেগুলোর একক গঠনের অধিকারী হলে তবে দ্বিতীয় গঠনটা সেগুলোতে আরোপ করা উচিত নয়। আরও, সেগুলোর গঠন পুরুষতুল্য হলে তবে তারা কেন সেগুলোতে নারীতুল্য গঠন আরোপ করে? কিন্তু গঠনটা নারীতুল্য হলে কেন তারা মিথ্যা করে সেগুলোতে পুরুষতুল্য গঠন আরোপ করে? এবং সেগুলো মিশ্রিত গঠনের অধিকারী হলে তবে গঠন দু'টো পৃথক করা উচিত নয় বরং দু'টোই একইসাথে প্রদর্শিত হওয়া উচিত; তাতে সেগুলো সেই তথাকথিত উভয়লিঙ্গের প্রাণীর মত হবে যার ফলে তাদের কুসংস্কার দর্শকদের কেবল অভক্তি ও নিন্দার নয়, হাসাহাসিরও একটা অজুহাত যুগিয়ে দেবে। [২] স্বল্প কথায়, তারা যদি এমনটা ধরে নেয় যে দৈবত্ব গঠনে দৈহিক, যার ফলে তারা তার জন্য পেট, হাত ও পা, এমনকি ঘাড়, স্তন ও প্রজনন-দরকারী অঙ্গও কল্পনা করে ও তেমনটা গড়ে, তাহলে দেখ তারা কেমন অভক্তিময় ও ঈশ্বরনিন্দাজনক পর্যায়েই না নেমে গেছে যে, দৈবত্ব সম্পর্কে তেমন কিছু ধারণা করে। কেননা এ থেকে এমনটা দাঁড়ায় যে,

দৈবত্ব দেহের অন্যান্য পরিবর্তনের অধীন যেমন কাটাকাটি, অঙ্গ-ছেদন, এমনকি সম্পূর্ণরূপে অবক্ষয়। কিন্তু এসবকিছু ও যা কিছু এসবকিছুর সদৃশ, তা ঈশ্বরের নয়, কিন্তু মর্ত থেকে আগত দেহের বৈশিষ্ট্য। [৩] কেননা ঈশ্বর অশরীরী, অক্ষয়শীল, অমর ও কোন কিছুর অভাবী নন, কিন্তু এই সমস্ত মূর্তি ক্ষয়শীল, দেহের ছবিস্বরূপ, ও দেহের যে যত্ন প্রয়োজন সেগুলোরও সেই একই যত্ন দরকার যেইভাবে উপরে বলা হয়েছে। তাই আমরা প্রায়ই দেখি, পুরাতন মূর্তিগুলোকে নবীকৃত করা হয়, ও যেগুলোকে কাল, বর্ষা বা পৃথিবীর কোন না কোন জন্তু নষ্ট করেছে, সেগুলো সংস্কার করা হয়। এই ভিত্তিতে একজন গ্রীকদের উন্মাদনার নিন্দা করতে পারে, কেননা নিজেরা যা বানিয়েছে তা দেবতা বলে ঘোষণা করে; তারা নিজেদের দক্ষতায় যা কিছু অবক্ষয় থেকে সংরক্ষণ করার জন্য অলঙ্কৃত করে, সেই সবকিছুর কাছে রক্ষা প্রার্থনা করে; যা কিছু তারা জানে তাদের নিজেদের যত্ন দরকার, সেই সমস্ত কিছুর কাছে এমন যাচনা রাখে যাতে তাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটে যায়; এবং যা কিছু তারা ক্ষুদ্র কক্ষে গণ্ডিবদ্ধ রাখে, সেইসব কিছু তারা স্বর্গের ও গোটা পৃথিবীর প্রভু বলে ডাকতে লজ্জাবোধ করে না।

২৩। বহুবিধ বলেই প্রতিমাগুলো মিথ্যা

[১] কেবল উল্লিখিত প্রমাণ থেকে যে একজন তাদের ঈশ্বরহীনতা উপলব্ধি করতে পারে তা নয়, তেমন ঈশ্বরহীনতা এ থেকেও অনুমান করা যায় যে, প্রতিমা সংক্রান্ত তাদের ধারণাসমূহ একমত নয়। কেননা, যেইভাবে তারা দাবি করে ও শেখায়, সেই অনুসারে সেই প্রতিমাগুলো ঈশ্বর হলে তবে সেগুলোর কোন্‌টাকে আঁকড়িয়ে ধরা উচিত ও সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা সবচেয়ে প্রতাপশালী গণ্য করা উচিত যাতে করে একজন ভরসার সঙ্গে ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারে অথবা কমপক্ষে (যেইভাবে তারা দাবি করে) যাতে করে সে সেগুলোর মধ্যে দৈবত্বকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার অধীন না হয়? কেননা একই প্রতিমাগুলো সকলের দ্বারা দেবতা বলে স্বীকৃত নয়, বরং প্রতিটি দেশের জন্য আলাদা একটা দেবতাকে উদ্ভাবন করা হয়। [২] উদাহরণ স্বরূপ, মিশরীয়রা যেগুলোকে দেবতা বলে মানে, ফৈনিকীয়রা সেগুলোকে মানে না; একইপ্রকারে ফৈনিকীয়রা যে প্রতিমাগুলো উপাসনা করে, মিশরীয়রা সেগুলোকে উপাসনা করে না। স্কুথীয়রা পারস্যদের দেবতাগুলোকে মনে না, ও পারস্যরা সিরীয়দের

দেবতাগুলোকে মানে না; পেলাস্‌গীয়রাও থ্রাকীয়দের দেবতাগুলোকে মনে না, ও থ্রাকীয়রাও থেবীয়দের দেবতাগুলোকে মানে না। হিন্দুস্তানীয়রা আরবীয়দের চেয়ে ভিন্ন, ও আরবীয়রা ইথিয়পীয়দের চেয়ে ভিন্ন, ও দেবতাগুলো ক্ষেত্রে তারা বিপরীত। সিরীয়রা কিলিকিয়ার দেবতাগুলোকে উপাসনা করে না, ও কাপ্পাদকীয় জনগণ অন্যগুলোকেই দেবতা বলে মানে যেগুলো কিলিকীয়দের দেবতাগুলো থেকে ভিন্ন। বিথিনীয়রা নিজেদের জন্য অন্য অন্য দেবতাকে উদ্ভাবন করল, ও আর্মেনীয়রাও ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগুলোকে কল্পনা করল। আমি কেন তত উদাহরণ উপস্থাপন করছি? যারা স্থলে বসবাস করে তারা এমন দেবতাগুলোকে উপাসনা করে যেগুলো দ্বীপবাসীদের দেবতাগুলো থেকে ভিন্ন, ও দ্বীপবাসীরা অন্য দেবতাগুলোকে উপাসনা করে যেগুলো স্থলের দেবতাগুলো থেকে ভিন্ন। [৩] এক কথায়, প্রতিটি শহর ও গ্রাম নিজের প্রতিবেশীদের দেবতাগুলো স্বীকার না করে নিজ নিজ দেবতাগুলোকে পছন্দ করে ও কেবল সেগুলোকেই দেবতা বলে মানে। মিশরে যে নানা জঘন্যতা ঘটে সেবিষয়ে কিছুই না বলা ভাল, কেননা সকলের কাছে এ স্পষ্ট যে, শহরগুলো এমন উপাসনা-কর্ম পালন করে যেগুলো পারস্পরিক বিপরীত ও প্রতিকূল, এবং স্থানীয় বাসিন্দারা সাগ্রহে এমন দৈবত্বগুলো উপাসনা করে যেগুলো তাদের প্রতিবেশীদের চেয়ে বিপরীত। এজন্য যে কুমির কারও কারও দ্বারা দেবতা বলে পূজিত, তাদের প্রতিবেশীদের ধারণায় সেই কুমির ঘৃণার বস্তু বলে গণ্য। আরও, অন্যান্যদের দ্বারা যে সিংহ দেবতা বলে পূজিত, তাদের প্রতিবেশীরা সিংহকে যে পূজা করে না তা শুধু নয়, বরং সিংহকে পেলে তা বন্য জন্তু বলে মারে। কারও কারও দ্বারা পূজিত যে মাছ, অন্যান্যদের দ্বারা খাদ্য বলে ব্যবহৃত। সেজন্য তাদের মধ্যে যুদ্ধ-সংগ্রাম, দলাদলি ও খুনের জন্য যত অজুহাত ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি যত অসংযম পাওয়া যায়। [৪] এবং সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় এটা যে, ইতিহাস-লেখকদের কথা অনুসারে সেই পেলাস্‌গীয়রা মিশরীয়দের কাছ থেকেই দেবতাগুলোর নাম শেখা সত্ত্বেও মিশরীয়দের দেবতাগুলোকে মানে না বরং এমন দেবতাগুলো উপাসনা করে যেগুলো মিশরীয়দের দেবতাগুলো থেকে ভিন্ন। এক কথায়, প্রতিমাপূজার তেমন উন্মাদনায় আক্রান্ত সেই সমস্ত জাতি নিজ নিজ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রাখে ও তাদের উপাসনা-কর্মও ভিন্ন ধরনের; হ্যাঁ, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বলতে কিছই পাওয়া যায় না। এটা হলো তাদের ন্যায়সঙ্গত

ভাগ্য। [৫] কেননা একমাত্র ঈশ্বর-দর্শন থেকে দূরে সরে যাওয়া মাত্রই তারা নানা ধরনের বহু উপাসনা-কর্মে পতিত হল; তারা যখন পিতার সত্যকার বাণীকে তথা সবার ত্রাণকর্তাকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন তাদের মনও যে বহু দিকে সরে যাবে তা ন্যায়সঙ্গত। এবং যারা অন্ধকারময় ছায়ায় বাস করার জন্য সূর্য থেকে সরে যায়, তারা যেমন সামনাসামনির পথ না দেখে বরং যে পথ নেই সেই পথ আছে বলে কল্পনা ক'রে ও *দেখেও না দে'খে* (ক) বহু উদ্দেশবিহীন পথ ধরে ঘুরতে থাকে, তেমনিভাবে যারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করল ও নিজেদের প্রাণ অন্ধকারাচ্ছন্ন করল, তারা নিজেদের মন ভ্রান্ত করল ও মাতাল ও অন্ধ মানুষের মত এমন কিছু কল্পনা করে যার কোন অস্তিত্ব নেই।

২৪। এক দেশের প্রতিমা অন্য দেশের বলি

[১] যা বলা হয়েছে, তা যে তাদের প্রকৃত ঈশ্বরহীনতা-খণ্ডন এমন নয়। কেননা তাদের দেব-দেবী শহর ও স্থান অনুযায়ী বহু ও নানা ধরনের, এবং যেহেতু এক একটা পরের দেবতাকে ধ্বংস করে, সেজন্য সবগুলো সবগুলো দ্বারা ধ্বংসিত হয়। এমনকি যেগুলো কারও কারও ধারণায় দেবতা, সেগুলো এমন কারও কারও উদ্দেশে বলিদান ও পানীয় নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহৃত যেগুলোকে অন্যরা দেবতা বলে মানে, এবং এভাবে কারও কারও বলি হলো কারও কারও দেবতা। মিশরীয়রা বলদকে ও বাছুর সেই আপিসকে পূজা করে, কিন্তু অন্যরা এগুলোকে জেউসের উদ্দেশে বলি দেয়। কেননা তারা যে যে পশুকে উপাসনার বস্তু বলে দাঁড় করিয়েছে যদিও ঠিক সেই পশুকে বলি না দেয়, তবু তারা সদৃশ পশুকে বলি দেয় ও এমনটা মনে হয় যে ঠিক সেটাকেই নিবেদন করে। দেবতা হিসাবে লিবীয়দের একটা ভেড়া আছে যা তারা আম্মোন বলে থাকে; কিন্তু সেই ভেড়া অন্যান্যদের দ্বারা অন্য বহু দেবতার উদ্দেশে জবাই করা হয়। [২] হিন্দুস্তানীয়রা দিওনিসোসকে পূজা করে ও প্রতীকমূলক ভাবে তাকে আঙুররস বলে থাকে; কিন্তু অন্যেরা আঙুররসকে অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয় নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। অন্য জাতি নদনদী ও জলের উৎসকে, ও মিশরীয়রা বিশেষভাবে জলকেই সম্মান করে ও সেগুলোকে দেবতা বলে ডাকে; অন্যদিকে অন্য অন্য জাতি (ও সেই জাতিগুলোর মধ্যে সেই মিশরীয়রাও রয়েছে যারা সেসব কিছু উপাসনা করে) জল দিয়ে নিজের ও পরের ময়লা ধুয়ে দেয় ও দূষিত সেই জল ঘৃণার সঙ্গে ফেলে দেয়।

বস্তুতপক্ষে মিশরীয়দের প্রতিমাগুলো যে যে পদার্থে গড়া, তা অন্য জাতির প্রতিমার উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়; তাই সেই মিশরীয়রা তাদেরই অবজ্ঞার পাত্র যেহেতু তারা দেবতাদের নয়, কিন্তু অন্যান্যদের কাছে এমনকি তাদের নিজেদেরও কাছে যা প্রায়শ্চিত্তমূলক অর্ঘ্য ও বলিদান, তা-ই ঈশ্বরীকৃত করে।

২৫। মানব বলিদান সম্পর্কে

[১] কিন্তু কেউ না কেউ রয়েছে যারা এমন অভক্তি ও উন্মাদনায় আকর্ষিত হল যে, তারা নিজেদের মিথ্যা দেবতাদের উদ্দেশে মানুষকেও জবাই করে ও বলি হিসাবে অর্পণ করে, হ্যাঁ, সেই যে মানুষ হলো সেই প্রতিমাগুলোর প্রতিমূর্তি ও গঠনস্বরূপ। এবং সেই হতভাগারা এমনটা দেখে না যে নিজেদের জবাইয়ের বলি হলো সেই দেবতাদের আদল যেগুলোকে তারা গড়ে ও পূজা করে ও যেগুলোর উদ্দেশে তারা মানুষকে বলি দেয়। তারা একপ্রকারে সদৃশকে সদৃশের কাছে অর্পণ করে, অথবা, আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে, তারা যা শ্রেয় তা যা নিকৃষ্ট তারই কাছে শ্রেয়টাকে অর্পণ করে, কেননা তারা জীবন্ত প্রাণীকে প্রাণহীন বস্তুর কাছে ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীকে অচলা প্রতিমার কাছে বলিদান করে। [২] বাস্তবিকই তাউরীয় বলে অভিহিত স্কুথীয়রা নৌকাডুবিতে বেঁচে থাকা যত মানুষকে ও বন্দি করা সকল গ্রীককে তাদের দ্বারা কুমারী বলে অভিহিতা দেবীর কাছে বলিদান করে, (হ্যাঁ, তারা আপন সঙ্গী মানুষদের প্রতি তত ভক্তিহীন হতে পারে), এবং তেমনটা করায় তারা নিজেদের দেব-দেবীর নিষ্ঠুরতা প্রমাণিত করে। কেননা [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান সমুদ্রের বিপদ থেকে যাদের বাঁচিয়ে রাখল, তাদেরই তারা জবাই করে, ও তেমনটা করায় তারা নিজেদের ঐশপূর্বজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী করে, কেননা নিজেদের পাশবিকতা দিয়ে ঐশপূর্বজ্ঞানের মঙ্গলময়তাকে আবৃত করে। আরও, অন্য জাতি যুদ্ধ থেকে জয়ী হয়ে ফিরে এসে বন্দিদের শত শত করে পৃথক রাখে ও এক একটা দল থেকে একজনকে নিয়ে বাছাইকৃত সেই সকলকেই আরেস দেবের কাছে বলিদান করে। [৩] বর্বরদের স্বভাবত নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে যে স্কুথীয়রা একাই তেমন জঘন্য কর্মের সাধক এমন নয়, কিন্তু তেমন ব্যবহার হলো সেই অনিষ্টের ফলাফল যা প্রতিমা ও অপদূতদের চিহ্ন। বাস্তবিকই পুরাকালে মিশরীয়রা হেরা দেবীর কাছে তেমন রক্ত-বলি দিত, ও ফৈনিকীয়রা ও ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের বলি

দিয়ে ক্রনোস দেবকে প্রসন্ন করত। আগেকার রোমীয়রা মানব-বলি দিয়েই ইউপিতের লাতিয়ারিসকে উপাসনা করত, ও অন্যান্যরা একই ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করত। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই দূষণকর্ম সম্পাদন করত ও নিজেরাই দূষিত হত। তারা তেমন নরহত্যা করায়ই দূষিত হত, ও তেমন বলিদানের ধূম দ্বারা নিজেদের মন্দির দূষিত করত। [৪] তবে তেমন কর্মকাণ্ড থেকেই অনিষ্ট মানুষদের মাঝে মাত্রাছাড়াই ছড়িয়ে পড়ল। কেননা তারা যা করত, নিজেদের অপদূতেরা যে তাতে আনন্দিত ছিল তা দেখে তারা তেমন অপকর্ম সাধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের দেব-দেবীর ব্যবহার অনুকরণ করল, একথা ভেবে যে, তারা যাদের ঊর্ধ্বতর স্তরের প্রাণী বলে ধরে নিত, তাদের অনুকরণ করায় তারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করছিল। এভাবে মানুষ নরহত্যা, শিশুহত্যা ও বাকি যত ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য পথ উন্মুক্ত করল। এজন্য প্রায়ই সকল শহর সব রকমের কামুকতায় ভরা যা নিজের দেব-দেবীর আচরণ অনুকরণের মাধ্যমে ঘটে, এবং এমন কেউই নেই যে তাদের দেবতাগুলোর সুস্থ ধারণা পোষণ করতে পারে; সে-ই মাত্র পারে যে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতার সাক্ষী হয়েছে।

২৬। দেব-দেবীই পৌত্তলিকদের নৈতিক দুর্নীতির উৎপত্তি

[১] পুরাকালে ফৈনিকিয়ায় নারীরা দেব-দেবীর সামনে নিজেদের দেখাত; তারা স্থানীয় ইষ্টদেবতাগুলোর কাছে নিজ দেহের মূল্য অর্পণ করে এমনটা মনে করত যে, বেশ্যাচারের মাধ্যমে তারা নিজেদের দেবীদের প্রশমিত করবে ও তেমন কর্মের মাধ্যমে সেই দেবীর প্রিয়পাত্র হবে। এবং পুরুষেরা নিজেদের প্রকৃতি অস্বীকার করে ও পুরুষ আর না হতে ইচ্ছা করে নারীতুল্য প্রকৃতি ধারণ করত এমনটা ভেবে যে, তেমনটা করায় তারা সেই সকলেরই মাতাকে খুশি ও সম্মানিত করবে যাদের তারা দেবতা বলে থাকে। এবং মানুষেরা সবচেয়ে অশ্লীল প্রাণীদের সঙ্গে জীবনযাপন করে ও অপকর্ম সম্পাদনে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এবিষয়ে খ্রিষ্টের পবিত্র দাস সেই পল বলেছিলেন, *কেননা তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অন্যের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে* (ক)। [২] তেমন কর্ম ও সদৃশ কর্ম সম্পাদন করে তারা স্বীকার ও প্রমাণ করে যে তাদের

তথাকথিত দেব-দেবী তেমন জীবন ধারণ করে। কেননা তারা জেউস থেকে অশ্লীল বালকপ্রীতি ও ব্যভিচার শিখল, আফ্রদিতে থেকে বেশ্যাচার, রেয়া থেকে উচ্ছৃঙ্খলতা, আরেস থেকে নরহত্যা, ও অন্যা দেব-দেবী থেকে সদৃশ অন্য অপকর্ম শিখল যা আইন দণ্ডিত করে ও যা শালীন যেকোন মানুষ এড়ায়। সুতরাং, যারা তেমন অপকর্মের সাধক, তাদের দেব-দেবী বলে অভিহিত করা ন্যায়সঙ্গত কি? বরং তাদের অশ্লীল ব্যবহারের জন্য তাদের বিষয়ে এমনটা ভাবা কি উচিত নয় যে, তারা পশুদের চেয়েও অনেক বেশি যুক্তিক্ষমতাহীন? সেই দেব-দেবীকে যারা পূজা করে, তাদের মানুষ বলে গণ্য করা ন্যায়সঙ্গত কি? বরং তারা যে জন্তুদের তুলনায় কম যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট ও অচলা বস্তুর তুলনায় আরও বেশি প্রাণহীন, সেজন্য কি তাদের জন্য দুঃখভোগ করা উচিত নয়? কেননা তারা যদি তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ যুক্তির কাছে পরামর্শ নিত, তাহলে তেমন ভুলভ্রান্তির মধ্যে সর্বাঙ্গেই ডুবে যেত না, খ্রিষ্টের পিতা সেই সত্যকার ঈশ্বরকেও অস্বীকার করত না।

২৭। পৌত্তলিকতা সম্পর্কে

[১] কিন্তু হয় তো এমনটা হয় যে, যারা এসমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠেছে ও সৃষ্টির বিস্ময় সম্পর্কে উদ্দীপিত, তারা উপরোল্লিখিত জঘন্য কর্ম বিষয়ে আমাদের যুক্তিখণ্ডন দ্বারা লজ্জাবোধ ক'রে নিজেরাই এমনটা অস্বীকার করবে না যে তেমন জঘন্যতা সকল মানুষ দ্বারা সহজেই দণ্ডিত ও অস্বীকৃত; কিন্তু তারা এমনটা ধরে নিতে পারে যে, বিশ্ব ও তার যত অংশকে তাদের সেই উপাসনা নিন্দাজনক নয় ও সেবিষয়ে তাদের ধারণা সুনিশ্চিত। [২] কেননা তারা এতে গর্ববোধ করবে যে, তারা পাথর, কাঠ, মানুষ ও পশুদের প্রতিমূর্তি, পাখি, সাপ, চতুষ্পদ জন্তুকে শুধু নয়, কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, গোটা আকাশমণ্ডল, এমনকি পৃথিবী ও আর্দ্র জগতের সমস্ত প্রকৃতিকেও সম্মান করে ও উপাসনা করে। এমনকি তারা এমন দাবি রাখবে যে, এমন কেউই নেই যে এমনটা দেখাতে পারে না যে সেই সমস্ত কিছু স্বরূপে দেবতা, যেহেতু সকলের কাছে এটা সুস্পষ্ট যে, সেগুলো যুক্তিক্ষমতাহীন বস্তু নয় কিন্তু মানবস্বরূপের ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের জিনিস যেহেতু সেগুলো আকাশে রয়েছে কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে জীবনযাপন করে। [৩] সেজন্য

এই অভিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়, কিন্তু এখানেও যুক্তি সেই অভিমতের বিপক্ষে সুনিশ্চিত একটা প্রমাণ খুঁজে বের করবে।

কিন্তু এই অভিমত পরীক্ষা করার আগে ও আমাদের বক্তব্য শুরু করার আগে সমস্যাটা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং সৃষ্টি দ্বারাই মিমাংসিত, কেননা সৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে নিজের নির্মাতা ও স্রষ্টার দিকে তথা সেই ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের সেই পিতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যিনি সৃষ্টির উপরে ও সবকিছুর উপরে রাজত্ব করেন। নকল প্রজ্ঞাবানেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে উপাসনা ও ঈশ্বরীকৃত করে যদিও সৃষ্টি নিজে সেই প্রভুকে উপাসনা ও স্বীকার করে যাঁকে তারা সৃষ্টির পক্ষে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করে। [৪] কিন্তু সৃষ্টির প্রতিটি অংশ যে অন্য অংশগুলোর উপর নির্ভরশীল, ঠিক এ পরনির্ভরশীলতাই সেই মানুষদের লজ্জায় অভিভূত করে যারা হা ক'রে সৃষ্টির নানা অংশের ব্যাপারে বিস্ময় দেখায় ও সেগুলোকে দেবতা বলে গণ্য করে; কেননা সেই অংশগুলো আপন অপরিবর্তনীয় বাধ্যতার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভু ও নির্মাতা, বাণী-লোগোসের পিতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে ও তাঁকে সেই অনুসারে স্বীকার করে, যেইভাবে ঐশশাস্ত্র বলে, *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করে ঈশ্বরের গৌরব, গগনতল ঘোষণা করে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি* [ক]। [৫] যাদের মনশ্চক্ষু সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়নি, তাদের কাছে উপরের বচনের প্রমাণ অস্পষ্ট নয় বরং একেবারে সুস্পষ্ট। একজন যদি সৃষ্টির অংশগুলোকে আলাদা করে ধ'রে এক একটাকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করত, যেমন সূর্যকে একাই করে ধরে বা চন্দ্র, বা পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল, অথবা যা উষ্ণ ও যা শীতল, যা শুষ্ক ও যা আর্দ্র ইত্যাদি এসমস্ত অংশকে একাই করে ধ'রে সেগুলোর সাধারণ সংযোগের বাইরে আলাদা ক'রে এক একটাকে একাই করে ধ'রে সেটাকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করত, তাহলে দেখতে পাবে যে, সেগুলোর একটাও স্বনির্ভরশীল নয়, বরং সবগুলো পারস্পরিক সেবাকর্মের উপর নির্ভরশীল ও পারস্পরিক অবলম্বনের মাধ্যমেই অস্তিমান হয়ে থাকে। সূর্য সমস্ত আকাশের সঙ্গে পুনরাবর্তন করে ও সেই আকাশ দ্বারা আবিষ্ট, ও আকাশের নিজের পুনরাবর্তন ছাড়া তার কোন অস্তিত্ব থাকত না। চন্দ্র ও অন্যান্য তারানক্ষত্র সূর্য থেকে যে অবলম্বন পায় সেবিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। পৃথিবীও যে বৃষ্টি ছাড়া নিজের ফলাদি উৎপাদন করতে অক্ষম, তাও সুস্পষ্ট, বৃষ্টিও মেঘের সাহায্য ছাড়া

পৃথিবীর উপরে পড়তে পারে না, মেঘও বায়ুমণ্ডল ছাড়া নিজে থেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। বাতাসও নিজে থেকে নয়, ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল থেকে উষ্ণ হয় ও সূর্য থেকে আলোকিত বিধায় আলো ছড়ায়। [৬] পৃথিবীকে ছাড়া জলের উৎস ও নদনদীও থাকত না, এবং পৃথিবী নিজেও নিজ দ্বারা অবলম্বন পায় না, কিন্তু জলরাশির উপর স্থাপিত হয় ও বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে আবিষ্ট ও আবদ্ধ। গোটা জগতের চারদিকে প্রবাহমান সমুদ্র ও মহৎ মহাসাগরও বাতাস দ্বারা গতি পায় ও সেইখানে বয়ে যায় যেখানে বাতাসের শক্তি তাকে তাড়না দেয়। বাতাস নিজেও ভিন্ন অস্তিত্বের অধিকারী নয়, কিন্তু যাঁরা এবিষয়ে কথা বলেছেন তাঁদের অভিমত অনুসারে, ঊর্ধ্ববায়ুমণ্ডল দ্বারা উষ্ণতাপ্রাপ্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়েই বায়ুমণ্ডলে বাতাসের উৎপত্তি হল ও বায়ুমণ্ডল দ্বারা তাড়িত হয়ে সবদিকে বয়। [৭] দেহগুলোর প্রকৃতি যে চার পদার্থ দ্বারা গঠিত (আমি উষ্ণতা, শীতলতা, শুষ্কতা ও আর্দ্রতার কথা বলছি), এবিষয়ে কার্ মন এত বিকৃত যে সে এমনটা জানে না যে সেগুলো পারস্পরিক সংযোগের গুণে অস্তিত্বমণ্ডিত ও সেগুলো আলাদা ও পৃথক হয়ে গেলে তবে সেগুলোর মধ্যে যেটা বেশি প্রভাবশালী সেটার উপর নির্ভর করায় সবগুলোই পরস্পরকে বিনাশ করে? কেননা উষ্ণতা অতিরিক্ত শীতলতা দ্বারা বিনষ্ট হয়, ও একইপ্রকারে শীতলতা উষ্ণতার প্রভাবের ফলেই নিঃশেষিত হয়। একই ধারায়, শুষ্কতা আর্দ্রতা দ্বারা আর্দ্র হয়, ও আর্দ্রতা শুষ্কতা দ্বারা শুষ্ক হয়।

২৮। বিশ্ব যে ঈশ্বর, তা হতে পারে না

[১] তবে, যখন সেগুলোর এক একটা অন্য একটার যত্নের উপর নির্ভরশীল, তখন সেগুলো কেমন করে ঈশ্বর হতে পারে? এবং যখন সেগুলো নিজ নিজ প্রয়োজনের জন্য অন্য একটার সাহায্য দাবি করে, তখন সেগুলো থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা করা কেমন উপযুক্ত হতে পারে? কেননা যদি এটা সর্বস্বীকৃত যে, ঈশ্বরের কারও দরকার হয় না কিন্তু নিজেই স্বনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, ও বিশ্ব তাঁরই দ্বারা অস্তিত্বমণ্ডিত ও এমনটা হয় যে তিনিই বরং যা প্রয়োজন তা সবকিছুর কাছে দান করেন, তখন সূর্য, চন্দ্র, ও সৃষ্টির অন্য সবকিছুকে দেবতা বলে অভিহিত করা কেমন করে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে যখন সেই সবকিছু আদৌ সেই রকম নয় বরং এক একটা পরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল? [২] কিন্তু হয় তো এমনটা হতে পারে যে, তারা এটা মেনে নেবে যে, সেগুলো আলাদা

ভাবে ধরলে সেগুলো অভাবী, ও এক একটাও নিজে থেকে অভাবী, কেননা এটার প্রমাণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তারা যদি সেই সবকিছু একসাথেই ধরে ও সেই সবকিছুকে কেমন যেন মহৎ এক দেহকে করে, তাহলে তারা এমনটাও দাবি করতে পারে যে, গোটা সেইসবই হলো ঈশ্বর। কেননা যখন গোটা সেইসব একসাথে একীভূত হল, তখন অংশগুলোর পক্ষে বহিরাগত কোন কিছুর আর দরকার হয় না। এই সমস্ত নকল প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এমনটা দাবি করবে যে, সেসময় গোটা সেইসব স্বনির্ভরশীল ও সবদিক দিয়ে স্বতন্ত্র হবে; কিন্তু এক্ষেত্রেও তাদের যুক্তি খণ্ডন করা হবে। [৩] কেননা পরবর্তী বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যগুলোর মত তাদের একেবারে অজ্ঞ অভক্তি দেখাবে। পৃথক পৃথক অংশগুলো একসাথে আনা হলে যখন গোটা সেইসবকে পূর্ণ করে ও গোটা সেইসব স্বীয় স্বীয় অংশগুলোতে গঠিত, তখন গোটা সেইসব এমন নানা অংশে গঠিত যেগুলো এক একটা গোটা সেইসবের একটা অংশ। কিন্তু তেমন ধারণা ঈশ্বর সংক্রান্ত আমাদের ধারণা থেকে বেশ দূরে রয়েছে। কেননা ঈশ্বর একক, ও পৃথক পৃথক অংশগুলো নন; তিনি নানা আলাদা অঙ্গে গঠিত নন কিন্তু তিনি নিজে হলেন বিশ্বের গঠনের নির্মাতা। দেখ কেমন অভক্তির কথা তারা বলে যখন দৈবত্ব সম্পর্কে এভাবে কথা বলে। কেননা তিনি নানা অংশে গঠিত হলে তবে তিনি নিজের পূর্ণটা আলাদা আলাদা অংশের সমন্বয় দ্বারা গঠন করে নিজের প্রকৃত স্বরূপ থেকে একেবারে অসদৃশ বলে দেখা দিতেন। তিনি সূর্য হলে তবে তিনি চন্দ্র নন; তিনি চন্দ্র হলে তবে তিনি পৃথিবী নন; তিনি পৃথিবী হলে তবে তিনি সমুদ্র হতেন না। এবং তেমন সদৃশতা অনুসারে এক একটা অংশ ধরে একজন তাদের এই যুক্তির নির্বুদ্ধিতা দেখতে পারে।

[৪] আমাদের মানব দেহ সম্পর্কে যা ঘটে তা লক্ষ করায়ও একজন তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারে। কেননা চোখ কান নয়, কানও হাত নয়; পেট বুক নয়, ঘাড়ও পা নয়, কিন্তু এসমস্ত কিছু স্বীয় স্বীয় কার্যক্ষমতার অধিকারী। একক দেহ এসমস্ত আলাদা অঙ্গে গঠিত যেগুলো প্রয়োজন অনুসারে একসাথে একীভূত কিন্তু তখন পৃথক হয় যখন সেসময় আসে, অর্থাৎ যখন যে প্রকৃতি সেগুলোকে সংযুক্ত করেছিল তখন সেই প্রকৃতি সেগুলোকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে, সেইভাবে যেভাবে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন ও আজ্ঞা করেন। এবং সর্বশক্তিমান যিনি, তিনি আমার এ তুলনা ক্ষমা করলে, তবে আমি বলব, তারা

যখন সৃষ্টির নানা অংশকে এক দেহে সংযুক্ত করে ও সেটাকে ঈশ্বর বলে, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, আমরা যেমনটা বলেছিলাম, সেই অনুসারে তিনি নিজ থেকে অসদৃশ ও একদিন আবার সেইভাবে পৃথক পৃথক হয়ে যাবেন যেভাবে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে অংশগুলো পৃথক পৃথক হয়।

২৯। ঈশ্বর ও প্রকৃতি আলাদা

[১] সত্যকে লক্ষ করে একজন তাদের ঈশ্বরহীনতা অন্য ভাবেও খণ্ডন করতে পারে। কেননা যখন ঈশ্বর স্বরূপে অশরীরী, অবিভাজ্য ও স্পর্শনাতীত, তখন তারা কেমন করে এমনটা ধরে নিতে পারে যে তিনি একটা দেহ? ও তারা কেমন করে ঈশ্বরকে দেয় যে সম্মান সেই সম্মানেই সেই সমস্ত কিছু উপাসনা করতে পারে যা আমরা আমাদের নিজেদের চোখে দেখতে পাই ও আমাদের নিজেদের হাতে স্পর্শ করতে পারি? [২] আরও, আমরা যখন সেই ধারণা মেনে নিই যা অনুসারে তিনি সর্বশক্তিমান ও কিছুই তাঁর উপর প্রভুত্ব করে না বরং তিনিই বিশ্বের উপর প্রভুত্ব রাখেন ও সেই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তখন যারা প্রকৃতিকে ঈশ্বরীকৃত করে, তারা কেমন করে এমনটা দেখতে পারে না যে তেমন ধারণা ঈশ্বর বিষয়ক সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না? কেননা যখন সূর্য পৃথিবীর নিচে থাকে তখন তার আলো পৃথিবীর ছায়াতে রয়েছে বলে তা দেখা যায় না; কিন্তু দিনমানে সূর্য নিজের আলোর উজ্জ্বলতা দ্বারা চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে। শিলাবৃষ্টি প্রায়ই পৃথিবীর ফসল ক্ষতি করে, ও আগুন জলস্রোত দ্বারা নিভিয়ে দেওয়া যায়। শীতকাল বসন্তকালের জন্য পথ ছাড়ে, গ্রীষ্মকাল বসন্তকে তার নিজের সীমা অতিক্রম করতে দেয় না ও সেইসঙ্গে হেমন্তকাল দ্বারা নিজের সীমা ছাড়িয়ে দিতে বাধা পায়। [৩] কিন্তু এসমস্ত কিছু যদি ঈশ্বর হত তাহলে একটা অন্য একটা দ্বারা পরাভূত বা বিচ্যুত হতে পারত না, বরং সবগুলো একসাথে থেকে যেত ও নিজ নিজ কার্যক্রম একসাথে পূরণ করত। দিনরাত সূর্য ও চন্দ্র ও তারানক্ষত্রের দল একসাথে সমান আলো ছড়াত, ও তেমন আলো সবকিছুর উপর উজ্জ্বল হত ও সবকিছু সেই আলো দ্বারা আলোকিত হত; গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল, বসন্ত ও হেমন্তকাল ঠিক একই সময়েই সহঅস্তিত্বশীল হত; লবণাক্ত সমুদ্র মিষ্ট জলের উৎসধারার সঙ্গে মিশিয়ে যেত ও মানুষকে একই জল অর্পণ করত; স্থির বাতাস ও দমকা হাওয়া একসাথেই হত; আগুন ও জল মানুষের জন্য একই

উপকারিতা দিত, এবং তাদের কাছ থেকে কেউই কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হত না যদি তাদের ধারণা অনুসারে সেই সবকিছু দেবতা হত ও ক্ষতিকর কিছু ঘটাত না বরং সেগুলোর সমস্ত কাজকর্ম উপকারী হত। [৪] কিন্তু সেই সমস্ত কিছুর পারস্পরিক বৈপরীত্যের কারণে যখন তেমন কিছু ঘটবার সম্ভব নয়, তখন এই যে সমস্ত কিছু এক একটার বিপরীত ও প্রতিরোধী, কেমন করে সেই সবকিছু দেবতা বলে অভিহিত করা ও ঈশ্বরকে দেয় সম্মান দিয়ে সেগুলোকে সম্মানিত করে উপাসনা করা সম্ভব? যা কিছু প্রকৃতিগত ভাবে শত্রুভাবাপন্ন, যারা সেইসব কিছুর কাছে শান্তি প্রার্থনা করত, সেই সবকিছু কেমন করে তাদের সেই শান্তি দিতে পারত ও শান্তি-সম্প্রীতি ক্ষেত্রে তাদের জন্য সালিশ হতে পারত? কেননা এটা সুনিশ্চিত যে, সূর্য, চন্দ্র বা সৃষ্টির কোন অংশই, ফলত পাথর, সোনা বা অন্য পদার্থের মূর্তিই, ফলত জেউস, আপল্লোস বা কবিদের বানানো রূপকথার অন্যান্যরাই প্রকৃতপক্ষে দেবতা হতে পারে না, যেইভাবে আমাদের বক্তব্য উপরে দেখিয়েছে। বরং সেগুলোর কয়েকটা হলো সৃষ্টির অংশ-বিশেষ, অন্য কয়েকটা অচল, ও অন্য কয়েকটা এমনিই মানুষমাত্র। অতএব, সেগুলোকে ঈশ্বরীকৃত করা ভক্তির সূচনা নয় বরং ঈশ্বরহীনতা ও অভক্তিরই সূচনা ও সেই এক ও একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর অর্থাৎ খ্রিষ্টের পিতা সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে বিরাট পথভ্রষ্টতার প্রমাণ।

[৫] তাই, যেহেতু গ্রীকদের প্রতিমাপূজা সংক্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করা হল ও এমনটা দেখানো হলো যে তেমন প্রতিমাপূজা ঈশ্বরহীনতায় পরিপূর্ণ ও তেমনটা মানুষের জীবনে তাদের উপকারের জন্য নয় কিন্তু তাদের বিনাশের জন্য আনা হলো, সেজন্য এসো, আমাদের বক্তব্যের আরম্ভে যেমন ঘোষণা করেছিলাম, সেই অনুসারে, যেহেতু ভ্রান্ত যুক্তি খণ্ডন করা হয়েছে সেজন্য এখন সত্যের পথ অনুসরণ করি ও বিশ্বের নিয়ন্তা ও নির্মাতা তথা পিতার সেই বাণী-লোগোসকে দর্শন করি, যাতে তাঁর দ্বারা আমরা তাঁর পিতা সেই ঈশ্বরের উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছতে পারি ও সেই গ্রীকেরা যেন জানতে পারে তারা সত্য থেকে কতই না দূরে নিজেদের বিচ্ছেদ করেছে।

৩০। মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম

[১] উপরে আলোচিত ধারণাসমূহ মানুষের জীবনে ভুলভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছুই বলে প্রমাণ করেনি, কিন্তু সত্যের পথ সেই খ্রিষ্টের কাছে উপনীত করবে যিনি সত্যকার ও

প্রকৃত ঈশ্বর। তেমন পথ জানবার জন্য ও নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কিছুর দরকার হয় না। কেননা যেমন ঈশ্বর নিজে সবকিছুর ততখানি উর্ধ্বে রয়েছেন, তেমনি ঈশ্বর অভিমুখে পথ আমাদের কাছে থেকে ততখানি দূরে নয় বা আমাদের কাছ থেকে ততখানি বাইরে নয়, বরং সেই পথ আমাদের অভ্যন্তরে রয়েছে ও আমরা নিজেরা সেই পথের সূত্রপাতের সন্ধান পেতে পারি, যেইভাবে মোশি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, *বিশ্বাসের কথা তোমার হৃদয়েই রয়েছে* (ক)। একই বিষয় ত্রাণকর্তাও ইঙ্গিত করেছিলেন ও সপ্রমাণ করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরেই রয়েছে* (খ)। [২] তাই যখন বিশ্বাস ও ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের অন্তরে রয়েছে, তখন আমরা সবার রাজা যিনি, পিতার সেই পরিত্রাণদায়ী বাণীকে দর্শন ও উপলব্ধি করার জন্য শীঘ্রই অগ্রসর হতে পারি। তাই যারা প্রতিমাপূজা করে, সেই গ্রীকেরা যেন কোন অজুহাত উত্থাপন না করে, অন্য কেউই যেন এবিষয়ে নিজেকে না ভোলায় যে, সে তেমন পথ জানে না ও সেই ভিত্তিতে নিজের ঈশ্বরহীনতার জন্য একটা ছুতা পায়। [৩] কেননা আমরা সবাই সেই পথে পদার্পণ করেছি ও সেই পথ জানি, যদিও সবাই তা পালন করতে ইচ্ছুক নয় বরং জীবনের যে পরিতৃপ্তি মানুষকে বিপথের দিকে টানে সেটার কারণে তারা সেই পথ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। এবং যদি এমন কেউ জিজ্ঞাসা করে তেমন পথ কী, তাহলে আমি বলব সেই পথ হলো প্রতিটি মানুষের প্রাণ ও সেটার অন্তরে তার মন। কেননা শুধু এটার দ্বারাই ঈশ্বরকে দর্শন করা ও উপলব্ধি করা সম্ভব, [৪] যদি না সেই ভক্তিহীন [গ্রীকেরা] এমনটা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, তারা একটা প্রাণের অধিকারী যেইভাবে তারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করল। তাদের অন্যান্য ঘোষণার চেয়ে তাদের একথা আরও যুক্তিসঙ্গত হত, কেননা মনের নির্মাতা ও নিয়ন্তা ঈশ্বরকে অস্বীকার করা এমন লক্ষণ যে তারা মনের অভাবী। সুতরাং সরলমনাদের খাতিরে এটাই সংক্ষিপ্ত ভাবে দেখানো দরকার যে, প্রতিটি মানুষের প্রাণ আছে, ও সেই প্রাণ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন; একথা বলা বিশেষভাবে দরকার আছে, কারণ ভ্রান্তমতপন্থীরা কেউ কেউ একথাও অস্বীকার করে, এমনটা ভেবে যে, মানুষ হলো দেহের দৃশ্যগত গঠন মাত্র। আমরা যখন আমাদের যুক্তি প্রমাণিত করব, তখন তারা নিজেরা নিজেদের মাধ্যমে প্রতিমাপূজার বিপক্ষে আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাবে।

৩১। যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ বিষয়ক প্রমাণ

[১] মানুষের প্রাণ যে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন, এবিষয়ে প্রথম ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটা ইঙ্গিত এটা হলো যে, মানুষের প্রাণ ও যুক্তিক্ষমতাহীন প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এজন্যই আমরা সেই প্রাণীগুলো যুক্তিক্ষমতাহীন বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত, কেননা মানবজাতি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন। [২] এটার পর আর এক ধরনের প্রমাণ রয়েছে যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথা, মানুষের বাইরে যা রয়েছে, কেবল মানুষ সেবিষয়ে ভাবতে পারে, অনুপস্থিত বিষয় সম্পর্কেও ভাবতে পারে, নিজের চিন্তা-ভাবনা স্মরণ করতে পারে ও যোগ্যতর ধারণা বিচার করতে ও বেছে নিতে পারে। কিন্তু যুক্তিক্ষতাহীন জন্তুরা কেবল তা-ই দেখে যা কাছে রয়েছে ও কেবল তা-ই পেতে আকৃষ্ট হয় যা দেখতে পায়, যদিও তা পাবার পর তাদের কোন ক্ষতি হয় না। অন্যদিকে মানুষ যা দেখে সেদিকে ছোটে না, বরং চোখে যা দেখে তা যুক্তি দিয়ে বিচার করে। তাই প্রায়ই এমনটা হয় যে, কোন একটা কিছুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর মানুষ নিজের যুক্তি দ্বারা এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত হয়; সে ভাবে ও পুনরায় চিন্তা করে, এবং সে সত্যের বন্ধু হলে তবে সবাই দেখতে পায় যে, মানুষের মন দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলো থেকে ভিন্ন। [৩] তাই, যেহেতু মন ভিন্ন, সেজন্য মনই হলো সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর বিচারক, ও ইন্দ্রিয়গুলো যা উপলব্ধি করে, মন তা বিচার করে ও স্মরণ করে, এবং যা শ্রেয় সেটাই দেখায়। চোখ কেবল দেখতে পায়, কান শোনে, মুখ স্বাদ নেয়, নাক ঘ্রাণ করে, ও হাত স্পর্শ করে; কিন্তু যা দেখবার বা শুনবার, একজনের যা স্পর্শ করা বা স্বাদ নেওয়া বা ঘ্রাণ করা উচিত, তা ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যাপার আর নয়, মন ও বুদ্ধিই তা নির্ধারণ করে। অবশ্যই, হাত একটা খড়্গা ধরতে পারে ও মুখ বিষ স্বাদ করতে পারে, কিন্তু সেই হাত ও সেই মুখ জানে না সেই সব বস্তু ক্ষতিকর কিনা, যদি না মন তেমনটা নির্ধারণ করে।

[৪] উদাহরণ যোগে ব্যাপারটা স্পষ্ট করতে গেলে ব্যাপারটা এমন সুরেলা একটা বীণা ও সেই বাদক যে নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই বীণা বাজায়। বীণার তারগুলো এক একটার স্বীয় সুর আছে, একটা তার গভীর, অন্য তার উচ্চ, অন্য তার মাঝারি, অন্য তার তীব্র, অন্য তার অন্য প্রকারের সুর; শিল্পী না থাকলে সেগুলোর সুরসঙ্গতি উপলব্ধি করা যায় না, বাজনার তালও বিচার করা যায় না। সেই বীণার তারগুলোর সুরসঙ্গতি তখনই মাত্র

দেখা যেতে পারে ও তালও তখনই মাত্র সঠিক যখন বাদক এক একটা তার আঘাত করে ও এক একটা উপযুক্ত ভাবে স্পর্শ করে। একইপ্রকারে, দেহের ইন্দ্রিয়গুলো বীণার তারগুলোর মত সুবিন্যস্ত; আর যখন উপলব্ধি-ক্ষমতা সম্পন্ন মন সেগুলো চালনা করে, তখন প্রাণ যা করছে তা বিচার-বিবেচনা করে ও তা জানে। [৫] কিন্তু এটা এমন কিছু যা মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও যা মানুষের প্রাণের যক্তিক্ষমাতা চিহ্নিত করে, ও যার ব্যবহার মানুষকে যুক্তিক্ষমতাহীন জন্তু থেকে পৃথক করে ও এমনটা দেখায় যে, দেহে যা দেখা যেতে পারে, তা তা থেকে সত্যিকারে ভিন্ন। তাই যখন দেহ মাটিতে শোয়া অবস্থায় রয়েছে, তখন মানুষ প্রায়ই তা-ই কল্পনা ও দর্শন করে যা স্বর্গে রয়েছে; ও যখন দেহ স্থির, শান্ত ও নিদ্রাগত, তখন মানুষ অভ্যন্তরীণ গতিতে সজীব হয়ে তা-ই দর্শন করে যা তার বাইরে রয়েছে, সে অজানা দেশ পার হয়, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ও তাদের মাধ্যমে সে প্রায়ই আগে থেকে নিজের দৈনিক কর্মকাণ্ড অনুমান করে ও শেখে। যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ ছাড়া এটা আর কিবা হতে পারে যার ফলে মানুষ তার নিজের উর্ধ্বে যা রয়েছে সেবিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে ও তেমনটা ভাবে?

৩২। দেহের কাজকর্মের উপরে প্রাণের প্রভুত্ব

[১] যারা এখনও লজ্জাকর ভাবে অযুক্তির প্রতি প্রবণ, আমার এ পরবর্তী কড়া যুক্তি তাদের বিপক্ষে প্রযোজ্য হতে পারে। যখন দেহ স্বভাবতই মরণশীল, তখন মানুষ কেমন করে অমরতা সম্পর্কে ভাবতে ও সদ্‌গুণের খাতিরে প্রায়ই মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে? অথবা, যখন দেহ ক্ষণস্থায়ী, তখন মানুষ কেমন করে অনন্ততা এমনভাবে কল্পনা করে যে সে বর্তমান জগৎকে অবজ্ঞা করে ও সেই জগৎ বাসনা করে যা অতীতে রয়েছে? দেহটা নিজে থেকে নিজের বিষয়ে তেমন ভাবনা ভাবতে ও তার বাইরে যা রয়েছে তা বিচার-বিবেচনা করতে পারে না, কারণ দেহ মরণশীল ও ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং যা দেহের বিপরীত ও যা দেহের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সেসম্পর্কে যা ভাবে, তা অন্য কিছু হবেই। তবে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন ও অমর প্রাণ ছাড়া সেই কিছুটা কীবা হতে পারে? ও তেমন কিছু তথা এই প্রাণ দেহের বাহ্যিক কিছু নয় বরং দেহের অভ্যন্তরে শ্রেয়তর সুরসঙ্গতি সৃষ্টি করে যেইভাবে বাদক বীণা বাজিয়ে সুরসঙ্গতি সৃষ্টি করে। [২] আরও, যেহেতু চোখের প্রকৃতি হল দেখা ও কানের প্রকৃতি হল শোনা, সেজন্য সেই চোখ ও কান কি অন্য বস্তুর দিকে

ফিরে অন্য কিছু বেছে নেয়? কীবা চোখকে দেখা থেকে সরায়? এবং যখন কানের প্রকৃতি হলো শোনা, তখন কীবা কান থেকে শব্দ বাইরে রাখে? এবং যখন স্বাদের প্রকৃতিগত ভূমিকা হলো স্বাদ নেওয়া, কীবা স্বাদকে স্বাদ নিতে বাধা দেয়? যার প্রকৃতি হলো কাজ করা, কীবা একটা বস্তু স্পর্শ করা থেকে সেই হাত সংযত রাখে? যা ঘ্রাণ করতে সৃষ্ট, কীবা সেই ঘ্রাণ-ক্ষমতা কোন গন্ধ ঘ্রাণ করা থেকে সরায়? দেহের প্রকৃতিগত প্রবণতার বিরুদ্ধে যা এইভাবে কার্যকর, তা কী? অথবা, নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ ক'রে কেমন করে দেহ আর একজনের ইচ্ছামত কাজ করবে ও সেই একজনের সিদ্ধান্তের বশীভূত হয়ে থাকবে? এসব কিছু দেখায় যে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার মত কেবল যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণ ছাড়া আর কিছুই নেই। [৩] কেননা দেহ নিজের ইচ্ছামত চলাচল করার লক্ষ্যে গড়া হয়নি, বরং এজন্যই গড়া হয়েছিল যাতে অন্য কারও দ্বারা চালিত ও পরিচালিত হয়, সেইভাবে যেভাবে একটা ঘোড়া নিজের ঘাড়ে জোয়াল লাগায় না কিন্তু তার প্রভু দ্বারা পরিচালিত হয়। সেজন্য মানুষের জন্য এমন আইন রয়েছে যাতে মানুষ মঙ্গল করতে পারে ও অনিষ্ট এড়াতে পারে, কিন্তু যেহেতু পশুরা যুক্তিক্ষমতাহীন ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মনের অধিকারী নয়, সেজন্য তারা বিচার-বিবেচনা করতে ও অনিষ্ট নির্ণয় করতে অক্ষম হয়ে থেকে যায়। অতএব, আমি মনে করি যে আমার এই বক্তব্য প্রমাণ করেছে যে, মানুষ যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণের অধিকারী।

৩৩। প্রাণ অমর

[১] প্রাণ যে অমর, প্রতিমাপূজার বিপক্ষে পূর্ণ খণ্ডনের লক্ষ্যে মণ্ডলীর শিক্ষার মধ্যে তেমন ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমরা আরও সহজে প্রাণ সম্পর্কে জ্ঞান পাব যদি আগে দেহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং দেহ ও প্রাণের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই জ্ঞানও অর্জন করি। যখন আমাদের বক্তব্য এমনটা দেখিয়েছে যে, প্রাণ দেহ থেকে ভিন্ন, ও দেহ স্বরূপেই মরণশীল, তখন এমনটা দাঁড়ায় যে, দেহ থেকে ভিন্ন হওয়ায় প্রাণ অবশ্যই অমর। [২] আরও, আমরা যেইভাবে দেখিয়েছি, সেই অনুসারে যখন প্রাণ অন্য কোন শক্তি দ্বারা অচালিত হয়ে থেকে দেহকে চালনা করে, তখন এটা দাঁড়ায় যে, প্রাণ স্বচলমান ও মাটিতে দেহসমাধির পরেও প্রাণ চলাচল করে। কেননা প্রাণ যে মরে তা নয়, কিন্তু দেহ থেকে প্রাণ চলে যায় বিধায়ই দেহের মৃত্যু হয়। সুতরাং, প্রাণ যদি দেহ

দ্বারা চালিত হত, তাহলে এমনটা হত যে, চালনাশক্তিকে সরানো হলে প্রাণও মারা যেত; কিন্তু যখন প্রাণ দেহকে চালায় তখন অবশ্যই নিজেকেও চালায়। এবং যখন নিজেকে চালায়, তখন দেহের মৃত্যুর পরে অবশ্যই জীবিত হয়ে থাকে। [৩] কেননা প্রাণের চালনাশক্তি ও প্রাণের জীবন এক জিনিস, ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমরা বলি, দেহ চলাচল করলে তবে দেহটা জীবিত, ও তার মৃত্যু তখনই হয় যখন তার চালনাশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। দেহে প্রাণের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ করলে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়; কেননা দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে পর ও দেহের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ার পর প্রাণ দেহের ক্ষুদ্রতা দ্বারা সঙ্কুচিত বা দেহের পরিমাপ অনুসারে পরিমিত হয় না, বরং মৃত্যুতে নিদ্রাগতই যেন দেহ বিছানায় অচল অবস্থা থাকাকালে প্রাণ প্রায়ই স্বশক্তি দ্বারা জাগ্রত থাকে ও দেহের প্রকৃতিগত শক্তিকে অতিক্রম করে। কেমন যেন প্রাণ দেহকে ত্যাগ ক'রে কিন্তু একইসঙ্গে দেহতে থেকে অতিপার্থিব বিষয় লক্ষ করে, এমনকি এমন পবিত্রজনদের ও দূতদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাঁরা পার্থিব দেহে আর নন; এবং নিজের মনের শুদ্ধতা বিষয়ে আস্থাবান হয়ে প্রাণ তাঁদের সঙ্গে সংলাপ করে। তাই ঈশ্বর যে দেহের সঙ্গে প্রাণকে আবদ্ধ করলেন, তাঁর নির্ধারিত সময়ে যখন প্রাণ সেই দেহ থেকে মুক্ত হবে, তখন সে কি অমরতা সম্পর্কে আর স্পষ্টতর জ্ঞান অর্জন করবে না? কেননা যখন প্রাণ দেহে আবদ্ধ হওয়ার সময়েও দেহের বাইরেও জীবনযাপন করল, তখন মহত্তর কারণে দেহের মৃত্যুর পরেও প্রাণ জীবিত হয়ে থাকবে ও জীবন ত্যাগ করবে না সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে যিনি নিজের বাণী আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা প্রাণকে ঠিক সেইভাবে গড়লেন। [৪] কেননা এটিই হলো সেই আসল কারণ যার জন্য প্রাণ অমর ও অনন্ত বিষয় সম্পর্কে ভাবে ও চিন্তা করে যেহেতু প্রাণও অমর। এবং দেহ মরণশীল হওয়ায় যেমন দেহের ইন্দ্রিয়গুলো মরণশীল বিষয় উপলব্ধি করে, তেমনি সেই যে প্রাণ অমর বিষয় উপলব্ধি করে ও ভাবে, সেই প্রাণও অবশ্যই অমর ও চিরকাল জীবিত থাকে। কেননা অমরতা বিষয়ক চিন্তা ও ভাবনা প্রাণকে কখনও ত্যাগ না করে বরং অনুক্ষণ প্রাণে থাকে, এমনকি অমরতা বিষয়ক নিশ্চয়তার জন্য সেই চিন্তা ও ভাবনা হয়ে ওঠে ইন্ধন স্বরূপ। অতএব, ঈশ্বর-দর্শন বিষয়ে প্রাণের নিজস্ব একটা ধারণা আছে, ও তেমন

ঈশ্বর-দর্শন হলো প্রাণের চলার পথ; হ্যাঁ, প্রাণ বাইরে থেকে নয় নিজের অভ্যন্তর থেকে বাণী-ঈশ্বর সংক্রান্ত উপলব্ধি ও জ্ঞান আপন করে নেয়।

৩৪। প্রাণের ঈশ্বর-দর্শন

[১] তাই আমরা উপরে যা একবার বলেছিলাম তা পুনরায় বলতে যাচ্ছি, তথা: যেমন তারা অচলা বস্তুর পূজার বিনিময়ে ঈশ্বরকে অস্বীকার করল, তেমনি তারা যে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণের অধিকারী তা ভাবে না, ও এর ফলে পশুদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হওয়ায় নিজেদের উন্মাদনার শাস্তি পায়। তাই তারা কেমন যেন নিজেরাই প্রাণহীন, ঠিক সেই অনুসারে তারা নিজেদের কুসংস্কার-দূষিত আস্থা প্রাণহীন বস্তুর উপরে রাখে, এবং এইভাবে দেখায় তাদের জন্য অনুকম্পা ও পরিচালনা দরকার। [২] কিন্তু তারা যখন এমনটা ভাবে যে, তারা একটা প্রাণের অধিকারী ও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই নিজেদের যুক্তিক্ষমতা বিষয়ে গর্ব করে, তখন কেনই বা নিজেরাই কেমন যেন প্রাণহীন ব'লে যুক্তিবিরুদ্ধ কাজ করার দুঃসাহস দেখায় ও তেমন বিষয়ে ভাবে যা তাদের পক্ষে ভাবা উচিত নয় কিন্তু দেবতাদের চেয়ে নিজেদেরই ঊর্ধ্বতর পর্যায়ের জীব দেখায়? কেননা যেহেতু তারা এমন প্রাণের অধিকারী যা নিজেরা দেখতে পায় না, সেজন্য ঈশ্বরকে দৃশ্যগত ও মরণশীল বেশে কল্পনা করে। আরও, তারা যেমন ঈশ্বরকে ত্যাগ করেছে, তেমনি কেন পুনরায় আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কাছে ফেরে না? কেননা তারা যেমন নিজেদের মন দিয়ে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গেল ও অস্তিত্বহীন বস্তু থেকে দেব-দেবী উদ্ভাবন করল, তেমনি তারা তাদের প্রাণের চোখ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উত্তোলন করতে পারে ও পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারে। [৩] তারা যে ফিরে যেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই; অবশ্যই, যে সমস্ত কুকামনা তারা পরিধান করল তারা যদি সেই সবকিছুর মলিনতা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ধৌত করে যতদিন না প্রাণের বহিরাগত সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে ও প্রাণ যেমন গড়া হয়েছিল ঠিক সেইভাবে, ভেজালহীন অবস্থায়ই, প্রাণকে দেখায়, যাতে তেমনটা ক'রে, আদিতে যাঁর প্রতিমূর্তিতে তাদের গড়া হয়েছিল, তারা পিতার সেই বাণীর উপর চোখ নিবদ্ধ রাখবার সক্ষম হয়ে ওঠে। কেননা প্রাণ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে গড়া হয়েছিল ও তাঁর সাদৃশ্য অনুসারে সৃষ্টি হয়েছিল, যেইভাবে পবিত্র শাস্ত্র ঈশ্বরের নামে কথা বলে দেখায়, *এসো, আমরা*

আমাদের আপন প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি (ক)। তাই প্রাণ পাপের যে সমস্ত মলিনতায় ঢাকা যখন তা ছেড়ে দেয় ও প্রতিমূর্তিতে যা রয়েছে তাতেই মাত্র নিজেকে শুদ্ধ রাখে, তখন এসমস্ত কিছু উজ্জ্বল প্রকাশ পেলে প্রাণ কেমন একটা আয়নায়ই যেন সেই বাণীর উপর সত্যিই চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারে যিনি পিতার প্রতিমূর্তি, ও সেই বাণীতে সেই পিতা বিষয়ক ধারণা পেতে পারে ত্রাণকর্তাই যাঁর স্বয়ং প্রতিমূর্তি।

[৪] এবং যদি প্রাণের নিজের দেওয়া এই শিক্ষা উপযুক্ত নয় কারণ বহিরাগত কোন প্রভাব মনকে অন্যমনস্ক করে ও তাকে শ্রেয়তর বিষয় দেখতে বাধা দেয়, তাহলে দৃশ্যগত ঘটনার মাধ্যমেও ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে, কেননা নিজের সুবিন্যস্ততা ও সঙ্গতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি কেমন যেন লিখিত এক পত্রেই তার নিজের নিয়ন্তা ও নির্মাতাকে চিহ্নিত করে ও তাঁর কথা ঘোষণা করে।

৩৫। সৃষ্টি ঈশ্বরকে প্রকাশ করে

[১] যিনি মঙ্গলময় ও মানবপ্রেমিক, যিনি যা নির্মাণ করলেন তার প্রতি যত্নশীল, সেই ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বে রয়েছেন বলে স্বরূপে অদৃশ্যমান ও উপলব্ধ নন বিধায় ও ফলত তিনি অসৃষ্ট বিধায় কিন্তু বাকি সমস্ত কিছু শূন্য থেকে নির্মিত বিধায় মানবজাতি তাঁর বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে অকৃতকার্য, সেজন্য এই কারণেই ঈশ্বর নিজের বাণী-লোগোস দ্বারা সৃষ্টিকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, তিনি স্বরূপে অদৃশ্যমান হয়েও তবু তাঁর নিজের কর্মের মাধ্যমে মানুষের কাছে জ্ঞাত হন। বাস্তবিকই শিল্পী দৃশ্যমান না হওয়ার সময়েও প্রায়ই নিজের শিল্পকর্মের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়; [২] এবং লোকে যেমন ভাস্কর সেই ফিদিয়া সম্পর্কে বলতে পারে যে, ফিদিয়া অনুপস্থিত হলেও তার কর্মের নানা অংশের সূক্ষ্মতা ও পারস্পরিক সঙ্গতির মধ্য দিয়ে সেই কর্ম নিজেই দর্শকদের কাছে ফিদিয়াকে প্রকাশ করে, তেমনি বিশ্বের সুবিন্যস্ততা থেকে আমাদেরও উচিত বিশ্বের নির্মাতা ও নিয়ন্তা সেই ঈশ্বরের কথা ভাবা যদিও দেহের চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। কেননা ঈশ্বর নিজের অদৃশ্যমান স্বরূপকে অপব্যবহার করেননি (কেউই যেন এধরনের কথা না ভাবে!), তিনি মানুষের কাছেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানাতীত রাখেননি, বরং, যেভাবে উপরে বলেছি, সেই অনুসারে তিনি

সৃষ্টিকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, স্বরূপে তিনি অদৃশ্যমান হলেও তবু তাঁর কর্মের মাধ্যমে তাঁকে জানা যেতে পারে। [৩] এবং একথা আমার নিজের অভিমত মাত্র নয়, বরং তা আমি সেই ঐশতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে শিখেছি যাঁদের মধ্যে সেই পল রয়েছেন যিনি রোমীয়দের কাছে লিখেছিলেন, *তাঁর অদৃশ্য গুণ জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে* [ক]। লুকও মুক্তকণ্ঠে বলেন, *আমরাও তোমাদের মত সাধারণ মানুষমাত্র; আমরা তোমাদের এই শুভসংবাদ জানাচ্ছি যেন এই সমস্ত অসার বস্তু ত্যাগ করে সেই জীবনময় ঈশ্বরেরই দিকে ফের, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সবকিছুর মধ্যে যা কিছু আছে নির্মাণ করলেন। তিনি অতীতকালে যুগের পর যুগ সমস্ত জাতিকে নিজ নিজ পথে চলতে দিলেন; তবু তিনি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি, কেননা তিনি মঙ্গল সাধন করে এসেছেন; হ্যাঁ, তিনি আকাশ থেকে আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে ঋতুতে ঋতুতে আমাদের ফসল উৎপাদন করে এসেছেন, আর খাদ্য দানে আমাদের দেহ ও আনন্দ দানে আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে এসেছেন* [খ]।

[৪] কেননা আকাশমণ্ডলের আবর্তন, সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ ও অন্যান্য তারানক্ষত্রের অবস্থান ও পরিক্রমণ দে'খে যেগুলো বিপরীত ও ভিন্ন হলেও তবু নিজেদের ভিন্নতায় সবগুলো একক অনুক্রম বজায় রাখে, এসবকিছু দে'খে কে এমনটা ভাববে না যে সেগুলো নিজেরা নিজেদের সুবিন্যস্ত করে না বরং অন্য একজন রয়েছেন যিনি সেগুলোকে সুবিন্যস্ত করেন ও সেগুলোকে নির্মাণও করেছিলেন? এবং সূর্য যে দিনমানে ওঠে ও চন্দ্র যে রাতে আলো ছড়ায় তা দে'খে, ও সেই সূর্য ও চন্দ্র যে দিনগুলোর সঠিক সমান সংখ্যা অনুসারে অপরিবর্তনশীল ভাবে ক্ষীণ হয় ও বৃদ্ধি পায় তাও দে'খে, এবং কোন কোন তারা যে নিজ নিজ কক্ষপথ অতিক্রম করে নানা ভাবে কক্ষপথ পাল্টায় কিন্তু অন্য অন্য তারা নিজ নিজ কক্ষপথ স্থির রাখে, তাও দে'খে কে এমনটা ভাববে না যে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবশ্যই এক স্রষ্টা আছেন? [গ]

৩৬। বিশ্বের সুবিন্যস্ততা সম্পর্কে (১)

[১] যা যা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বিপরীত তা যে সংযুক্ত হয় ও সঙ্গতিময় মিল রাখে (উদাহরণ যোগে জলের সঙ্গে মিশ্রিত আগুন ও আর্দ্রতার সঙ্গে শুষ্কতার এমন মিলন যা

পারস্পরিক শত্রুতায় নয় কিন্তু একক দেহের সদৃশ ঐক্য স্বরূপ) তেমনটা দেখে কে এমনটা ভাববে না যে, যা সেগুলোকে ঐক্যে বেঁধে রাখে তা বাইরে থেকেই তেমনটা করে? এবং শীতকাল যে বসন্তকালকে ও গ্রীষ্মকাল যে হেমন্তকালকে স্থান দেয়, ও এ ঋতুগুলো যে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে বিপরীত যেহেতু একটা শীত সৃষ্টি করে, অন্য একটা পুড়িয়ে দেয়, অন্য একটা বৃদ্ধি আনে, ও অন্য একটা বিনাশ ঘটায় অথচ সবগুলো মিলে মানুষকে সমান ও অক্ষতিকর উপকার দান করে, তেমনটা দেখে কে এমনটা ভাববে না যে, সেগুলোর চেয়ে ঊর্ধ্বতম একজন আছেন যিনি সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রাখেন ও সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন যদিও সে তাঁকে দেখতে পায় না? [২] মেঘগুলোর ভার যে বায়ুমণ্ডলে বহন করা হয় ও জলরাশির ভার যে মেঘমালায় বাঁধা থাকে, তেমনটা দেখে কে এথেকে অনুমান করবে না যে এমন একজন আছেন যিনি সেগুলোকে আবদ্ধ রাখেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন? অথবা, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে সমস্ত বস্তুর চেয়ে ভারী সেই পৃথিবী যে জলের উপরে স্থির থাকে ও যা কিছু প্রাকৃতিক দিক দিয়ে চলমান তার উপরে নিজের অচলা অবস্থা রাখে, তেমনটা দেখে কে এমনটা স্বীকার করবে না যে, এক ঈশ্বর আছেন যিনি সেই সমস্ত কিছু সুবিন্যস্ত করলেন ও নির্মাণ করলেন? [৩] পৃথিবী যে যথাসময় ফল উৎপন্ন করে, বৃষ্টি যে আকাশ থেকে পড়ে, নদনদী যে বয়ে চলে, জলের উৎস যে জলকে উৎসারিত করে, পশুরা যে ভিন্ন জাত থেকে জন্মায়, এবং এসবকিছু যে সবসময় হয় তা নয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়েই হয়, এবং অসদৃশ বৈপরীত্য দ্বারা রাখা আনুপাতিক ও সমান অনুক্রম উপলব্ধি করে কে এমনটা ভাববে না যে, এমন প্রতাপ রয়েছে যা স্থির থেকে নিজের পছন্দমত সেই সবকিছু সুবিন্যস্ত করে ও পরিচালনা করে? [৪] কেননা নিজ নিজ স্বভাবের ভিন্নতার দরুন এসব কিছু নিজ নিজ থেকে একসাথে থাকতে পারত না। কেননা স্বভাবে জল ভারী ও নিচের দিকে বয়, কিন্তু মেঘ হালকা হওয়ায় সেই সমস্ত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত যেগুলো হালকা হওয়ায় উপরের দিকে বহন করা হয়। অথচ আমরা মেঘে বহন করা ভারী জল দেখতে পাই। তাছাড়া পৃথিবী সবচেয়ে ভারী বস্তু ও জল তার চেয়ে হালকা, অথচ যা ভারী তা যা হালকা তা দ্বারা বহন করা হয়, এবং পৃথিবী পড়ে যায় না বরং অচল অবস্থায় থেকে যায়। নর-নারী একরকম নয়, অথচ দু'টোই মিলিত হয় ও সেই দু'জন থেকে সদৃশ একটা জীব জন্ম নেয়। এক কথায়, শীত উষ্ণের বিপরীত,

আর্দ্রতা শুষ্কতাকে রোধ করে, অথচ দু'টো মিলিত হলে তাদের মধ্যে কোন বৈপরীত্য আর থাকে না, বরং তাদের সঙ্গতিময় মিল একক একটা দেহ উৎপন্ন করে ও সবকিছুর জন্ম ঘটায়।

৩৭। বিশ্বের সুবিন্যস্ততা সম্পর্কে (২)

[১] তাই তেমন পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত উপাদানসমূহ মিলিত হতে পারত না যদি না একজন না থাকতেন যিনি ঊর্ধ্বতম ও নিয়ন্তা হওয়ায় সবকিছু সংযুক্ত না করতেন ও যাঁকে সেই সমস্ত উপাদানও মেনে নেয় ও যাঁর প্রতি বাধ্য থাকে যেমন দাস নিজের মনিবের প্রতি বাধ্য থাকে। সেই উপাদানগুলো নিজ নিজ প্রকৃতিগত স্বভাবের দিকে আর তাকায় না, নিজেদের মধ্যেও আর লড়াই করে না, কিন্তু যিনি তাদের সংযুক্ত করলেন সেই প্রভুকে চিনে নিয়ে সেগুলো নিজেদের মধ্যে সঙ্গতিময় মিল বজায় রাখে ও প্রকৃতির দিক দিয়ে বিপরীত হলেও নিজেদের নিয়ন্তার ইচ্ছা দ্বারা পুনর্মিলিত হয়। [২] তাদের একক মিলন যদি ঊর্ধ্বতর অধিকার থেকে না আসত, তাহলে কেমন করে যা ভারী তা তারই সঙ্গে মিলিত ও যুক্ত হত যা হালকা? যা শুষ্ক তাও কেমন করে যা আর্দ্র, বা যা বৃত্তাকার তা কেমন করে যা সোজা তার সঙ্গে মিলত? বা আগুন কেমন করে শীতের সঙ্গে, এমনকি সমুদ্র কেমন করে স্থলের সঙ্গে, বা সূর্য কেমন করে চন্দ্রের সঙ্গে, বা তারানক্ষত্র কেমন করে আকাশের সঙ্গে, বা হাওয়া কেমন করে মেঘের সঙ্গে মিলতে পারত যখন এক একটার স্বরূপ অপর একটার চেয়ে ভিন্ন? বাস্তবিকই সেগুলোর মধ্যে বড় একটা অমিল দেখা দিত: একটা পুড়িয়ে দিত, আর একটা শীত সৃষ্টি করত, যা ভারী তা নিচের দিকে ঝুঁকত কিন্তু যা হালকা তা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে উপরের দিকে যেত, সূর্য উজ্জ্বল হত কিন্তু হাওয়া অন্ধকার আনত। এমনকি তারানক্ষত্র পরস্পর সংগ্রামে রত থাকত যেহেতু কোন কোন তারা উপরে ও কোন কোন তারা নিচে অবস্থিত; রাতও দিনকে স্থান দিত না কিন্তু অবিরত যুদ্ধরত অবস্থায় থেকে দিনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকত। [৩] তেমন অবস্থা-পরিস্থিতিতে একজন সুবিন্যস্ততা আর নয় বরং বিশৃঙ্খলা, নিয়ম আর নয় বরং নৈরাজ্য, একতা আর নয় বরং এলোমেলোতা, প্রতিসাম্য আর নয় বরং অসাম্যই দেখত। কিন্তু এই পারস্পরিক লড়াই ও সংগ্রামের ফলে হয় বিশ্ব বিলুপ্ত হত, না হয় যে সবচেয়ে বলবান সে-ই মাত্র বেঁচে যেত; এবং তেমন অবস্থাও গোটা

সবকিছুর বিশৃঙ্খলা দেখাত, কেননা যে সবচেয়ে বলবান সে যদি অন্যান্যদের উপকারিতা ছাড়া একা হয়ে পড়ত, তাহলে তেমন অবস্থা সবকিছুকে সামঞ্জস্যহীন করত, ঠিক সেইভাবে যেভাবে যদি একটামাত্র পা বা একটামাত্র হাত বেঁচে থাকত, তাহলে দেহটাও নিজের অখণ্ডতা রাখতে পারত না। [৪] কেননা যদি সূর্য একা করে আলো ছড়াত, বা চন্দ্র একা করে পরিভ্রমণ করত, বা কেবল রাত থাকত বা সবসময় দিন হত, তাহলে জগৎ কেমন ধরনের হত? আর যদি আকাশ একা করে তারাবিহীন থাকত বা তারাগুলো আকাশবিহীন থাকত, তাহলে কেমন সঙ্গতি থাকত? এবং যদি কেবল সমুদ্র থাকত ও স্থলভূমি জলহীন ও সৃষ্টির অন্যান্য উপাদান বিহীন থাকত, তাহলে উপকারিতার মত কীবা থেকে যেত? কেমন করে মানুষের উদ্ভব হত বা পৃথিবীতে কেমন করে জীবন দেখা দিত যদি সমস্ত উপাদান নিজেদের মধ্যে লড়াইতে ব্যস্ত থাকত ও একজনমাত্রই বলবান থাকত অথচ একা হওয়ায় অন্যান্য দেহগুলো সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট হত না? কেননা কেবল উষ্ণ থেকে, বা কেবল শীত থেকে, বা কেবল আর্দ্রতা থেকে, বা কেবল শুষ্কতা থেকে কিছুই গঠিত হত না, কিন্তু বিশ্ব সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলোতায় বিরাজ করত। কেননা যে উপাদান সবচেয়ে বলবান বলে মনে হত, তাও অন্যান্যগুলোর সমর্থন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারত না। প্রকৃতপক্ষে আজ এক একটা উপাদান ঠিক তাই নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখছে।

৩৮। **ঈশ্বর এক**

[১] কিন্তু যেহেতু বিশ্বে বিশৃঙ্খলা নয় বরং মিল, অসাম্য নয় বরং প্রতিসাম্য, এলোমেলোতা নয় বরং নিয়ম ও জগতের সঙ্গতিপূর্ণ সুবিন্যস্ততা বিরাজ করছে, সেজন্য যিনি সবকিছু সঙ্গতির মধ্যে এনে সেই সবকিছু মিলিত ও একতাবদ্ধ করে থাকেন, সেই নিয়ন্তা সম্পর্কে আমাদের পক্ষে এমন ধারণা অনুমান করা প্রয়োজন যা তাঁকে উপলব্ধি করার জন্য আমাদের চালনা করবে। কেননা তিনি আমাদের চোখে অদৃশ্যমান হলেও তবু উপরোল্লিখিত পরস্পর-বিপরীত উপাদানের সুবিন্যস্ততা ও সঙ্গতি থেকে আমরা সেগুলোর চালক, শাসক ও রাজা সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করতে পারি। [২] উদাহরণ স্বরূপ এমন একটা শহরের কথা ধরে নেওয়া হোক যা বহুসংখ্যক ও ভিন্ন ভিন্ন, ছোট-বড়, ধনবান-ধনহীন, বৃদ্ধ-যুবক, ও নর-নারী বাসিন্দাদের নিয়ে গঠিত;

আমরা যদি এমনটা দেখি যে শহরটা সুশাসিত ও তার বাসিন্দারা নানা ধরনের হলেও তবু একে অন্যের সঙ্গে মিল বজায় রেখে জীবনযাপন করে, অর্থাৎ যদি এমনটা দেখি যে ধনবান যারা তারা ধনহীনদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যারা বড় তারা ছোটদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, যারা যুবক তারা বৃদ্ধদের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং সবাই শান্তিতে ও সমতায় জীবনযাপন করে, তাহলে আমরা অবশ্যই এমনটা ভাবব যে, সেই মিল একজন নিয়ন্তার উপস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত, যদিও আমরা তাকে দেখি না। কেননা বিশৃঙ্খলা হলো নৈরাজ্যের লক্ষণ, কিন্তু শৃঙ্খলা সেই নিয়ন্তার দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে। একইপ্রকারে, দেহে অঙ্গগুলোর পারস্পরিক সঙ্গতি দেখে, অর্থাৎ চোখ যে কানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, হাত যে পাকে প্রতিরোধ করে না, কিন্তু এক একটা অঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে নিজ নিজ ভূমিকা পূরণ করে, এসমস্ত দেখে আমরা অবশ্যই ভাবব যে, দেহে এমন প্রাণ রয়েছে যা অঙ্গগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও আমরা প্রাণ দেখি না। সুতরাং, বিশ্বের সুবিন্যস্ততা ও সঙ্গতি থেকে আমাদের ভাবতে হবে যে ঈশ্বর হলেন তার নিয়ন্তা, এমনটাও ভাবতে হবে যে তিনি একজনমাত্র, বহুজন নন। [৩] এবং জগতের এই সুবিন্যস্ততা ও বিশ্বের সঙ্গতিপূর্ণ মিল এমনটা দেখায় যে, তার নিয়ন্তা ও শাসক বহুজন নন বরং এক অর্থাৎ সেই বাণী-লোগোস। কেননা যদি সৃষ্টির বহু নিয়ন্তা থাকত, তাহলে বিশ্বে তেমন সুশৃঙ্খলা সংরক্ষিত হত না, বরং বহু নিয়ন্তার কারণে সবকিছু এলোমেলো হত যেহেতু এক একজন নিয়ন্তা সবকিছু নিজের ইচ্ছার দিকে টানত ও অন্যান্য নিয়ন্তার বিরুদ্ধ সংগ্রাম করত। আমরা যেমন বলেছিলাম যে বহুঈশ্বরবাদ হলো নাস্তিকতা, তেমনি বহুজনের শাসনকে হতে হবে নৈরাজ্য। কিন্তু যখন এক একজন অন্য একজনের শাসন উলট-পালট করে, তখন কেউই নিয়ন্তা হয় না বরং সেখানে সম্পূর্ণ নৈরাজ্য বিরাজ করে। এবং যেখানে কোন নিয়ন্তা নেই, সেখানে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা রাজত্ব করে। [৪] একইপ্রকারে, বহু কিছুর একক অনুক্রম ও মিল দেখায় যে, নিয়ন্তা একজনমাত্র। একজন যখন দূর থেকে বহু ও ভিন্ন ভিন্ন তার-বিশিষ্ট বীণা শোনে ও সেগুলোর সুরসঙ্গতির মিল প্রশংসা করে কারণ সেই বীণা গভীর সুর শুধু নয়, তীব্র সুরও শুধু নয়, মাঝারি সুরও শুধু নয়, কিন্তু সমস্ত তার নিজ নিজ সুর সমান সমতায় সৃষ্টি করে, তখন সে এই আবশ্যক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বীণাটা নিজে থেকে চলাচল করছে না, বহু বাদকের দ্বারাও

বাজছে না, কিন্তু একজনমাত্র বাদক রয়েছে যে অদৃশ্য হলেও সুরসঙ্গতির মিলের লক্ষ্যে নৈপুণ্যের সঙ্গে এক একটা তারের সুর মিলিত করে। এবং একইপ্রকারে, যেহেতু গোটা জগতে সুবিন্যস্ততা সম্পূর্ণরূপে মিল-বিশিষ্ট ও উচ্চস্তরের বস্তুগুলো নিম্নস্তরের বস্তুগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, নিম্নস্তরের বস্তুগুলোও উচ্চস্তরের বস্তুগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, কিন্তু সবগুলো মিল-বিশিষ্ট সুবিন্যস্ততা সৃষ্টি করে, সেজন্য এর ফলে একজন একথা ভাবতে বাধ্য যে, গোটা সৃষ্টির নিয়ন্তা ও রাজা বহুজন নয় কিন্তু একজনমাত্র যিনি বিশ্বকে চালনা করেন ও নিজের আলোতে তা আলোকিত করেন।

৩৯। **বহুঈশ্বরবাদ অসম্ভব একটা ধারণা**

[১] আমাদের এমনটা ভাবতে নেই যে সৃষ্টির নিয়ন্তা ও নির্মাতা বহুজন, কিন্তু প্রকৃত ভক্তি ও সত্যের খাতিরে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, সৃষ্টির কারিগর একজনমাত্র; এবং তেমন কথা খোদ সৃষ্টি দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। বিশ্বের নির্মাতা যে একজনমাত্র, এবিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত হলো এ যে, জগৎ বহু নয় বরং একটামাত্র। কেননা যদি বহু ঈশ্বর থাকত, তাহলে বহু ও ভিন্ন ভিন্ন জগৎও থাকতে হত, কেননা বহু ঈশ্বরের পক্ষেও একটামাত্র জগৎ নির্মাণ করা মানাত না, একটামাত্র জগৎ যে বহু ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত হবে তাও মানাত না; তেমনটা হলে তবে ব্যাপারটা অবশ্যই হাস্যকর হত। [২] প্রথমত, একটামাত্র জগৎ যদি বহু ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত হত তাহলে সেই জগতের বেলায় যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা দিত, কেননা একটামাত্র কাজ বহু কারিগর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। তেমন অবস্থা এক একটা কারিগরের অনৈপুণ্যের সামান্য লক্ষণ হত না, কেননা যখন একজনমাত্র যথেষ্ট হত, তখন বহুজন নিজ নিজ দুর্বলতার সম্পূরণ করতে পারত না। কিন্তু ঈশ্বরে যে কোন না কোন দুর্বলতা রয়েছে তা বলা কেবল অভক্তিকর নয় বরং সমস্ত অনাচারেরও বাইরে। কেননা কোন শিল্পী যদি একা করে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারত না কিন্তু অন্য বহু শিল্পীর সাহায্যেই শুধু তা সম্পন্ন করতে পারত, তাহলে মানুষদের মধ্যে এমন কেউই নেই যে তেমন শিল্পীকে শ্রেষ্ঠ বলত বরং সবাই তাকে দুর্বল বলত। [৩] কিন্তু যদি এক একজন শিল্পী গোটা কাজ সম্পন্ন করতে পারত কিন্তু সাহচর্যের খাতিরে সবাই মিলে কাজ করে থাকত, তাহলে ব্যাপারটা হাস্যকর হত, কেননা এক একজন সুনামের খাতিরে কাজ করত পাছে তার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ

পেত। এবং দেবতাদের মধ্যে যে অসার আত্মশ্লাঘা রয়েছে তা বলা নির্বোধ। [৪] আরও, এক একটা ঈশ্বর যদি বিশ্বকে নির্মাণ করতে সক্ষম হত, তাহলে যখন একজনমাত্র সবকিছুর জন্য যথেষ্ট, তখন বহুঈশ্বরের কী দরকার হত? তাছাড়া, সৃষ্ট বস্তু একটামাত্র হলে কিন্তু যারা কাজে লাগানো তারা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন হলে, তবে ব্যাপারটা অভক্তিকর ও নির্বোধ দেখাত, কেননা প্রাকৃতিক আইন এমনটা বলে যে, যা একক ও শ্রেষ্ঠ, তা বহুবিধের তুলনায় উত্তম।

[৫] একথাও উপলব্ধি করা উচিত যে, যদি জগৎ বহুজন দ্বারা নির্মাণ করা হত, তাহলে তেমন জগতের গতিশীলতা নানা ও সঙ্গতিহীন হত। কেননা এক একজন নির্মাতার দিকে লক্ষ করায় জগতের নানা গতিশীলতা হত; এবং উপরে যেমন বলেছি, এই পার্থক্যের ফলে বিশ্বে এলোমেলোতা ও অসাম্য দেখা দিত। কেননা বহু কর্ণধার দ্বারা চালিত জাহাজ সোজা চলে না যদি না একজনমাত্র কর্ণধার হাল ধরে (ক); বহু শিল্পীদের বাজানো বীণাও মিল-বিশিষ্ট সুর সৃষ্টি করে না যদি না একজনমাত্র শিল্পী বাজায় (খ)। [৬] অতএব, যখন সৃষ্টি একমাত্র, জগৎও একমাত্র, ও তার বিন্যস্ততাও একমাত্র, তখন আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিশ্বের রাজা ও নির্মাতা প্রভু একজনমাত্র। এই কারণেই স্রষ্টা নিজে গোটা জগৎকে একমাত্র করলেন, পাছে বহু জগৎ গঠনের ফলে এমনটা ধরে নেওয়া হত যে, সেই বহু জগতের বহু নির্মাতা আছে; কিন্তু যখন সৃষ্টি এক, তখন তার নির্মাতাও যেন এক বলে স্বীকৃত হন। এবং নির্মাতা যে এক, এজন্যই যে জগৎও এক, তা নয়, কেননা ঈশ্বর অন্য অন্য জগৎও নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু সৃষ্ট জগৎ যখন এক, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে তার নির্মাতাও এক।

৪০। বিশ্ব ঈশ্বরের যুক্তিক্ষমতার তথা বাণীর কর্ম

[১] তবে এই নির্মাতা কেই বা হতে পারেন? একথাও স্পষ্ট করা ও উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন পাছে তাঁর সম্পর্কে অজ্ঞতা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে কেউ না কেউ ধরে নিতে পারত, স্রষ্টা অন্য একজন ও তেমনটা ভেবে আগেকার একই ঈশ্বরহীনতায় পড়ত। কিন্তু আমি মনে করি, এক্ষেত্রে কারও সন্দেহ হয় না। কেননা যখন আমাদের বক্তব্য দেখিয়েছে যে, কবিদের তথাকথিত যে দেবতাগুলো, সেগুলো আদৌ দেবতা নয়; বক্তব্যটা তাদেরও

যুক্তি খণ্ডন করেছে যারা সৃষ্টিকে ঈশ্বরীকৃত করে ও দেখিয়েছে যে তারা ভ্রান্ত, এবং প্রমাণ করেছে যে, বিজাতীয়দের প্রতিমাপূজা একেবারে ঈশ্বরহীনতা ও অভক্তির নামান্তর, তখন যেহেতু ওদের সকলকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছে সেজন্য এমনটা দাঁড়ায় যে সত্যকার যে ধর্ম (ক) তা আমাদেরই ধর্ম, এবং যাঁকে আমরা উপাসনা করি ও যাঁর কথা প্রচার করি, তিনিই একমাত্র সত্যকার ঈশ্বর, সৃষ্টির প্রভু ও সমস্ত অস্তিত্বের নির্মাতা। [২] তবে তিনি কে, সেই তিনি ছাড়া যিনি খ্রিষ্টের পরমপবিত্র ও সমস্ত সৃষ্টবস্তুর ঊর্ধ্বস্থিত পিতা, যিনি উত্তম কর্ণধার হওয়ায় আপন প্রজ্ঞা ও বাণী দ্বারা, অর্থাৎ আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা আমাদের পরিত্রাণের জন্য বিশ্বকে চালনা করেন ও সুবিন্যস্ত করেন, ও তিনি যেইভাবে উত্তম মনে করেন সেই অনুসারে ব্যবহার করেন? বিশ্বও উত্তম, যেহেতু ঠিক এইভাবে নির্মিত হয়েছিল ও আমরা ঠিক সেইভাবে তা দেখতে পাই যেহেতু এটাই তাঁর ইচ্ছা; এবং তেমনটা অবিশ্বাস করতে পারে এমন কেউই নেই। [৩] কেননা সৃষ্টির গতি যদি যুক্তিহীন হত ও বিশ্বকে কল্পনাহীন ভাবে গড়া হত, তাহলে একজন আমাদের বক্তব্য নাও বিশ্বাস করতে পারত। কিন্তু বিশ্ব যখন যুক্তি, প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি ক্রমে নির্মিত ও সম্পূর্ণ বিন্যস্ততা অনুসারে সুবিন্যস্ত, তখন যিনি বিশ্বকে চালনা করেন ও এইভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি ঈশ্বরের বাণী-লোগোস ছাড়া অন্য কেউ হতে পারেন না।

[৪] বাণী বলতে আমি প্রতিটি সৃষ্টবস্তুতে জড়িত ও সহজাত সেই বাণীকে বুঝাই না যা কেউ না কেউ 'বীজবিশিষ্ট' (খ) বলে অভিহিত করতে অভ্যস্ত; বাস্তবিকই তেমন বাণী নিজে থেকে প্রাণহীন, যুক্তিক্ষমতাহীন ও চিন্তা করতেও অক্ষম, কিন্তু বহিরাগত এমন একটা শিল্পের মধ্য দিয়ে কার্যকর যা সেই শিল্পীর নৈপুণ্য অনুযায়ী, যে শিল্পী তা সৃষ্টবস্তুতে প্রতিষ্ঠা করে। আমি এমন বাণীর কথাও বলছি না, যে বাণী মানবীয় ও পদাংশ দিয়ে গঠিত ও আকাশে-বাতাসে ব্যক্ত। না। বাণী বলতে আমি সেই জীবন্ত ও প্রতাপশালী ঈশ্বরকে (গ) বুঝাই, বিশ্বের সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রকৃত বাণী যিনি সৃষ্টবস্তুর চেয়ে ও গোটা সৃষ্টির চেয়েও অন্য; তিনি বরং সেই মঙ্গলময় পিতার একমাত্র ও স্বতন্ত্র বাণী যিনি এসমস্ত বিশ্বকে বিন্যস্ত করেছেন ও নিজের পূর্বজ্ঞান দ্বারা আলোকিত করে থাকেন। [৫] তিনি হলেন সেই মঙ্গলময় পিতার মঙ্গলময় বাণী; এবং তিনিই যা যা বিপরীত তা পুনর্মিলিত ক'রে ও সেই সবকিছু নিয়ে একক একটা সুরসঙ্গতি গঠন করে

সমস্ত কিছুর অনুক্রম স্থির করেছেন। ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা (ঘ) বলে তিনি আকাশের আবর্তন ঘটান ও পৃথিবীকে ঝুলিয়ে তাঁর নিজের ইচ্ছা দ্বারা শূন্যের উপরে বসিয়ে রাখলেন। তাঁর দ্বারা আলোকিত হয়ে সূর্য জগৎকে আলো দান করে, ও চন্দ্র নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী আলোর পরিমাণ গ্রহণ করে। তাঁর দ্বারা জল মেঘে ঝোলা অবস্থায় রয়েছে, বৃষ্টি পৃথিবীকে জলসিক্ত করে, সমুদ্র সীমাবদ্ধ হয়, ও পৃথিবী উদ্ভিদ ও নানা ধরনের গাছ-গাছালিতে পরিবৃত। [৬] আর অবিশ্বাসী যে কেউ আমার এই বচনগুলো সম্পর্কে তদন্ত করত যদি তেমন বাণী প্রকৃতপক্ষে আছেন কিনা, তাহলে তেমন ব্যক্তি ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করায় উন্মাদ হত। কিন্তু সে যা দেখতে পায়, তা থেকেই এমন প্রমাণ পায় যে সবকিছু ঈশ্বরের বাণী-লোগোস ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে অস্তিত্বশীল হল, ও কিছুই অস্তিত্বশীল হত না যদি না সেই বাণী-লোগোস তথা ঐশবাণী দ্বারা গড়া না হত, যেইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪১। প্রকৃতিতে বাণীর উপস্থিতি সম্পর্কে

[১] আমি যেইভাবে বলেছি, বাণী হিসাবে তিনি মানুষের উচ্চারিত বাণীর মত পদাংশ দ্বারা গঠিত নন, তিনি বরং হলেন তাঁর আপন পিতার অপরিবর্তনশীল প্রতিমূর্তি। মানুষ নানা অংশ দিয়ে গঠিত ও শূন্য থেকে নির্মিত; তাদের বাণী নানা শব্দে যুক্ত ও বিভাজ্য। কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী ও যৌগিক নন, সেজন্য তাঁর বাণীও প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী ও যৌগিক নন, বরং তিনি সেই এক ও একমাত্র-জনিত মঙ্গলময় ঈশ্বর যিনি মঙ্গলময় একটা উৎস থেকেই যেন পিতা থেকে উদ্গত ও বিশ্বকে সুবিন্যস্ত করেন ও তা নিজেতে ধারণ করেন। [২] এবং সেই কারণ যার জন্য ঈশ্বরের বাণী সৃষ্টবস্তুদের কাছে সত্যিকারে এলেন, সেই কারণ সত্যিই বিস্ময়কর, এবং এমনটা দেখায় যে, সবকিছু যেইভাবে আছে, সেইভাবে ছাড়া অন্যভাবে হতে পারত না। কেননা শূন্য থেকে অস্তিত্বে এসেছে বিধায় সেই সৃষ্টবস্তুর প্রকৃতি যখন সেটা যা সেই অনুসারে বিবেচিত হয়, তখন অস্থির, দুর্বল ও মরণশীল হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সবকিছুর ঈশ্বর স্বরূপেই মঙ্গলময় ও উত্তম, ফলত তিনি কৃপাময়। কেননা মঙ্গলময় যেকোন জীব কারও ঈর্ষা করে না, তাই তিনি কারও অস্তিত্ব ঈর্ষা করেন না বরং ইচ্ছা করেন, সবাই অস্তিত্বমণ্ডিত হবে যাতে তিনি নিজের কৃপা অনুশীলন করতে পারেন। [৩] তাই এমনটা

দেখে যে, সৃষ্ট সমস্ত প্রকৃতি নিজের প্রকৃত অবস্থা অনুসারে প্রবাহসাপেক্ষ ও ক্ষয়শীল অবস্থায় রয়েছে, সেজন্য যাতে তেমনটা না হয় ও সৃষ্টি শূন্যতায় ফিরে গিয়ে বিলীন না হয়, সেজন্য তাঁর আপন সনাতন বাণী দ্বারা সবকিছু নির্মাণ ক'রে ও সৃষ্টিকে অস্তিত্বে এনে তিনি পাছে সেই সৃষ্টি দূরে সরে যায় ও নিজের প্রকৃতি দ্বারা কষ্টভোগ করে, সেজন্য তা প্রত্যাখ্যান করেননি পাছে সেই সৃষ্টি শূন্যতায় ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। কিন্তু মঙ্গলময় হওয়ায় তিনি গোটা জগৎকে তাঁর সেই আপন বাণী-লোগোস দ্বারা চালনা ও সুস্থির করে রাখেন যিনি নিজে ঈশ্বর, যাতে বাণী-লোগোসের পরিচালনা, পূর্বজ্ঞান ও বিন্যাস-শক্তি দ্বারা আলোকিত হয়ে সৃষ্টি দৃঢ় থাকতে পারে ঠিক একারণে যে, [এসমস্ত কিছুর ফলে] সৃষ্টিও সেই বাণী-লোগোসের অংশী যিনি সত্যিই পিতা থেকে উদ্গত ও নিজের অস্তিত্বে সেই বাণী-লোগোস থেকে সাহায্য পায় পাছে বাণী-লোগোস থেকে রক্ষা না পেয়ে, যা হতে পারত সৃষ্টি তাতে কষ্টভোগ করে, অর্থাৎ পাছে সৃষ্টি অস্তিত্বহীনতায় ফিরে যায়। *কেননা তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, তিনি নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত, কারণ দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে সবই তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই মধ্যে সুস্থির থাকে, ও তিনি হলেন মণ্ডলীর মাথা* [ক], যেইভাবে সত্যের দাস পবিত্র শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন।

৪২। ঐশবাণীর এই ভূমিকা সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

[১] সুতরাং, পিতার সর্বশক্তিমান ও সর্বতশ্রেষ্ঠ পবিত্র বাণী-লোগোস নিজেই সবকিছুতে বিদ্যমান ও দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে তা আলোকিত ক'রে ও নিজেতে একতাবদ্ধ ক'রে সর্বস্থানে নিজের প্রতাপ বিস্তার করেন; তিনি কিছুই নিজের পরাক্রম বঞ্চিত রাখেন না, বরং সবকিছুকে, সর্বস্থানে, এক একজনকে ব্যক্তিগত ভাবে ও সকলকে সমষ্টিগত ভাবে জীবন ও রক্ষা প্রদান করেন। ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত পদার্থের মূলকারণ তথা উষ্ণ ও শীত, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, এসমস্ত কিছু তিনি মিশ্রিত করেন এবিষয়ে লক্ষ রেখে যেন সেই সবকিছু পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী না হয় বরং শ্রুতিমধুর একমাত্র সুরসঙ্গতি ধ্বনিত করে। [২] তাঁর দ্বারা ও তাঁর পরাক্রম দ্বারা আগুন শীতলের সঙ্গে সংগ্রাম করে না, আর্দ্রতাও শুষ্কতার সঙ্গে যুদ্ধ করে না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিপরীত এসমস্ত উপাদান বন্ধু ও আত্মীয়ের মত একসাথে মেশে, জগৎকে জীবন দান করে, ও দেহের জন্য অস্তিত্বের মূলকারণ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের এই বাণী-লোগোসের প্রতি বাধ্যতা

গুণে পৃথিবীর যত বস্তু জীবনপ্রাপ্ত হয় ও স্বর্গের যত কিছু সুস্থিরতা অর্জন করে। তাঁর দ্বারা সমস্ত সাগর ও বিরাট সেই মহাসাগর নিজ নিজ গতি উপযুক্ত সীমায় আবদ্ধ রাখে, ও সমস্ত স্থলভূমি ভিন্ন ভিন্ন যত ধরনের গাছ-গাছালিতে ও উদ্ভিদে পরিবৃত হয়, যেইভাবে উপরে বলেছি। এবং পাছে প্রতিটি দৃশ্যমান বস্তুর নাম উল্লেখ ক'রে অতিরিক্ত সময় কাটাই, সেজন্য আমি শুধু এটুকু বলব যে, অস্তিত্বমণ্ডিত বা সৃষ্ট এমন কিছুই নেই যা তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা ছাড়া অস্তিত্ব পেয়েছে ও সুস্থির থাকে, যেইভাবে ঐশতত্ত্ববিদ বলেন, *আদিতে ছিলেন বাণী: বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, ও কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (ক)। [৩] যেমন একজন বাদক নিজের বীণার তারগুলো সঠিক ক'রে (খ) ও নৈপুণ্যের সঙ্গে গভীর ও তীব্র, মাঝারি ও অন্যান্য সুরগুলো মিশিয়ে একমাত্র সুর ধ্বনিত করে, তেমনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা বিশ্বকে একটা বীণাই যেন ধারণ ক'রে বায়ুমণ্ডলের ও পৃথিবীর, স্বর্গের ও বায়ুমণ্ডলের বস্তুগুলো একত্রে আকর্ষণ করেন ও নিজের আজ্ঞা ও ইচ্ছা দ্বারা সেই সমস্ত একসাথে যুক্ত ক'রে তা ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলোর সঙ্গে একত্র করেন, ও এর ফলে সৌন্দর্যে ও সুরসঙ্গতিতে সেইসব কিছুর অভ্যন্তরে একটামাত্র বাণী ও একটামাত্র বিন্যাস গড়ে তুলতে তুলতে তিনি নিজে পিতার সঙ্গে অবিচল হয়ে থাকেন কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত সত্তা দ্বারা সমস্ত কিছু তাঁর যেমন উত্তম মনে হয় সেই অনুসারে পিতার দিকে চালনা করেন। [৪] তাঁর ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে যা বিস্ময়কর তা হলো এ যে, এ ও একমাত্র আজ্ঞা দ্বারা তিনি এক একটা বস্তু যথা যা সোজা ও যা বক্র, যা উপরে, মাঝখানে ও নিচে, যা আর্দ্র, শীতল ও উষ্ণ, যা দৃশ্য ও যা অদৃশ্য সেই সব যে যার স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে একসাথে যুক্ত ও সুবিন্যস্ত করেন, এবং তেমনটা তিনি নানা সময়কালে নয়, কিন্তু একবার একনিমেষেই সম্পাদন করেন। কেননা তাঁর একমাত্র আজ্ঞায় সেই সমস্ত কিছু একসাথে থাকতে থাকতে যা সোজা তা সোজা পথে চলাচল করে, যা বক্র তা নিজ স্বীয় বক্রতা অনুযায়ী চলাচল করে ও যা মাঝারি তা নিজ স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে চলাচল করে; যা উষ্ণ তা জ্বলে ও যা শুষ্ক তা শুকিয়ে দেয়; তাঁর দ্বারা সবকিছু যে যার প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন ও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়; ও তাঁর দ্বারা আশ্চর্যজনক ও সত্যিকারে ঐশ সুরসঙ্গতি ধ্বনিত হয়।

৪৩। বিশ্বের সঙ্গে বাণী-লোগোসের সম্পর্ক

[১] যাতে তেমন মহৎ বিষয় একটা উদাহরণ যোগে উপলব্ধি করা যেতে পারে, সেজন্য আমরা যা বলে এসেছি তা তুমি বৃহত্তর এমন একটা গায়কদলের বেলায় প্রযুক্ত বলে ভাব, যে গায়কদল নানা পুরুষ, ছেলেমেয়ে, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও যুবকদের নিয়ে গঠিত। গায়কদলের একটা পরিচালক আছে, ও সে ইঙ্গিত দিলে এক একজন যে যার প্রকৃতি ও সাধ্য অনুসারে গান করে অর্থাৎ পুরুষ পুরুষের মত, ছেলেটা ছেলের মত, বৃদ্ধজন বৃদ্ধের মত ও যুবকটা যুবকের মত গান করে কিন্তু তারা সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠের একমাত্র সুরসঙ্গতি ধ্বনিত করে। [২] অথবা, আর একটা উদাহরণ অনুসারে, আমাদের প্রাণ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে সেগুলোর নিজ নিজ ভূমিকা অনুসারে একই ক্ষণে চালনা করে, ফলে সেগুলো যখন একই বস্তুর সম্মুখীন হয় তখন সবাই মিলে কাজ করে (ক): চোখ দেখে, কান শোনে, হাত স্পর্শ করে, ঘ্রাণশক্তি ঘ্রাণ করে, স্বাদশক্তি স্বাদ নেয়, এমনকি প্রাণ দেহের অন্যান্য অঙ্গও চালনা করে যার ফলে পা হেঁটে বেড়ায়। [৩] অথবা, আর একটা উদাহরণ দ্বারা আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য এটা ধরে নিই: ব্যাপারটা হলো কেমন যেন মহৎ একটা শহরের মত যা নির্মিত হয়েছে ও সেই একই শাসনকর্তা বা রাজার উপস্থিতি দ্বারা শাসিত যিনি শহরটা নির্মাণ করেছিলেন (খ)। যখন তিনি উপস্থিত আছেন ও সবকিছুর উপর নজর রেখে আজ্ঞা জারি করেন, তখন সবাই বাধ্য হয়; কেউ কেউ তাড়াতাড়ি করে মাঠে যায়, অন্য কেউ জল জলের আধারে তুলে দেয়; একজন প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করতে রওনা হয়, অর একজন প্রবীণসভায় যোগ দেবার জন্য প্রস্তুতি নেয়, আর একজন গির্জায় প্রবেশ করে, বিচারকর্তা বিচার করতে যায়, প্রশাসনের লোক আদালতে যায়; কর্মী কাজের দিকে ছোটে, নাবিক সমুদ্রের দিকে চলে, ছুতোর নিজের কাজে লাগে, চিকিৎসক ঔষধ প্রস্তুত করে, মিস্ত্রী গাঁথে, একজন বিলে যায়, অন্য একজন মাঠ থেকে ফেরে, কেউ কেউ শহরে ঘোরাফেরা করে, অন্যান্যরা শহর ছেড়ে চলে যায় বা শহরে ফিরে আসে। এসমস্ত কিছু শাসনকর্তার উপস্থিতি ও আজ্ঞা ক্রমেই ঘটে ও চলে। [৪] তেমনটা ঘটে গোটা জগতের বেলায়। উদাহরণটা তত উপযুক্ত নাও হতে পারে, কিন্তু জ্ঞান প্রসারিত করলে তা বোঝা উচিত। কেননা সেই বাণী-লোগোস-ঈশ্বরের ইচ্ছার একটামাত্র ইঙ্গিত দ্বারাই এক একটা বস্তু নিজ

নিজ উপযুক্ত পথে চলতে চলতে সমস্ত কিছু একতাবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হয় এবং এই গোটা সবকিছু একটামাত্র বিন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪৪। দৃশ্য-অদৃশ্য গোটা বিশ্ব সম্পর্কে

[১] কেননা বিশ্বের পরিচালক ও নিয়ন্তা তথা পিতার ঐশবাণী-লোগোসের ইচ্ছা ও পরাক্রম গুণেই আকাশমণ্ডলের আবর্তন হয়, তারানক্ষত্র চলাচল করে, সূর্য আলো ছড়ায়, চন্দ্র ঘোরে, বায়ুমণ্ডল সূর্য দ্বারা আলোকিত হয়, হাওয়া উষ্ণ হয়, বাতাস বয়, পাহাড়পর্বত ঊর্ধ্বস্থানে গিয়ে পৌঁছোয়, সাগর ঢেউতে আলোড়িত হয় ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেই সমস্ত প্রাণীকে খাদ্য যোগায়, পৃথিবী স্থির হয়ে দাঁড়ায় ও ফল উৎপাদন করে, মানুষ গঠিত হয়, জীবনযাপন করে ও শেষে মৃত্যুবরণ করে; এক কথায়, সবকিছু জীবিত থাকে ও চলাচল করে। আগুন পুড়িয়ে দেয়, জল শীতল আনে, জলের উৎস জল উৎসারিত করে, নদনদী বয়, ঋতু ও যুগ ঠিক সময় উপস্থিত হয়, বৃষ্টি পড়ে, মেঘ ভরে যায়, শিলাবৃষ্টি হয়, হিম পড়ে ও সবকিছু বরফ করে, পাখি ওড়ে, সাপ বুকে চলাচল করে, মাছ সাঁতার কাটে, সাগরে নৌকা চলাচল করে, ভূমিতে বপন হয় ও নির্ধারিত সময় সেই ভূমি ফল উৎপন্ন করে, গাছ-গাছালি বড় হয়, কয়েকটা আশুপক্ক, অন্য কয়েকটা পরিপক্ক, অন্য কয়েকটা বৃদ্ধ বয়সে বড় হয় ও মরে; কয়েকটা বিনষ্ট হয় ও অন্য কয়েকটা জন্মায় ও উৎপন্ন হয়। [২] এসমস্ত কিছু, এমনকি আরও বেশি এমন কিছু রয়েছে যা সেগুলোর সংখ্যার জন্য আমরা উল্লেখ করতে পারি না; হ্যাঁ, যিনি তেমন বিস্ময়কর ও আশ্চর্য কিছু ঘটান, ঈশ্বরের সেই বাণী-লোগোসই এই সমস্ত কিছু আলোকিত ও সঞ্জীবিত করেন; তাঁর স্ব-ইচ্ছা দ্বারাই তিনি একমাত্র অনুক্রম সৃষ্টি ক'রে এসমস্ত কিছু গতিশীল করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এবং তিনি যে অদৃশ্য প্রতাপগুলোকে নিজের শাসনের বাইরে ফেলে রাখেন তাও নয়; বরং সেগুলোর নির্মাতা বলে তিনি নিজের ইচ্ছা ও পূর্বজ্ঞান দ্বারা সেগুলোকেও ধারণ ক'রে ও জীবনদান ক'রে বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত করেন। এবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার কোন কারণ নেই। [৩] কেননা যেমন তাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা দেহগুলো বড় হয়, যুক্তিক্ষমতা-বিশিষ্ট প্রাণ চালিত হয় ও যুক্তিক্ষমতা ও জীবনের অধিকারী হয় (এবং এ এমন বিষয় যা ক্ষেত্রে কোন প্রমাণ দরকার হয় না যেহেতু আমরা নিজেরা তা ঘটতে দেখি), তেমনিভাবে ঈশ্বরের বাণী-লোগোস পুনরায়

তাঁর একটামাত্র ইচ্ছা-সঙ্কেতের মাধ্যমে নিজের পরাক্রম দ্বারা দৃশ্যগত জগৎকে ও অদৃশ্যগত প্রতাপগুলোকে যে যার স্বতন্ত্র ভূমিকা প্রদান ক'রে গতিমণ্ডিত করেন ও ধারণ করেন যার ফলে ঐশপ্রতাপগুলো আরও দিব্য গতির অধিকারী হয় ও দৃশ্য বস্তুগুলো সেই ভাবে থাকে যেভাবে আমরা সেগুলোকে দেখতে পাই। এবং তিনি নিজে সবকিছুর নিয়ন্তা, রাজা ও অবলম্বন হওয়ায় তাঁর আপন পিতার গৌরব ও জ্ঞানকে লক্ষ্য ক'রে সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে সবকিছু করেন ও তাঁর সাধিত এ সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে শেখান যে, *সৃষ্টবস্তুগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন* (ক)।

৪৫। এবিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা (১)

[১] যেমন আকাশের দিকে চোখ তুলে ও সেটার সুবিন্যস্ততা ও তারানক্ষত্রের আলো দেখে একজন সেই বাণী-লোগোসের একটা ধারণা প্রাপ্ত হয় যিনি সেই সুবিন্যস্ততা প্রতিষ্ঠা করলেন, তেমনি ঈশ্বরের বাণী-লোগোসের কথা ভেবে একজন তাঁর পিতা সেই ঈশ্বরের কথাও ভাবতে বাধ্য যাঁর কাছ থেকে তিনি উদ্গত বিধায়ই তাঁর আপন পিতার ব্যাখ্যাতা ও দূত বলে অভিহিত। [২] আমাদের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটে, তা থেকে একজন এসমস্ত কিছু দেখতে পায়। কেননা যেমন যখন একটা বাণী মানুষ দ্বারা উচ্চারিত হয় তখন আমরা এমনটা ভাবি যে, সেই বাণীর উৎস হলো তার মন, ও সেই উচ্চারিত বাণীর প্রতি মনোযোগ দিয়ে আমরা যুক্তিক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই মন উপলব্ধি করি যা সেই বাণীকে প্রকাশ করে, তেমনি মহত্তর কারণে ও আমাদের কল্পনার মহত্তর ও ঊর্ধ্বতর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা যখন বাণী-লোগোসের পরাক্রম দেখি, তখন তাঁর মঙ্গলময় পিতা সম্পর্কে একটা ধারণা প্রাপ্ত হই, যেইভাবে ত্রাণকর্তা নিজে বলেন, *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে* (ক)। কিন্তু এই কথা অনুপ্রাণিত শাস্ত্র আরও স্পষ্ট ভাবে ও অধিকতর অধিকার সহকারে প্রচার করে, এবং শাস্ত্রে আমাদের আস্থাই তোমার কাছে লিখতে আমাদের সাহস যোগায়; এবং তুমি আমাদের একথা প'ড়ে, আমরা যা কিছু বলি তাতে তুমি আস্থা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। কেননা একটা বক্তব্য যখন অধিক প্রবল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, তখন তার প্রমাণসিদ্ধতা অখণ্ডনীয় হয়।

[৩] পুরাকালে ঐশবাণী প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করতে ইহুদী জনগণকে সতর্ক করেছিলেন, *তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না; উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি করবে না* (খ)। তেমন বিনাশের কারণ ঐশবাণী অন্য এক বচনে ইঙ্গিত করে বলেন, *বিজাতীয়দের দেবমূর্তিগুলি রুপো আর সোনা, মানুষেরই হাতে গড়া: মুখ আছে, তবু কিছুই বলে না, চোখ আছে, তবু দেখে না, কান আছে, তবু শোনে না, নাক আছে, তবু ঘ্রাণ পায় না, হাত আছে, তবু স্পর্শ করতে পারে না, পা আছে, তবু চলতে পারে না* (গ)। সৃষ্টি সংক্রান্ত শিক্ষা দিতেও তিনি অবহেলা করেননি, বরং সৃষ্টির সৌন্দর্য সম্পর্কে অতি সচেতন হওয়ায় তিনি মানুষকে সতর্ক করেছিলেন পাছে কেউ না কেউ কেবল সেই সৌন্দর্যেই আকর্ষিত হয়ে সৃষ্টিকে ঈশ্বরের কর্ম বলে নয় কিন্তু সৃষ্টি নিজেই ঐশ্বরিক বলে তা উপাসনা করে, *এবং আকাশের দিকে চোখ তুলে সূর্য, চন্দ্র ও আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনী দেখলে তোমরা যেন ভ্রষ্ট হয়ে সেই সবকিছুর উদ্দেশে প্রণিপাত না কর যা তোমার ঈশ্বর প্রভু গোটা আকাশমণ্ডলের নিচে থাকা সকল জাতির কাছে বণ্টন করেছেন* (ঘ)। ঈশ্বর জাতিগুলোর কাছে সেই সব কিছু বণ্টন করেছিলেন, কিন্তু সেইসব কিছু যে তাদের দেবতা হয়ে উঠবে সেজন্য তা বণ্টন করেননি বরং এজন্য বণ্টন করেছিলেন যাতে সেগুলোর কাজকর্ম দ্বারা বিজাতীয়রা বিশ্বনির্মাতা ঈশ্বরকে জানতে পারে, যেইভাবে আমি ব্যাখ্যা করেছি। [৪] কেননা ইহুদী জনগণ আগে পূর্ণতর শিক্ষা পেয়েছিল কেননা তারা ঈশ্বরজ্ঞান কেবল সৃষ্টির কর্মসমূহ থেকে শুধু নয়, ঐশশাস্ত্র থেকেও পেয়েছিল। এবং শাস্ত্র প্রতিমাপূজা ও যুক্তিক্ষমতাহীন মূর্তি জনিত ভুলভ্রান্তি থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য নিচের বচন দ্বারা সাধারণ একটা যুক্তি উপস্থাপন করেছিল, *আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন দেবতা থাকবে না* (ঙ)। এর মানে এ নয় যে, কেমন যেন এমন কতগুলো দেবতা রয়েছে যেগুলোকে রাখতে শাস্ত্র মানুষকে নিষেধ করছিল, বরং বচনের অর্থই পাছে কেউ না কেউ সত্যকার ঈশ্বর থেকে দূরে সরে পড়ে নিজের জন্য অস্তিত্বহীন বস্তুকে ঈশ্বরীকৃত করতে শুরু করে, ঠিক সেই নকল দেবতাগুলোর মত যা নবীদের ও ইতিহাস-লেখকদের দ্বারা উল্লিখিত ও নির্দেশিত। ‘আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন দেবতা থাকবে না’ বচনটা ক্রিয়া কালের ভবিষ্যৎকাল

ব্যবহার করায় এমনটা দেখায় যে, সেগুলো দেবতা নয়। এবং কথা বলার সময়ে যা কিছু ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে, সেই সবকিছু নেই।

৪৬। এবিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা (২)

[১] তবে কি, বিজাতীয়দের ঈশ্বরহীনতা ও প্রতিমাপূজা খণ্ডন করার পর অনুপ্রাণিত শাস্ত্র কি নীরব থেকে মানবজাতিকে দৈবতত্ত্বজ্ঞানহীন অবস্থায় একা ফেলে রেখে ভাস্যমান অবস্থায় ছাড়ল? মোটেই না, বরং শাস্ত্র মানুষের মন আগে থেকে অনুমান করে বলল, *শোন, ইস্রায়েল! যিনি তোমার প্রভু ঈশ্বর, সেই প্রভু এক* (ক); আরও, *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে* (খ); আরও, *তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তুমি উপাসনা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে, কেবল তাঁকেই আঁকড়িয়ে ধরবে* (গ)। [২] এবং যেহেতু গোটা সেই অনুপ্রাণিত শাস্ত্র বাণী-লোগোসের সার্বিক ও সার্বজনীন পূর্বজ্ঞান ও বিন্যাসক্ষমতা বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে, সেজন্য আমাদের বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত করার জন্য নিচের বচন যথেষ্ট, যেইভাবে এবিষয়ে ঐশতত্ত্ববিদেরাও সমর্থন দেয়, *তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করেছ বলে পৃথিবী থাকে অবিচল। তোমার শাসনবিধি গুণে দিনটা থাকে অবিচল* (ঘ); আরও, *তোমার ঈশ্বরের উদ্দেশে সেতারের সুরে গেয়ে ওঠ গান। তিনি আকাশ মেঘ দিয়ে ঘিরে রাখেন, পৃথিবীর জন্য বৃষ্টিধারা জমিয়ে রাখেন, মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে পর্বতে পর্বতে ঘাস ও উদ্ভিদ অঙ্কুরিত করেন ও পশুপালকে খাদ্য দান করেন* (ঙ)। [৩] কিন্তু যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছিল, তাঁরই দ্বারা ছাড়া তিনি কাঁর্ দ্বারাই বা দান করেন? তবে সার্বিক পূর্বজ্ঞান তাঁরই থেকে উদ্গত যাঁর দ্বারা সবই হয়েছিল। তবে ঈশ্বরের বাণী-লোগোস ছাড়া সেই তিনি কে? তাঁর বিষয়ে শাস্ত্র অন্যত্র বলে, *প্রভুর বাণীতেই স্থাপিত হল আকাশমণ্ডল, ও তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত প্রতাপ* (চ)। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্র এমনটা বলে যে, সবকিছু তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা হয়েছিল; [৪] সেজন্য শাস্ত্র এবিষয়ে এই বচন দিয়ে আমাদের নিশ্চিত করে, *তিনি কথা বলতেই সবই নির্মিত হল, ও তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই সৃষ্ট হল* (ছ)। একইপ্রকারে সেই মহান মোশিও সৃষ্টি সংক্রান্ত তাঁর আপন পুস্তকের শুরুতে এসমস্ত বচন সপ্রামাণ করে এভাবে সেগুলো ব্যাখ্যা করেন, *ঈশ্বর বললেন, "এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষ নির্মাণ*

করি [জ]; তারপর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও বিশ্বের সৃষ্টিকর্ম শুরু করতে গিয়ে পিতা তাঁকে বললেন, *আকাশমণ্ডল নির্মিত হোক, ও জলরাশি একসাথে জড় হোক, ও শুকনো স্থান দেখা দিক; এবং ভূমি সবুজ ঘাস ও যত প্রাণীকে উৎপন্ন করুক* [ঝ]।

এসমস্ত বচন দ্বারা একজন ইহুদীদের এবিষয়ে অভিযুক্ত করতে পারত যে, তারা শাস্ত্রকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারেনি। [৫] কেননা একজন জিজ্ঞাসা করতে পারত, ঈশ্বর এমন কার্ সঙ্গে কথা বলছিলেন যে তিনি আজ্ঞা দেবেন? তিনি যদি সৃষ্টজীবদের আজ্ঞা দিচ্ছিলেন ও তাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাহলে তাঁর কথা অনাবশ্যক হত, কেননা সেই সৃষ্টজীব তখনও অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয়নি কিন্তু নির্মিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এমন কেউই নেই যে অস্তিত্বহীন ব্যক্তির কাছে কথা বলে, এমন কাউকেও আজ্ঞা দেয় বা কারও সঙ্গে কথা বলে যে এখনও অস্তিত্বপ্রাপ্ত নয়। কেননা যদি ঈশ্বর যা হওয়ার কথা এমন জীবকে আজ্ঞা দিতেন, তাহলে তিনি বলতেন, 'হে আকাশ, হও; হে পৃথিবী, হও; হে গাছ-গাছালি, এগিয়ে এসো; হে মানুষ, হও'। কিন্তু তিনি তেমনটা করেননি বরং একথা উচ্চারণ করেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন, 'এসো, মানুষ নির্মাণ করি, ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হোক', যা দ্বারা দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর নিকটবর্তী একজনের সঙ্গে এসমস্ত বিষয়ে কথা বলছিলেন। সুতরাং এমনটা দাঁড়ায় যে, যখন ঈশ্বর বিশ্বকে নির্মাণ করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অবশ্যই এমন একজন ছিল যার সঙ্গে তিনি কথা বললেন। [৬] তেমন ব্যক্তি কেইবা হতে পারতেন সেই বাণী-লোগোস ছাড়া? কেননা ঈশ্বর বিষয়ে কেমন করে বলা যেতে পারে যে তিনি তাঁর আপন বাণী-লোগোসের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন? এবং যখন তিনি সমস্ত সৃষ্টবস্তু নির্মাণ করছিলেন, তখন তাঁর আপন প্রজ্ঞা ছাড়া কেইবা তাঁর সঙ্গে ছিল? প্রজ্ঞা নিজেই বলেন, *যখন তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম* [ঞ]। আকাশ ও পৃথিবী উল্লেখে আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্ট সমস্ত কিছুও অন্তর্ভুক্ত। [৭] কিন্তু পিতাকে দেখছিলেন এমন প্রজ্ঞা ও এমন বাণী-লোগোস তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান হওয়ায়ই তিনি বিশ্বকে নির্মাণ করলেন, গড়লেন ও সুবিন্যস্ত করলেন; এবং পিতার পরাক্রম হওয়ায় তিনি সবকিছুকে অস্তিত্বে আসবার শক্তি দান করলেন, যেইভাবে ত্রাণকর্তা বলেন, *আমি পিতাকে যা কিছু করতে দেখি, আমিও তেমনি সেইমত করি* [ট]। এবং তাঁর পবিত্র শিষ্যেরা শেখান যে, সবই 'তাঁর দ্বারা ও তাঁর

মধ্যে' নির্মিত হয়েছিল; [৮] এবং মঙ্গলময় পিতার মঙ্গলময় জনিতজন ও সত্যকার পুত্র হওয়ায় তিনি হলেন পিতার পরাক্রম, তাঁর প্রজ্ঞা ও তাঁর বাণী-লোগোস, কিন্তু অংশগ্রহণ গুণে নয়, এমনভাবেও নয় কেমন যেন এসমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁকে বাইরে থেকে আরোপ করা হয়েছিল যেইভাবে তাদেরই বেলায় ঘটে যারা তাঁর অংশভাগী হয় ও তাঁর দ্বারা যাদের প্রজ্ঞাবান করা হয় ও তাঁর মধ্যে যারা শক্তি ও যুক্তিক্ষমতা প্রাপ্ত হয়; তিনি বরং হলেন প্রকৃত প্রজ্ঞা, প্রকৃত বাণী-লোগোস, ও নিজেই পিতার আপন পরাক্রম, প্রকৃত আলো, প্রকৃত সত্য, প্রকৃত ধর্মময়তা, প্রকৃত সদ্‌গুণ, এমনকি মুদ্রাঙ্কন, উজ্জ্বলতা ও প্রতিমূর্তি। এক কথায়, তিনি হলেন পিতার সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠতম ফল, মাত্র তিনিই পুত্র ও পিতার অপরিবর্তনশীল প্রতিমূর্তি।

৪৭। মানব পরিত্রাণের জন্য ঐশবাণীর প্রয়োজনীয়তা

[১] তবে তিনি কে, যিনি পিতার এমন বিবরণ দিতে পারেন যেন তাঁর বাণীর পরাক্রম নির্ণয় করা যেতে পারে? কেননা তিনি হলেন পিতার বাণী-লোগোস ও প্রজ্ঞা, ও একইসময় সৃষ্টবস্তুর প্রতি সংবেদনশীল; সেই সৃষ্টবস্তুকে নিজের জনকের বিষয়ে জ্ঞান ও একটা ধারণা দেবার জন্য তিনি প্রকৃত পবিত্রতা ও প্রকৃত জীবন, তিনি দরজা, পালক ও পথ, তিনি রাজা, পথপ্রদর্শক ও সকলের ত্রাণকর্তা, জীবনদাতা এবং আলো ও সার্বিক পূর্বজ্ঞান। নিজের জনিতজনের মত তেমন মঙ্গলময় পুত্র ও স্রষ্টা থাকায় পিতা তাঁকে সৃষ্টবস্তুর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখেননি বরং দিনে দিনে সকলের কাছে তাঁকে সেই বিশ্বের সুবিন্যস্ততা ও জীবনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, যে বিশ্ব তাঁর আপন কর্ম। [২] কিন্তু তাঁর মধ্যে ও তাঁর দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন যেইভাবে ত্রাণকর্তা বলেন, *আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন* (ক)। তাই এমনটা দাঁড়ায় যে, বাণী-লোগোস তাঁর আপন জনকের মধ্যে ও জনিতজন পিতার সঙ্গে অনন্তকালীন ভাবে জীবিত।

কিন্তু ব্যাপারটা তেমনটা হলে ও তাঁকে ব্যতীত কিছুই নেই বলে বরং আকাশ ও পৃথিবী ও সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তাঁর উপর নির্ভরশীল, তাসত্ত্বেও নিজের উন্মাদনায় মানুষ তাঁর সংক্রান্ত জ্ঞান ও তাঁর প্রতি ভক্তি পরিত্যাগ ক'রে যিনি প্রকৃতই আছেন তাঁর চেয়ে যার অস্তিত্ব নেই তেমন কিছুকেই সম্মান আরোপ করল ও স্রষ্টার

বদলে সৃষ্টবস্তুকে পূজা ক'রে (খ) প্রকৃত ও সত্যকার ঈশ্বরের স্থানে তা-ই ঈশ্বরীকৃত করল যা প্রকৃতপক্ষে নেই; তা এমন ব্যবহার যা নির্বুদ্ধিতা ও অভক্তির নামান্তর। [৩] কেননা ব্যাপার এমন, কেমন যেন এক ব্যক্তি শিল্পীর চেয়ে তার শিল্পকর্মেরই বেশি প্রশংসা করত, ও শহরে যত নির্মাণকর্মে বিস্মিত হয়ে প্রকৃত নির্মাতাকে অবজ্ঞা করত (গ); অথবা, কেমন যেন এক ব্যক্তি একটা বাদ্যযন্ত্রের স্তুতিবাদ করত কিন্তু সেই যন্ত্রকে যে বানিয়েছিল ও সেটার তারগুলো সূক্ষ্ম সুর অনুসারে সঠিক করেছিল (ঘ) সে তাকে বিদ্রূপ করত। নির্বোধ ও একেবারে অন্ধ মানুষ! কেননা সেই লোকেরা কেমন করে সেই ঘর, সেই জাহাজ বা সেই বীণার কথা জানতে পারত যদি না সেই জাহাজের নির্মাতা জাহাজ না তৈরি করত, সেই ঘরের নির্মাতা ঘর না নির্মাণ করত ও সেই বীণার শিল্পী বীণাকে না গড়ত? [৪] যে কেউ এভাবে ভাবে সে যেমন উন্মাদনার শেষ পর্যায়ের উন্মাদ, তেমনি আমার মতে তারাও একইভাবে মনে অসুস্থ যারা ঈশ্বরকে চিনে নেয় না ও তাঁর বাণী-লোগোস, সকলের ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টকে উপাসনা করে না যাঁর দ্বারা পিতা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, নিজেতে ধারণ করেন ও সবকিছুর উপর আপন পূর্বজ্ঞান বিস্তার করেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি তোমার থাকলে, হে খ্রিষ্টপ্রেমিক, আনন্দ কর ও মঙ্গলময় আশা রাখ, কেননা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির ফল হলো অমরতা ও স্বর্গরাজ্য, কিন্তু শুধু এই শর্তে যে, তোমার প্রাণ তাঁর বিধিবিধান অনুসারে পরিবৃত। কেননা যারা তাঁর প্রতি বাধ্যতায় জীবনযাপন করে তারা যেমন পুরস্কার হিসাবে অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়, তেমনি যারা সদ্‌গুণের পথে নয় বরং বিপরীত পথে চলে, তারা বিচারের দিনে বড় লজ্জা ও দয়াহীন বিপদের সম্মুখীন হবে, কারণ সত্য অভিমুখে পথ জানলেও তারা যা জানত সেটার বিপরীত আচরণ করল।

---

১ (ক) এখানে 'গ্রীকদের বিপক্ষে' ও 'বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ' পুস্তকদ্বয়ের আলোচ্য বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপিত তথা, ত্রাণকর্তার মাংসধারণ মানুষের উপরে দিয়াবলের প্রভাব অর্থাৎ সেই মৃত্যুকে উল্টিয়ে দিয়েছে ও মানুষদের মাঝে ঈশ্বরজ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে (বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ১৫, ২০, ৩২, ৫৪ অধ্যায় দ্রঃ)। ক্রুশ সম্পর্কে বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ৪৭:২ দ্রঃ।

২ (ক) এই ২য় অধ্যায়ে (এবং বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ৩:৩) ‘পবিত্রজন’ বলতে স্বর্গদূতদের বোঝায়।

(খ) সাধু আথানাসিউসের ধারণায়, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের ‘সাদৃশ্য’ হলো ঈশ্বর কর্তৃক মানুষকে দেওয়া জ্ঞান। এবিষয়ে বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ১১:৩ ও ৫৭ অধ্যায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

(গ) মথি ৫:৮।

৪ (ক) ১ করি ৬:১২।

৫ (ক) সাম ১৪:৩ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ৩:১৪ দ্রঃ।

৬ (ক) ‘কোন না কোন গ্রীক মানুষ’: এখানে সাধু আথানাসিউস গ্রীক জ্ঞানমার্গ-পন্থীদের ও মানি-পন্থীদের উদ্দেশ করে কথা বলছেন। মণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোর ভ্রান্তমতসমূহ সম্পর্কে যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ‘ধর্মশিক্ষা’ দ্রষ্টব্য।

(খ) ১ তি ১:১৯।

(গ) এখানে মার্কিওন-পন্থীদের ভ্রান্তমত খণ্ডন করা হচ্ছে। এবিষয়েও যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ‘ধর্মশিক্ষা’ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) মার্ক ১২:২৯; বিঃবিঃ ৬:৪ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ১১:২৫।

৭ (ক) উপ ৭:২৯।

৮ (ক) ২ করি ৪-১৮ দ্রঃ।

(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।

(গ) প্রবচন ১৮:৩ সত্তরী পাঠ্য।

৯ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:২।

১১ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:১২-২১।

১৩ (ক) রো ১:২৫ দ্রঃ।

১৪ (ক) সাম ১১৫:৪-৬ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৪৪:১০-২০ সত্তরী পাঠ্য।

১৬ (ক) আখিল্লেস, থের্সিতেস ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব-সকল হলো হোমারের মহাকাব্যের চরিত্র।

১৭ (ক) প্রজ্ঞা ১৪:২১।

১৯ (ক) রো ১:২১-২৪ দ্রঃ।

২০ (ক) মানবস্বরূপ-ধারণ ২৯ অধ্যায় দ্রঃ।

২৩ (ক) মথি ১৩:১৩ দ্রঃ।

২৬ (ক) রো ১:২৬-২৭।

২৭ (ক) সাম ১৯:২।

৩০ (ক) দ্বিঃবিঃ ৩০:১৪ সত্তরী পাঠ্য ; রো ১০:৮ দ্রঃ।

(খ) লুক ১৭:২১।

৩৪ (ক) আদি ১:২৬ সত্তরী পাঠ্য।

৩৫ (ক) রো ১:২০।

(খ) প্রেরিত ১৪:১৫-১৭ দ্রঃ।

(গ) সেকালে প্রচলিত ‘স্তোয়া’ মতবাদ অনুসারে, বিশ্বজগতের অনুক্রম থেকে অনুমান করা যায় যে সেটার একটি স্রষ্টা আছেন।

৩৯ (ক) ৩৬:১ দ্রঃ।

(খ) ৩১:৪ দ্রঃ।

৪০ (ক) ‘সত্যকার ধর্ম’ : পৌত্তলিক যত ধর্মের তুলনায় খ্রিষ্টধর্মই সত্যকার ধর্ম।

(খ) ‘বীজবিশিষ্ট’ : ইউস্তিনুস, ২য় পক্ষসমর্থন ১৩:৩ দ্রঃ।

(গ) যোহন ১:১।

(ঘ) ১ করি ১:২৪ দ্রঃ।

৪১ (ক) কল ১:১৫-১৮ দ্রঃ।

৪২ (ক) যোহন ১:১, ৩।

(খ) ৩১:৪ দ্রঃ।

৪৩ (ক) ৩১:১ দ্রঃ।

(খ) ৩৮:১ দ্রঃ।

৪৪ (ক) প্রজ্ঞা ১৩:৫।

৪৫ (ক) যোহন ১৪:৯।

(খ) যাত্রা ২০:৪ দ্রঃ।

(গ) সাম ১১৫:৪-৭।

(ঘ) দ্বিঃবিঃ ৪:১৯ মত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) যাত্রা ২০:৩ সত্তরী পাঠ্য।

৪৬ (ক) দ্বিঃবিঃ ৬:৪ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) দ্বিঃবিঃ ৬:৫ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) সাম ১১৯:৯০-৯১ সত্তরী পাঠ।

(ঙ) সাম ১৪৭:৭-৯ সত্তরী পাঠ।

(চ) সাম ৩৩:৬ সত্তরী পাঠ্য।

(ছ) সাম ৩৩:৯ সত্তরী পাঠ্য।

(জ) আদি ১:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঝ) আদি ১:৬, ৯, ১১-১২, ২০ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঞ) প্রবচন ৮:২৭ সত্তরী পাঠ্য।

(ট) যোহন ৫:১৯ দ্রঃ।

৪৭ (ক) যোহন ১৪:১০।

(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।

(গ) ৩৮:১ দ্রঃ।

(ঘ) ৩১:১-২ দ্রঃ।

বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

[বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ও দেহের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে একই লেখকের উপদেশ]

‘গ্রীকদের বিপক্ষে’ ও **‘বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ’** লেখাদ্বয় একটামাত্র পুস্তকের এমন দুই খণ্ড বলে বিবেচনাযোগ্য যা তিনি খ্রিষ্টিয়ানদের জন্য নয়, রোম-সাম্রাজ্যের তখনও বিপুল পৌত্তলিকদের উদ্দেশ করে লিখেছিলেন।

এই লেখায় সাধু আথানাসিউস পতিত মানুষের জন্য খ্রিষ্ট-সাধিত মুক্তিকর্মের কথা উপস্থাপন করেন; তেমন মুক্তিকর্ম বিষয়ে দু’টো দিক লক্ষণীয়, তথা: (১) খ্রিষ্ট মানুষের আদিপাপের ফল সেই দৈহিক মৃত্যুর উপর জয়ী হন, ও (২) নিজের মৃত্যুতে তেমন বিজয় লাভ ক’রে তিনি মানুষের প্রাণ ও আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনেন যাতে মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার ফলে ঈশ্বরকে উপলব্ধি ক’রে ও উত্তরাধিকার হিসাবে অমরতা প্রাপ্ত হয়ে ঐশ্বরিক হয়ে উঠতে পারে। এসমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ঐশতাত্ত্বিক ভাষা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে সরল-সোজা ভাষায় খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষকে খ্রিষ্টবিশ্বাসে আকর্ষণ করতে অভিপ্রেত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭

১। পিতা জগদ্‌স্রষ্টা বাণী দ্বারাই জগৎকে ত্রাণ করলেন

[১] এই লেখার পূর্ববর্তী অংশে [ক] আমরা বহু বিষয়ের মধ্য থেকে কয়েকটা বেছে নিয়ে প্রতিমা সম্পর্কে বিজাতীয়দের ভুলভ্রান্তি, তাদের প্রতিমাপূজা ও সেই প্রতিমাগুলোকে কিভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছিল এসমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট বলেছি; অর্থাৎ কিনা, কেমন করে মানুষ নিজের দুষ্টতা থেকেই প্রতিমাপূজা নিজের জন্য পরিকল্পনা করেছিল। অন্যদিকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা পিতার বাণীর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ও তাঁর

সার্বিক পূর্বজ্ঞান ও পরাক্রম সম্পর্কেও কিছুটা উত্থাপন করেছি; বস্তুত আমরা লক্ষ করেছি, মঙ্গলময় পিতা সেই বাণী-লোগোস দ্বারা সবকিছু সুবিন্যস্ত করে থাকেন ও সেই সবকিছু তাঁর দ্বারা গতি ও তাঁর মধ্যে জীবন প্রাপ্ত হয় [খ]। তাই এখন, হে সুখী ও প্রকৃত খ্রিষ্টপ্রেমিক, এসো, আমাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ও সেই সমস্ত বিষয়ও উপস্থাপন করি যা ঐশবাণীর মানবস্বরূপ ও আমাদের কাছে তাঁর ঐশ্বরিক আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; তা এমন বিষয় যা ইহুদীরা নিন্দা করে ও গ্রীকেরা বিদ্রূপ করে কিন্তু আমরা উপাসনা করি; যাতে করে যা দেখতে অবমাননা মনে হয়, বাণীর সেই অবমাননা থেকে তুমি তাঁর প্রতি আরও মহত্তর ও দৃঢ়তর ভক্তি অর্জন করতে পার। [২] কেননা সেই বাণীকে অবিশ্বাসীদের মধ্যে যতখানি বিদ্রূপের বস্তু করা হয়, এর চেয়ে তিনি নিজের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে তত বেশি সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন, কেননা মানুষ যা অসাধ্য বলে ধারণ করতে অক্ষম, তা তিনি সাধ্য বলে দেখান [গ], ও মানুষ যা অশালীন বলে বিদ্রূপ করে, তা তিনি নিজের মঙ্গলময়তায় শালীনতায় ভূষিত করেন; এবং মানুষ নিজের প্রজ্ঞায় গর্বস্ফীত হয়ে যা নিতান্ত মানবীয় বলে অবজ্ঞা করে, তিনি নিজের পরাক্রমে তা ঐশ্বরিক বলে দেখান; এভাবে, যা দেখতে তাঁর অবমাননা, তা দ্বারা তথা ক্রুশ দ্বারাই তিনি প্রতিমার বিভ্রম উল্টিয়ে দেন, ও যারা অবজ্ঞা করে ও বিশ্বাস করে না, তাদের মন তিনি নিজের ঈশ্বরত্ব ও পরাক্রম মেনে নিতে অদৃশ্যভাবে জয় করেন। [৩] কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করার জন্য, আগে যা বলা হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে তুমি তেমন উচ্চ ও মহান পিতার বাণীর দৈহিক আবির্ভাবের কারণ জানতে সক্ষম হয়ে ওঠ, ও একইসময় তুমি যেন এমনটা না ভাব যে ত্রাণকর্তা নিজের স্বরূপের ফলস্বরূপেই একটা দেহ ধারণ করলেন, বরং স্বরূপে অশরীরী হয়ে ও আদি থেকে বাণী হয়ে তিনি তা সত্ত্বেও নিজের পিতার মানবপ্রেম ও মঙ্গলময়তা গুণেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানব দেহে আমাদের কাছে আবির্ভাব করলেন। [৪] কিন্তু এবিষয় ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হতে হতে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রথমে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে ও নির্মাতা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলা দরকার, যাতে করে উপযুক্তভাবে একথা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, সৃষ্টি-নবায়ন হলো সেই একই বাণীর কর্ম যিনি আদিতে তা নির্মাণ করেছিলেন। কেননা পিতা যাঁর

দ্বারা বিশ্ব গড়েছিলেন, তিনি যে তাঁরই দ্বারা বিশ্বের পরিত্রাণও সাধন করলেন, তা আদৌ পরস্পরবিরোধী বিষয় বলে মনে হবে না [ঘ]।

২। জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে নানা ভুল ধারণা

[১] জগৎনির্মাণ ও বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সমর্থন করে এসেছে, ও প্রতিটি মানুষ যে যার পছন্দমত নিজ নিজ ধারণা পোষণ করেছে। কেউ না কেউ নাকি বলে, সমস্ত কিছু আপনা আপনি ও এমনিই হয়েছে, ঠিক সেই এপিকুরোস-পন্থীদের মত যারা নিজেদের অবজ্ঞার জোরে আমাদের বলে যে, [ঈশ্বরের] সার্বিক পূর্বজ্ঞান বলতে কিছু নেই যদিও তাদের এ ধারণা অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট ঘটনাবলির বিপরীত। [২] কেননা তারা যেমনটা বলে সেই অনুসারেই যদি বিশ্ব [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান ছাড়া এমনিই হয়েছে, তাহলে এমনটা দাঁড়াত যে, সবকিছু সদৃশ, সমান ও অভিন্ন হতে হত। হ্যাঁ, এমনটা দাঁড়াত যে, সবকিছু একক পিন্ডেই যেন সূর্য ও চন্দ্র হতে হত, ও মানুষদের মধ্যে সমস্তই হতে হত একটা হাত বা একটা চোখ বা একটা পা। কিন্তু এমনটা আদৌ হচ্ছে না; আর প্রকৃতপক্ষে আমরা এখানে সূর্য, ওখানে চন্দ্র বা পৃথিবী দেখতে পাই; আরও, মানবদেহ ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা পা, ওখানে একটা হাত বা মাথা দেখতে পাই। তবে তেমন সুব্যবস্থা দেখায়, সেই সবকিছু আপনা আপনি হয়নি, বরং এমনটা নির্দেশ করে যে, সেইসব কিছুর আগে একটা কারণ উপস্থিত ছিল, কারণটা এমন যা থেকে সেই ঈশ্বরকে জানা যেতে পারে যিনি সেই সবকিছুর নিয়ন্তা ও নির্মাতা।

[৩] কিন্তু অন্য কেউ, যাদের মধ্যে গ্রীকদের কাছে সেই মহান প্লেটোও রয়েছেন, এই দাবি রাখে যে, ঈশ্বর জগৎকে পূর্বাস্তিত্ববিশিষ্ট ও অসৃষ্ট জড়পদার্থ থেকে নির্মাণ করলেন, কেননা জড়পদার্থগত কিছু না থাকলে ঈশ্বর কিছুই নির্মাণ করতে পারতেন না, ঠিক সেইভাবে যেভাবে কাজ করতে সক্ষম হবার জন্য ছুতোরের পক্ষে আগে কাঠ থাকা দরকার। [৪] কিন্তু তারা এ উপলব্ধি করে না যে, তেমন কথা বলায় তারা ঈশ্বরকে দুর্বল বলে অভিযুক্ত করছে। কেননা তিনি যদি জড়পদার্থের কারণ না হন কিন্তু পূর্বাস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ থেকেই কোন কিছু এমনিই নির্মাণ করেন, তাহলে তিনি নিজেকে দুর্বল দেখান, কেননা সেই পদার্থ ছাড়া তিনি কোন কিছু নির্মাণ করতে অক্ষম; ঠিক সেইভাবে যেভাবে সেটাই হলো ছুতোরের অক্ষমতা যে, সে কাঠ ছাড়া প্রয়োজনীয় কোন

কিছুই তৈরি করতে অক্ষম। কেননা বর্তমান বিতর্কিত বিষয় অনুসারে জড়পদার্থ যদি না থাকত তাহলে ঈশ্বর কিছুই নির্মাণ করতে পারতেন না। কিন্তু যদি ঈশ্বরের সৃষ্টিক্ষমতা অন্য কিছু থেকে তথা জড়পদার্থ থেকে আসত তাহলে কেমন করে তাঁকে নির্মাতা ও স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হত? এবং ব্যাপারটা তেমনটা হলে তাহলে তাদের অভিমত অনুসারে ঈশ্বর যদি অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ নিয়ে কাজ করেন কিন্তু তিনি নিজেই সেই পদার্থের কারণ না হন, তাহলে শূন্য থেকে স্রষ্টা না হয়ে তিনি বরং হতেন কেবল একজন কারিগর মাত্র। কেননা সৃষ্টবস্তু যে পদার্থ থেকে অস্তিত্ব পেয়েছে, তিনি সেই পদার্থের স্রষ্টা না হলে তাহলে কোন মতেই তাঁকে স্রষ্টা বলে অভিহিত করা যেতে পারত না।

[৫] আরও, ভ্রান্তমতপন্থীদের মধ্যে অন্য কেউ আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের পিতাকে বাদে নিজেদের জন্য বিশ্বের অন্য এক নির্মাতাকে কল্পনা করে, একারণে যে, তারা যা বলে থাকে সেবিষয়ে একেবারে অন্ধ। [৬] বাস্তবিকই প্রভু ইহুদীদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *আপনারা কি একথা পড়েননি যে, যিনি আদিতে তাদের সৃষ্টি করলেন তিনি পুরুষ ও নারী করে তাদের গড়লেন?* এবং বলে চলেছিলেন, *এই কারণে মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।' পরে, স্রষ্টা বিষয়ে তিনি বলে চলেছিলেন, 'অতএব ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে* [ক]। তবে এই লোকেরা কেমন করে বলতে পারে, সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র? কিন্তু, নিজের বচনে যিনি কোন ব্যতিক্রম রাখেন না, সেই যোহন অনুসারে যখন *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল ও কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* [খ], তখন নির্মাতা কেমন করে এমন অন্য একজন হতে পারেন যিনি খ্রিষ্টের পিতা থেকে ভিন্ন?

৩। ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তি করে তোলেন

[১] এসমস্ত কিছু হলো তাদের ধারণা। কিন্তু ঐশ্বরিক শিক্ষা ও খ্রিষ্ট বিষয়ক বিশ্বাস তাদের নির্বোধ ভাষাকে ঈশ্বরনিন্দা বলে চিহ্নিত করে। কেননা সেই বিশ্বাস এশিক্ষা দেয় যে, [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান-বিহীন কিছু না থাকায় জগৎও আপনা আপনি হয়নি; অস্তিত্ববিশিষ্ট পদার্থ থেকেও জগৎ হয়নি, কেননা ঈশ্বর দুর্বল নন; বরং আগে যার কোন অস্তিত্ব ছিল না, ঈশ্বর বাণী-লোগোস দ্বারা সেই বিশ্বকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন,

যেইভাবে তিনি মোশির মধ্য দিয়ে বলেন, *আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন* (ক), এবং পালকের (খ) অধিক উপযোগী সেই পুস্তকে তিনি বলেন, ‘সর্বপ্রথমে তুমি বিশ্বাস কর যে, যিনি সমস্ত কিছুর নির্মাতা ও নিয়ন্তা, যিনি অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে সমস্ত কিছু গড়লেন, সেই ঈশ্বর এক’ (গ)। [২] একই কথা পলও তখনই ইঙ্গিত করেন যখন বলেন, *বিশ্বাসে আমরা বুঝতে পারি যে, যুগগুলো ঈশ্বরের এক বচন দ্বারা রচিত হয়েছে, সুতরাং অদৃশ্য বস্তু থেকেই দৃশ্য বস্তু উদ্গত হয়েছে* (ঘ)। [৩] কেননা ঈশ্বর মঙ্গলময়, এমনকি তিনি মঙ্গলের উৎস, এবং মঙ্গলময় যিনি তিনি কোন কিছুর প্রতি ঈর্ষা বোধ করেন না; অতএব কারও প্রতি ঈর্ষা বোধ করেন না বিধায় তিনি আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা তথা নিজের বাণী-লোগোস দ্বারা শূন্য থেকে সবকিছু গড়লেন। এবং এসমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার মধ্য থেকে তিনি মানবজাতির প্রতিই বিশেষ দয়া বোধ করেছিলেন, এবং এমনটা দে’খে যে, নিজের উদ্ভবের অবস্থার গুণে সেই মানবজাতি অনন্তকালস্থায়ী থাকতে অক্ষম ছিল, সেজন্য তিনি অতিরিক্ত একটা অনুগ্রহ তাকে প্রদান করলেন; তাই তিনি যেভাবে পৃথিবীতে যুক্তিক্ষমতাহীন সৃষ্টবস্তুর বেলায় করেছিলেন, তিনি মানবজাতিকে সেইভাবে এমনিই সৃষ্টি না করে বরং তাঁর নিজের বাণীর পরাক্রমের একটা অংশও দান করে তাদের নিজের প্রতিমূর্তি অনুসারে গড়লেন, যাতে করে মানবজাতি কেমন যেন বাণীর ছায়ার অধিকারী হয়ে ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে উঠে সুখে থাকতে সক্ষম হতে পারে ও পরমদেশে সেই সত্যকার জীবন যাপন করতে পারে যা প্রকৃতপক্ষে পবিত্রজনদের অধিকার। [৪] তাছাড়া, একথাও জেনে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা দুই দিকে ফিরতে পারে তিনি যে অনুগ্রহ তাদের দান করেছিলেন, তা তিনি একটা বিধান দ্বারা ও নির্দিষ্ট একটা স্থান দ্বারা স্থির করলেন। বাস্তবিকই তিনি তাদের নিজের পরমদেশে আনলেন ও তাদের একটা বিধান দিলেন যাতে করে তারা সেই অনুগ্রহ রক্ষা করলে ও সৎ হয়ে থাকলে তবে স্বর্গে অক্ষয়শীলতার প্রতিশ্রুতির অধিকারী হওয়া বাদে দুঃখ, কষ্ট বা চিন্তা ছাড়াও পরমদেশের জীবন ভোগ করতে পারত। কিন্তু তারা অপরাধ করে ও [সেই বিধান থেকে] দূরে সরে গিয়ে যদি অসৎ হত, তাহলে তারা জানতে পারত, তারা মৃত্যুর ফল সেই অবক্ষয়ে পতিত হবে যা প্রকৃতিগত দিক দিয়ে তাদের: হ্যাঁ, তারা পরমদেশে আর জীবনযাপন

করবে না বরং ভাবীকাল ধরে পরমদেশের বাইরে মৃত্যুভোগ করে মৃত্যুতে ও অবক্ষয়ে থেকে যাবে। [৫] স্বয়ং ঈশ্বরের হয়ে পবিত্র শাস্ত্রও এবিষয়ে সতর্ক বাণী দেয়, *তুমি পরমদেশের সমস্ত গাছের ফল খুশি-স্বচ্ছন্দেই খাও; কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাবে না। যেদিন সেই ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে* [ঙ]। এবং এই 'তুমি মরবেই মরবে' বচনের অর্থ এছাড়া কীবা হতে পারে যে, তুমি এমনিই মরবে না বরং মৃত্যুর অবক্ষয়েই চিরকাল ধরে থেকে যাবে।

৪। অপরাধের ফলে মানুষ জীবন হারিয়ে ফেলল

[১] এমনটা হতে পারে, তুমি ভাবছ কেনই বা বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ সম্পর্কে কথা বলব বলে স্থির করার পর আমরা এখন মানবজাতির উদ্ভবের বিষয়ে কথা বলছি। তথাপি এবিষয়টাও প্রকৃতপক্ষে আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। [২] কেননা আমাদের মাঝে ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই মানবজাতির উদ্ভবের কথাও বলা দরকার যাতে তুমি জানতে পার যে, তাঁর নেমে আসার কারণ ছিল আমাদেরই খাতিরে, এবং আমাদের নিজেদের অপরাধই বাণীর দয়াকে ডেকে আনল যার ফলে প্রভু আমাদেরও মধ্যে এলেন ও মানুষদের মাঝে আবির্ভূত হলেন। [৩] কেননা আমরাই ছিলাম তাঁর মানবস্বরূপ ধারণের কারণ, ও আমাদের পরিত্রাণের খাতিরেই তিনি এমন ভালবাসার সঙ্গে ব্যবহার করলেন যে, তিনি আবির্ভূত হলেন, এমনকি মানব দেহে জন্ম নিলেন। [৪] তাই ঈশ্বর মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন ও ইচ্ছা করেছিলেন যাতে মানুষ অক্ষয়শীলতায় অবস্থান করে; কিন্তু যখন মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান অবজ্ঞা ও পরিত্যাগ করল ও নিজের জন্য শঠতা কল্পনা করল ও উদ্ভাবনও করল (সেইভাবে যেভাবে আমরা আগেকার লেখায় বলেছি), তখন মানুষ সেই মৃত্যুদণ্ড পেল যা বিষয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, এবং মানুষকে যেভাবে গড়া হয়েছিল সে সেইভাবে আর রইল না, বরং নিজেদের মতলব অনুযায়ী বিকৃত হল। এবং মৃত্যু তাদের উপর কর্তৃত্ব করল ও রাজত্ব করল [ক]। কেননা আজ্ঞা-লঙ্ঘনটা তাদের প্রাকৃতিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনল যার ফলে তারা যেমন শূন্য থেকে হয়েছিল তেমনি কালক্রমে তাদের নিজেদের শূন্যতা অনুযায়ী অবক্ষয়ও তাদের ভোগ করতে হবে। [৫] কেননা যখন অস্তিত্বহীন সেই আগেকার অবস্থা থেকে মানুষ বাণীর আগমন ও কৃপা দ্বারা অস্তিত্বে

আহূত হয়েছিল, তখন এমনটা দাঁড়াল যে, যেহেতু মানুষ ঈশ্বরজ্ঞান-বঞ্চিত ছিল ও অস্তিত্বহীন বস্তুর দিকে ফিরেছিল (কেননা যার অস্তিত্ব নেই তা অমঙ্গল, কিন্তু যা অস্তিত্বমণ্ডিত তা অস্তিত্বমণ্ডিত ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় মঙ্গল) সেজন্য মানুষ অনন্তকালীন অস্তিত্ব থেকেও বঞ্চিত ছিল। এর অর্থ হলো এ যে, মরার সময়ে মানুষ মৃত্যু ও অবক্ষয়ে থেকে যাবে। [৬] কেননা মানুষ প্রকৃতিগত ভাবেই মরণশীল যেহেতু শূন্য থেকে নির্মিত; কিন্তু যিনি আছেন তাঁরই সাদৃশ্যের কারণে মানুষ যদি তেমন সাদৃশ্য ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা রক্ষা করে থাকত তাহলে সে নিজের প্রাকৃতিক ক্ষয়শীলতা ভোঁতা করত যেইভাবে প্রজ্ঞা বলে, *বিধিনিয়মের প্রতি সম্মানেই অক্ষয়শীলতার নিশ্চিত অঙ্গীকার* (খ)। কিন্তু অক্ষয়শীল হওয়ার ফলে মানুষ অবশ্যই ঈশ্বরের মত জীবনযাপন করত, আমার মতে এ এমন কিছু যা বিষয়ে ঐশশাস্ত্র ইঙ্গিত করে যখন বলে, *আমি বলেছি, "তোমরা ঈশ্বর ও সবাই পরাৎপরের সন্তান।" কিন্তু মানুষের মত তোমাদের মৃত্যু হয় ও অন্য যে কোন নেতার মত তোমাদের পতন হয়* (গ)।

৫। ঈশ্বর মানুষকে ঐশ্বরিক জীবন দান করেছেন

[১] বাস্তবিকই ঈশ্বর যে আমাদের শূন্য থেকে নির্মাণ করলেন তা শুধু নয়, বরং বাণীর অনুগ্রহ দ্বারা তিনি আমাদের এমনটাও মঞ্জুর করলেন আমরা যেন ঐশ্বরিক জীবন যাপন করি। কিন্তু অনন্তকালীন বিষয় থেকে দূরে সরে গিয়ে ও দিয়াবলের প্ররোচনায় ক্ষয়শীল বিষয়ের দিকে ফিরে মানুষ নিজেই মৃত্যুতে নিজের অবক্ষয়ের কারণ হল। আমি যেমন উপরেও বলেছি মানুষ প্রকৃতিগত ভাবে ক্ষয়শীল, কিন্তু বাণীর অংশভাগিতার অনুগ্রহ গুণে তারা নিজেদের প্রকৃতির ফলাফল থেকে রেহাই পেতে পারত যদি সৎ হয়ে থাকত। [২] কেননা তাদের মাঝে বিরাজমান সেই বাণী গুণে প্রকৃতিগত ক্ষয়শীলতাও তাদের স্পর্শ করতে পারত না, যেইভাবে প্রজ্ঞা পুস্তক বলে, *ঈশ্বর মানুষকে অক্ষয়শীলতার উদ্দেশেই সৃষ্টি করেছেন, তাকে তাঁর আপন অনন্ততার প্রতিমূর্তিই করে গড়েছেন; কিন্তু দিয়াবলের হিংসার ফলে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে* (ক)। আর যখন তেমনটা ঘটল, তখন মানুষ মরতে লাগল ও সেইসঙ্গে অবক্ষয় মানুষের উপরে প্রবল চাপ দিতে লাগল, এমনকি গোটা মানবজাতির উপরে প্রকৃতির প্রভাবের চেয়ে সেই অবক্ষয় অধিক প্রতাপ বিস্তার করল যেহেতু আজ্ঞা লঙ্ঘনের ফলে ঈশ্বর যে হুমকি

দিয়েছিলেন, অবক্ষয় মানুষের বিরুদ্ধে সেই হুমকিও প্রয়োগ করছিল। [৩] আসলে মানুষ নিজের অপকর্ম সাধনে নির্দিষ্ট সীমায় থামেনি বরং ক্রমে ক্রমে আরও এগিয়ে যেতে যেতে মাত্রাছাড়াই অগ্রসর হয়েছিল। শুরুতে মানুষ শঠতা উদ্ভাবন করায় নিজের উপরে মৃত্যু ও অবক্ষয় ডেকে এনেছিল; আর শেষে সে অন্যায়ের দিকে ফিরে সমস্ত শঠতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল; এমনকি একটামাত্র অপকর্মে না থেমে বরং নতুন নতুন কিছু উদ্ভাবন করে মানুষ পাপকর্মে তৃপ্তিহীন হল। [৪] কেননা ব্যভিচার ও চুরি সর্বত্রই সাধিত ছিল ও গোটা পৃথিবী খুন ও লুঠতরাজে পূর্ণ ছিল। বিধান নয়, দুর্নীতি ও অন্যায়ই ছিল সবার চিন্তা, এবং ব্যক্তিগত ভাবে হোক কি সমষ্টিগত ভাবে হোক যত শঠতা সবার দ্বারা সাধিত ছিল। শহরগুলো শহরগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত ও জাতি জাতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত; সমস্ত পৃথিবী বিপ্লবে ও সংগ্রামে দীর্ণ-বিদীর্ণ ছিল; প্রত্যেকে অন্যায়-অনাচারে প্রতিযোগিতা করত (খ)। [৫] প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অপকর্মও তাদের কাছ থেকে তত দূরে ছিল না, কিন্তু খ্রিস্টের সাক্ষ্যদাতা সেই প্রেরিতদূত যেমন বলেন, *তাদের স্ত্রীলোকেরা প্রাকৃতিক যৌন সম্পর্ককে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সম্পর্কের সঙ্গে বিনিময় করেছে; তেমনিভাবে পুরুষেরাও প্রাকৃতিক নারী-সম্পর্ক ত্যাগ করে একে অন্যের কামনায় জ্বলে পুড়েছে—পুরুষে পুরুষে তারা কুৎসিত কর্ম সাধন করেছে, ফলে নিজেরাই নিজেদের ভ্রান্তির যোগ্য প্রতিফল পেয়েছে* (গ)।

৬। মানবজাতির তেমন শোচনীয় পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের সঙ্কল্প

[১] এসমস্ত কারণের ফলে মৃত্যু মানুষের উপর অধিক প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল ও দুর্নীতি মানুষের উপর স্থিতমূল হয়ে থাকছিল বিধায় মানবজাতি ধ্বংসের পথে চলছিল, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল ও ঈশ্বরের হাতের কাজ বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল। [২] কেননা, আমি যেমন উপরে বলেছি, সেসময় থেকে মৃত্যু বিধানের জোরেই (ক) আমাদের উপর প্রভাবশালী ছিল, ও সেই বিধান এড়ানো অসম্ভব ছিল যেহেতু সেই বিধান মানুষের অপরাধের কারণে স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা জারীকৃত হয়েছিল, ও এসব কিছুর ফল সত্যিই ছিল একাধারে অদ্ভুত ও অনুপযুক্ত। [৩] বাস্তবিকই এটাই অদ্ভুত ছিল যে, কথা বলার পর ঈশ্বর মিথ্যা বলবেন, এভিত্তিতে যে, তিনি নিজে এমন বিধান স্থির করেছিলেন যা অনুসারে আজ্ঞা লঙ্ঘন করলে মানুষ

মরবেই মরবে, অথচ আজ্ঞা লঙ্ঘন করার পর মানুষ আদৌ মরবে না, কিন্তু ঈশ্বরের সেই কথা ব্যর্থ হবে। কেননা আমাদের যে মরতে হবে তিনি একথা বলার পর যদি মানুষ না মরত তাহলে ঈশ্বর সত্যবাদী হতেন না। [৪] আরও, এটাই অনুপযুক্ত হত যে, যে সৃষ্টজীবকে একসময় যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন বলে গড়া হয়েছিল ও বাণীর অংশভাগী হয়েছিল, সে ধ্বংস হবে ও অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে পুনরায় অস্তিত্বহীনতার দিকে ফিরে যাবে। [৫] কেননা এটাই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার যোগ্য ছিল না যে, তিনি যা কিছু গড়েছিলেন, দিয়াবলের দ্বারা মানুষের উপরে সাধিত প্রবঞ্চনা কারণে সেই সমস্ত কিছু ভ্রষ্ট হবে। [৬] এমনকি এটাই বিশেষভাবে একেবারে অনুপযুক্ত ছিল যে, মানবজাতিতে সাধিত ঈশ্বরের হাতের কাজ তা মানুষের নিজের অবহেলার কারণে হোক বা অপদূতদের প্রবঞ্চনা কারণে হোক বিলীন হবে।

[৭] অতএব, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীব ভ্রষ্ট হতে হতে ও তেমন কর্মের ধ্বংস হতে হতে ঈশ্বরের পক্ষে তাঁর আপন মঙ্গলময়তায় কি করা উচিত ছিল? তিনি কি এমনটা হতে দেবেন যে অবক্ষয় মানুষের উপরে নিজের প্রভাব চালিয়ে যাবে ও মৃত্যু মানুষকে ধরে রাখবে? অবস্থা তেমনটা হলে তবে সেই আদিতে মানবসৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? কেননা সৃষ্ট হওয়ার পর মানুষ অবহেলা ও ধ্বংসের বস্তু হওয়ার চেয়ে এটাই বরং আরও উপযুক্ত ছিল যে, মানুষ আদৌ সৃষ্ট হবে না। [৮] কেননা আপন কর্ম সম্পাদন করার পর তিনি যদি এমনটা দেন তাঁর সেই কর্মের ধ্বংস হবে, তাহলে তেমন অবহেলা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার চেয়ে তাঁর দুর্বলাতাই প্রকাশ করে; এর চেয়ে বরং আদিতে মানুষকে আদৌ না গড়া-ই ভাল হত; [৯] কেননা তিনি যদি মানুষকে আদৌ না গড়তেন, তাহলে তাঁর উপর দুর্বলতা চাপিয়ে দেবার মত কেউই থাকত না। কিন্তু তিনি মানুষকে একবার গড়ার পর এমনকি শূন্য থেকেই মানুষকে সৃষ্টি করার পর এটাই একেবারে অদ্ভুত হত যদি তাঁর সেই কর্ম ধ্বংস হত, বিশেষভাবে নির্মাতার নিজের চোখের সামনেই যদি সেই কর্ম ধ্বংস হত। [১০] এজন্য এটাই ন্যায্য ছিল যে, তিনি মানুষকে অবক্ষয় দ্বারা ধ্বংস হতে দেবেন না, কেননা তেমন ধ্বংসন ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার পক্ষে অনুপযুক্ত ও অযোগ্য আচরণ হত।

৭। স্রষ্টা ছাড়া অন্য কেউই মানুষকে পুনরুদ্ধার করতে পারত না

[১] কিন্তু যদি একদিকে এসমস্ত কিছু অনিবার্য, অন্যদিকে এর বিপরীতে তা-ই রয়েছে যা ঈশ্বরের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ছিল যাতে মৃত্যু সংক্রান্ত সেই বিধান সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তিনি ন্যায়বান বলে প্রতিপন্ন হতেন। কেননা আমাদের সুবিধার ও রক্ষার লক্ষ্যে সত্যের পিতা সেই ঈশ্বরের পক্ষে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হওয়া অদ্ভুত হত। [২] তাই এব্যাপারে কীবা হওয়ার ছিল বা ঈশ্বরের পক্ষে কীবা করার ছিল? তিনি কি বিধান-লঙ্ঘনের জন্য মানুষের কাছে মনপরিবর্তন দাবি করবেন? এক্ষেত্রে একজন বলতে পারত, হ্যাঁ, তেমনটা করা ঈশ্বরের পক্ষে উপযুক্ত, যাতে করে যারা বিধান-লঙ্ঘন দ্বারা অবক্ষয়ে বশীভূত হয়েছিল তারা যেন মনপরিবর্তন দ্বারা অক্ষয়শীলতায় ফিরে আসতে পারত। [৩] কিন্তু মনপরিবর্তন ঈশ্বরের মর্যাদা রক্ষা করত না, কেননা যদি মানুষ মৃত্যুর প্রভাবে না থাকত তাহলে ঈশ্বর তখনও অসত্যবাদী হয়ে থাকতেন। কেননা মনপরিবর্তন প্রকৃতির ফলাফল ক্ষেত্রে রেহাই দেয় না যেহেতু মনপরিবর্তন শুধু পাপকর্ম বাতিল করে দেয়। [৪] সুতরাং, যদি কেবল পাপকর্মই থাকত কিন্তু অপরাধ-লঙ্ঘন জনিত অবক্ষয়ের ফলাফল না থাকত, তাহলে মনপরিবর্তন যথেষ্ট উপযুক্ত উপায় হত। কিন্তু যেহেতু অপরাধ-লঙ্ঘন মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেজন্য যখন মানুষ আপতত প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের বন্দি ছিল ও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হওয়ার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, তখন আর কোন্ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল? অথবা তেমন অনুগ্রহ ও তেমন প্রত্যাহারের জন্য কীবা প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের সেই বাণী ছাড়া যিনি সেই আদিতেও বিশ্বকে শূন্য থেকে গড়েছিলেন? [৫] কেননা এটা তাঁরই কর্ম ছিল তথা যা ক্ষয়শীল ছিল তা অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে আনা ও পিতার দাবির পক্ষে যা বিশেষভাবে উপযুক্ত ছিল তাও রক্ষা করা। কেননা পিতার বাণী হওয়ায় ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে হওয়ায় কেবল তিনিই বিশ্বকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন ও সেইসঙ্গে সকলের হয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে ও পিতার কাছে সকলের জন্য প্রতিনিধি হতে যোগ্য ছিলেন।

৮। বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ

[১] আর এই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের সেই অশরীরী, অক্ষয়শীল, অজড় বাণী আমাদের বাসস্থানে এলেন—তিনি যে আগে দূরে ছিলেন তেমন নয় (ক), কেননা সৃষ্টির কোন

স্থানই বাণী-বঞ্চিত নয়, বরং নিজের পিতার সঙ্গে তাঁর ঐক্য গুণে তাঁর বিদ্যমানতায় সবকিছু পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের প্রতি তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে তিনি আমাদের কাছে আসতে ও নিজেকে প্রকাশ করতে সম্মত হলেন। [২] কেননা তিনি দেখলেন, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সৃষ্টজীবদের জাতি ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল, অবক্ষয়ের মাধ্যমে মৃত্যু তাদের উপর রাজত্ব করছিল; এও দেখলেন, অপরাধ-লঙ্ঘনের সেই হুমকি আমাদের উপরে অবক্ষয় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছিল; দেখলেন যে, পূর্ণ হবার আগে ঐশবিধান বিলীন হওয়া যুক্তিহীন হবে। এও দেখলেন, যা ঘটেছিল তা কতই না অনুচিত ছিল, তথা, সেই সবকিছু তিনি নিজেই যার স্রষ্টা, তা বিলুপ্ত হবে; তিনি মানুষের মাত্রাছাড়া শঠতাও দেখলেন, এও দেখলেন, মানুষ আস্তে আস্তে নিজেরই বিরুদ্ধে সেই শঠতা এমন পর্যায়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তা অসহ্য হয়ে যাচ্ছিল; অবশেষে তিনি মৃত্যুর প্রতি সকল মানুষের বাধ্যবাধকতা দেখলেন। সেজন্য তিনি আমাদের এ মানবজাতির প্রতি দয়া করলেন, আমাদের দুর্বলতার প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন, আমাদের ক্ষয়শীলতায় নিজেকে বশীভূত করলেন ও আমাদের উপর মৃত্যুর সেই কর্তৃত্ব সহ্য করলেন না। এবং পাছে সৃষ্টজীব বিলুপ্ত হয় ও মানুষের মাঝে পিতার কাজ বৃথা হয়ে যায়, সেজন্য তিনি একটি দেহ ধারণ করলেন, এমন দেহ যা আমাদের দেহের চেয়ে ভিন্ন নয়, [৩] কেননা তিনি যে এমনি একটি দেহে থাকবেন তা তিনি চাইলেন না, কেবল আত্মপ্রকাশই করবেন তাও তিনি চাইলেন না, কেননা কেবল আত্মপ্রকাশ করতে চাইলে তবে তিনি অধিক উন্নত ধরনের উপায় অবলম্বন করেই নিজের ঐশ্বরিক আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারতেন। তিনি বরং আমাদেরই দেহ ধারণ করলেন, আর শুধু তা নয়; তিনি অক্ষুণ্ণ, নিষ্কলঙ্ক ও পুরুষ-অজানা একটি কুমারী থেকে এমন দেহ ধারণ করলেন যা নির্মল ও মানবীয় সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। কেননা শক্তিমান ও বিশ্বস্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি একটি কুমারীতে নিজের জন্য মন্দিররূপে একটি দেহ নির্মাণ করলেন, আর তা এমন একটা মাধ্যম হিসাবেই আপন করে নিলেন যেখানে তিনি নিজেকে জ্ঞাত করবেন ও বসবাস করবেন। [৪] সেজন্য আমাদেরই দেহের সদৃশ প্রকৃতির একটা দেহ ধারণ ক'রে, যেহেতু সকলে মৃত্যুর অবক্ষয়ের অধীন ছিল, সকলেরই খাতিরে তিনি সেই দেহটিকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে পিতার কাছে তা নিবেদন করলেন। আর তা তিনি নিজের

কৃপার খাতিরেই করলেন যাতে সকলেই যেমন তাঁর মধ্যে মৃত্যুভোগ করে (খ), তেমনি মানুষের মধ্যে অবক্ষয়-সংক্রান্ত বিধান বাতিল করা যেতে পারে—কারণ সেই বিধানের প্রভাব প্রভুর দেহে নিঃশেষিত হয়েছিল, আর যারা তাঁর সদৃশ, বিধান তাদের আর কখনও প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। আর যাতে অবক্ষয়ে সরিয়ে পড়া মানুষকে তিনি আবার অক্ষয়শীলতায় ফিরিয়ে এনে মৃত্যুর বদলে জীবন দান করতে পারেন, সেজন্য তিনি সেই দেহকে নিজেরই দেহ করেছিলেন, এবং পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে মৃত্যু থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন যেইভাবে খড় আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়।

৯। বাণী মানুষকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন

[১] কেননা যেহেতু বাণী উপলব্ধি করলেন, মানুষের অবক্ষয় বিলুপ্ত করার জন্য সকলের মৃত্যু ছাড়া অন্য উপায় ছিল না,—কিন্তু, যেহেতু অমর ও পিতার পুত্র বলে তিনি মৃত্যুভোগ করতে সক্ষম ছিলেন না,—সেজন্য এমন দেহ ধারণ করলেন যার মৃত্যু হতে পারত, যাতে করে সবকিছুর ঊর্ধ্বকার বাণীর অংশীদার হওয়ায় সেই দেহ সকলের হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট হতে পারত; আর যেহেতু সেই দেহে স্বয়ং বাণী বসবাস করছিলেন, সেজন্য সেই দেহ অক্ষয়শীল হয়ে থাকতে পারে, ফলে পুনরুত্থানের অনুগ্রহ গুণে সকল মানুষ অবক্ষয় থেকে মুক্তি পেতে পারে। অতএব অর্ঘ্য ও সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত বলি রূপে তাঁর সেই আপন-করা-দেহকে মৃত্যুর হাতে নিবেদন ক'রে তিনি মানবদেহের মত দেহকে অর্পণ করায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মধ্য থেকে মৃত্যুকে বাতিল করে দিলেন। [২] কেননা যেহেতু ঈশ্বরের বাণী সবকিছুর ঊর্ধ্বে, সেজন্য তাঁর আপন মন্দির ও দেহগত মাধ্যমকে সকলের পক্ষে বদলিরূপে নিবেদন করায় তিনি আপন মৃত্যুতে সেই ঋণ শোধ করলেন; এবং যেহেতু ঈশ্বরের অক্ষয়শীল পুত্র মানবদেহের মত দেহের মাধ্যমে সকল মানুষের সঙ্গে মিলিত ছিলেন, সেজন্য পুনরুত্থানের প্রতিশ্রুতি গুণে তিনি সকলকে অক্ষয়শীলতা-বসনে পরিবৃত করলেন (ক)। কেননা নিজের একমাত্র দেহের মধ্য দিয়ে যিনি মানুষদের মাঝে বাস করেন, সেই বাণী গুণে মৃত্যুর ফল সেই অবক্ষয় তাদের বিরুদ্ধে আর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। [৩] এবং ঠিক যেমন মহান এক রাজা মহৎ কোন একটা শহরে প্রবেশ করার পর ও সেখানকার একটা ঘর নিজের বাসস্থান করার পর সেই শহর মহৎ মর্যাদার অধিকারী হয় ও কোন শত্রু বা ডাকাত আর

কখনও সেই শহরের বিরুদ্ধে আসে না বরং যে রাজা সেই শহরের একটা ঘর নিজের বাসস্থান করেছেন, সেই রাজার খাতিরে সেই শহরের প্রতি সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তেমনি ঘটে সকলের রাজার বেলায়। [৪] কেননা যেহেতু তিনি আমাদের বাসস্থানে এলেন ও আমাদের দেহের সদৃশ দেহে বসবাস করলেন, সেজন্য মানবজাতির বিরুদ্ধে শত্রুর গোটা ষড়যন্ত্র দমিত, ও মানবজাতির উপরে যা আগে প্রভাব বিস্তার করত, মৃত্যুর সেই অবক্ষয় বিলুপ্ত। কেননা মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেত যদি না সকলের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বরের পুত্র মৃত্যুকে নিঃশেষ করতে না আসতেন।

১০। খ্রিষ্ট নিজের শিক্ষাদানে আমাদের দুর্দশা বাতিল করলেন

সত্যিই এই মহৎ কর্ম ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত ছিল। [১] কেননা যদি কোন রাজা একটা প্রাসাদ বা শহর স্থাপন করে থাকেন ও শহরবাসীদের অবহেলার কারণে ডাকাতেরা তা আক্রমণ করে, সেই রাজা কোন মতেই শহরটাকে ফেলে রেখে চলে না গিয়ে বরং শহরবাসীদের অবহেলার জন্য চিন্তা ক'রে নয়, কিন্তু নিজের সম্মানের খাতিরেই প্রতিশোধ নেন ও শহরটাকে নিজেরই বলে দাবি করেন, তেমনি এর চেয়ে সর্বত মঙ্গলময় পিতার সেই বাণী ঈশ্বর যখন নিজের কর্ম তথা মানবজাতি অবক্ষয়ে নেমে যাচ্ছিল তখন আরও বেশি করেই তাদের একা ফেলে রেখে চলে যাননি, বরং যে মৃত্যু তাদের উপর নেমে পড়েছিল তা তিনি নিজের দেহ নিবেদন করায় সেই মৃত্যুকে নিশ্চিহ্ন করলেন ও নিজের শিক্ষাদানে তাদের সেই অবহেলা সংশোধন করলেন ও নিজের পরাক্রমে সকল মানুষের বাসস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। [২] আর তেমনটা প্রতিপন্ন করা যেতে পারে ত্রাণকর্তার নিজের ঐশতত্ত্ববিদদের দ্বারা যখন একজন তাঁদের সেই লেখায় পড়ে যেখানে তাঁরা বলেন, *কারণ খ্রিষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, একথা ভেবে যে, যখন সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, তখন সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন আমরা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করি, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন* (ক), তিনি আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট। আরও, *কিন্তু যাঁকে অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে, আমরা দেখছি যে, সেই যিশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও মহিমার মুকুটে*

পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সকল মানুষের হয়ে মৃত্যুকে আস্বাদ করেন (খ)। [৩] পরে তিনি সেই কারণেরও দিকে অঙুলি নির্দেশ করেন যার জন্য এটাই প্রয়োজন ছিল যে, অন্য কেউ নয়, ঈশ্বরের স্বয়ং বাণীই মানবস্বরূপ ধারণ করবেন; তাঁর উক্তি এরূপ, *যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন* (গ); এ উক্তি দ্বারা তিনি বলতে চান, যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনা কারও দায়িত্ব ছিল না, সেই ঈশ্বরের বাণীরই দায়িত্ব ছিল যিনি আদি থেকে তাদের নির্মাণও করেছিলেন। [৪] এবং স্বয়ং বাণী যে নিজের দেহের সদৃশ দেহগুলোর জন্য বলি উৎসর্গ করার লক্ষ্যেই দেহও ধারণ করলেন, এবিষয়েরও দিকে অঙুলি নির্দেশ করে তিনি একথা বলেন, *যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন* (ঘ)। [৫] কেননা নিজের দেহ-বলিদান দ্বারা তিনি আমাদের বিরুদ্ধ যে বিধান তা শেষ করে দিলেন ও সেইসঙ্গে পুনরুত্থানের প্রত্যাশা দ্বারা আমাদের জন্য জীবনের নবীন সূচনাও সাধন করলেন। কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু মানুষদের উপর প্রভাব বিস্তার করত, ঠিক এই কারণেই ঈশ্বরের বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ দ্বারা মৃত্যুর বিলুপ্তি ও জীবনের পুনরুত্থান ঘটল। বাস্তবিকই সেই যে মানুষ খ্রিষ্টকে পরিধান করেছিলেন, তিনি এবিষয়ে বলেন, *কেননা যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান—আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিষ্টেও তেমনি সকলকে জীবিত করা হবে* (ঙ), ইত্যাদি। কেননা আমরা এখন যে দণ্ডিত বলেই মৃত্যুবরণ করি এমন নয়, বরং দৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করে তেমন মানুষদেরই মত আমরা সকলের সার্বিক সেই পুনরুত্থানের প্রতীক্ষায় রয়েছি *যার আবির্ভাব নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই ঘটাবেন* (চ) যিনি সেই ঈশ্বর যিনি সেই পুনরুত্থান সৃষ্টি করেছেন ও আমাদের কাছে তা মঞ্জুর করেছেন। [৬] তবে এটাই হলো ত্রাণকর্তার মানবস্বরূপ ধারণের প্রধান কারণ। কিন্তু

পরবর্তী কারণগুলোর মধ্য দিয়েও একজন দেখতে পারবে যে, আমাদের মাঝে তাঁর শুভ আগমন সত্যিই সমীচীন ছিল।

১১। মানবস্বরূপ ধারণের দ্বিতীয় কারণ

[১] সকলের উপরে কর্তৃত্ব রাখেন যিনি, যখন সেই ঈশ্বর তাঁর আপন বাণী দ্বারা মানবজাতিকে গড়েছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন, তাদের প্রকৃতির দুর্বলতা নিজে থেকে নির্মাতাকে জানতে বা ঈশ্বর বিষয়ে কোন ধারণা নিতে সক্ষম ছিল না, কেননা তিনি অসৃষ্টই ছিলেন কিন্তু তাদের শূন্য থেকে নির্মাণ করা হয়েছিল; তিনি অশরীরী ছিলেন, কিন্তু মানুষকে এই নিম্নলোকে একটা দেহ সহ গড়া হয়েছিল; এবং তিনি দেখেছিলেন, সেই সৃষ্টজীবেরা নিজেদের নির্মাতা বিষয়ে একেবারে উপলব্ধি ও জ্ঞান বিহীন ছিল। তাই মঙ্গলময় হওয়ায় তিনি মানবজাতির প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে নিজের বিষয়ে তাদের জ্ঞানহীন অবস্থায় ফেলে রাখেননি পাছে তাদের নিজেদের অস্তিত্বও তাদের পক্ষে অলাভজনক হয়। [২] কেননা তারা নিজেদের নির্মাতাকে না জানলে তাতে যাদের নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের কী লাভ হত? অথবা, তারা যাঁর দ্বারা হয়েছিল, পিতার সেই বাণী সম্পর্কে অসচেতন হলে তারা কেমন করে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন হত? কেননা পার্থিব বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না জানলে তারা যুক্তিক্ষমতাহীন সৃষ্টজীবদের চেয়ে কোন দিকেই ভিন্ন হত না। এবং কেনই বা ঈশ্বর এমন সৃষ্টজীবদের নির্মাণ করেছিলেন যাদের দ্বারা জ্ঞাত হতে ইচ্ছা করতেন না? [৩] তাই পাছে তেমন কিছু ঘটে, সেজন্য, তিনি মঙ্গলময় হওয়ায় তাদের তাঁর নিজের প্রতিমূর্তির তথা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের অংশভাগী হতে মঞ্জুর করলেন ও নিজের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্য অনুসারে তাদের গড়লেন যাতে করে তেমন অনুগ্রহ দ্বারা প্রতিমূর্তিটা তথা পিতার বাণীকেই উপলব্ধি করে তারা তাঁর দ্বারা পিতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হয়, এবং নির্মাতাকে চিনে নিয়ে তারা যেন উত্তম ও সত্যিকার সুখী জীবন যাপন করতে পারে(ক)।

[৪] অথচ মানুষ আগের মত নির্বুদ্ধিতা দেখিয়ে তাদের দেওয়া সেই অনুগ্রহ এমনভাবে অবজ্ঞা করল, ঈশ্বর থেকে এমনভাবে দূরে সরে গেল, ও নিজেদের আত্মা এমনভাবে অন্ধকারময় করল যে ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণাটা হারিয়ে ফেলল শুধু নয়, নিজেদের জন্য অন্যান্যদেরও কল্পনা করতে লাগল। বাস্তবিকই তারা সত্যের বদলে

নিজেদের জন্য প্রতিমা গড়ল ও এমন বস্তুগুলোর প্রতি সম্মান দেখাল যেগুলো আছেন যিনি, সেই ঈশ্বরের তুলনায় শূন্যময়, এবং তারা *নিজেদের সৃষ্টিকর্তার বদলে সৃষ্টবস্তুকেই পূজা করল* [খ]। কিন্তু, এর চেয়ে আরও খারাপ ব্যাপার: তারা কাঠ, পাথর ও যত ধরনের জড়বস্তু ও মানুষের উপর ঈশ্বরকে দেয় সম্মান আরোপ করল; এমনকি তারা এর চেয়ে আরও খারাপ কিছু সাধন করল যেইভাবে আগেকার লেখায় বলেছি [গ]। [৫] আসলে তাদের অভক্তি এতই এগিয়ে গেল যে, তারা নিজেদের বাসনা পূর্ণ করে অপদূতদেরও পূজা করে সেগুলোকে ঈশ্বর বলে ডাকল। কেননা, আমি যেমন ইতিমধ্যে উপরেও বলেছি, তারা নিজেদের পাগলামিতে আরও বেশি করে নিজেদের জড়িয়ে বোধশূন্য পশুদের কাছে বলি উৎসর্গ করল ও সেই পশুদের দেয় হিসাবে মানুষকে জবাই করল। [৬] এই কারণেই তো তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যাও শেখানো হল, নানা স্থানে নানা দৈববাণী মানুষকে পথভ্রষ্ট করল, এবং যা দৃশ্যগত তা ছাড়া অন্য কিছুতেই চিন্তা-ভাবনা না করে নিজেদের জন্ম ও অস্তিত্বের কারণ তারানক্ষত্র ও স্বর্গীয় বস্তুগুলোতে আরোপ করল। [৭] এক কথায়, সবকিছু ছিল অভক্তি ও রিপুতে একেবারে পরিপূর্ণ, কেবল ঈশ্বর ও তাঁর বাণীই অজ্ঞাত ছিলেন যদিও তিনি মানুষের কাছে নিজেকে অদৃশ্যমান করে লুকিয়ে রাখেননি ও নিজের বিষয়ে কেবল এক ভাবেই জ্ঞান অর্পণ করেননি বরং নানাভাবে ও বহুরূপেই তাদের কাছে নিজের বিষয়ে জ্ঞান উন্মুক্ত করেছিলেন।

১২। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিধান ও নবীদের ভূমিকা

[১] প্রকৃতপক্ষে [ঈশ্বরের] প্রতিমূর্তির অংশী হওয়ার অনুগ্রহ বাণী-ঈশ্বরকে ও তাঁর দ্বারা পিতাকে জ্ঞাত করার জন্য যথেষ্টই ছিল [ক]। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর মানুষের দুর্বলতার কথা জানতেন, সেজন্য তিনি আগে থেকে তাদের অবহেলার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে করে যদি মানুষ নিজেদের দ্বারা ঈশ্বরকে চিনে নিতে ব্যর্থ হত, তাহলে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়েই তারা নির্মাতা বিষয়ে অজ্ঞতা এড়াতে পারত। [২] কিন্তু, যেহেতু মানুষের অবহেলা ক্রমে ক্রমে নিম্নতর পর্যায় নেমে যাচ্ছিল, সেজন্য ঈশ্বর পুনরায় তাদের তেমন দুর্বলতার জন্য সুব্যবস্থা করে বিধান ও এমন নবীদের প্রেরণ করলেন যাঁরা মানুষের কাছে জ্ঞাত ছিলেন যাতে করে মানুষ স্বর্গের দিকে চোখ তুলতে ও স্রষ্টাকে জানতে অনিচ্ছুক হলে মানুষ তার কাছের সেই মানুষদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে পারত। কেননা

ঊর্ধ্বতর বিষয় ক্ষেত্রে মানুষ অন্য মানুষ থেকেই আরও প্রত্যক্ষভাবে শিখতে পারে। [৩] এভাবে তারা স্বর্গের উচ্চতার দিকে চোখ উত্তোলন করতে পারত, ও সৃষ্টির সঙ্গতি উপলব্ধি করে সেই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তাকে তথা পিতার সেই বাণীকে জানতে পারত যিনি বিশ্বজগতে নিজের পূর্বজ্ঞান দ্বারা পিতাকে সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত করেন, ও সেই লক্ষ্যেই সবকিছু গতিশীল করেন যাতে করে তাঁর নিজের দ্বারা সকল মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে। [৪] অথবা, মানুষ এতেও অনিচ্ছুক হলে তবে পবিত্রজনদের সঙ্গে (খ) সাক্ষাৎ করতে পারত ও তাঁদের দ্বারা বিশ্বনির্মাতা ঈশ্বরকে তথা খ্রিস্টের পিতাকে জানতে পারত; এও জানতে পারত যে, প্রতিমাপূজা নাস্তিকতার নামান্তর ও সমস্ত অভক্তিতে পূর্ণ। [৫] তাছাড়া, বিধানকে জেনে মানুষ সমস্ত দুষ্টতা প্রত্যাখ্যান করতে ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারত। কেননা সেই বিধান কেবল ইহুদীদের জন্য নয়, নবীরাও কেবল ইহুদীদের মঙ্গলার্থে প্রেরিত হননি যদিও তাঁরা ইহুদীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন ও ইহুদীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন; যাই হোক, সেই নবীরা গোটা জগতের জন্য ঈশ্বরজ্ঞান সম্পর্কে ও মানবাত্মার আচরণ সম্পর্কে পবিত্র শিক্ষালয়ই যেন ছিলেন। [৬] সুতরাং ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও দয়া এত মহৎ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিজের ক্ষণিকের বাসনা ও বিভ্রম দ্বারা ও অপদূতদের প্রবঞ্চনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সত্যের দিকে না তাকিয়ে বরং বহু অপকর্ম ও পাপকর্মে নিজেকে পরিতৃপ্ত করল, ফলে মানুষ আর যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীবের পরিচয় না দিয়ে বরং নিজেদের ব্যবহারের ভিত্তিতে যুক্তিক্ষমতাহীন বলে পরিগণিত হল।

১৩। মানব পরিত্রাণের জন্য মানবদেহে ঐশবাণীর আগমন

[১] যেহেতু মানুষ যুক্তিক্ষমতাহীন হয়েছিল ও অপদূতদের প্রতারণা সর্বস্থান আচ্ছাদিত করছিল ও সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞান গুপ্ত রাখছিল, সেজন্য ঈশ্বরের কিবা করার ছিল? তেমন মহৎ ব্যাপারের সামনে তিনি কি নীরব থাকবেন ও মানুষকে অপদূত দ্বারা প্রতারিত হতে ও ঈশ্বরজ্ঞান বিহীন থাকতে দেবেন? [২] কিন্তু তেমনটা করলে তবে আদি থেকে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নির্মাণ করা কী প্রয়োজন ছিল? তবে মানুষের পক্ষে যুক্তিক্ষমতাশূন্য জীব বলে নির্মিত হওয়াই শ্রেয় হত; অথবা অন্যথা যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীব নির্মিত হয়ে তার পক্ষে যুক্তিক্ষমতাশূন্য জীবদের জীবন যাপন করা-ই উচিত

হত। [৩] কিন্তু আদি থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করা মানুষের পক্ষে কীবা দরকার ছিল? কেননা মানুষ তেমন ধারণা গ্রহণ করতে যোগ্য না হলে, তবে আদি থেকে তাকে সেই ধারণা না দেওয়া-ই উচিত হত। [৪] অথবা, ঈশ্বরের নির্মিত মানুষ যদি তাঁকে সম্মান না করত বরং এমনটা ভাবত যে, অন্য কেউই তাকে নির্মাণ করেছিল, তাহলে মানুষকে যিনি নির্মাণ করেছিলেন, সেই ঈশ্বরের কী লাভ হত বা তাতে তাঁর কী গৌরব হত? কেননা তেমনটা হলে তবে এমনটা ধরে নেওয়া যেতে পারত যে, ঈশ্বর নিজের জন্য নয়, অন্য একজনের জন্যই মানুষকে গড়েছিলেন।

[৫] আরও, মানুষমাত্র হয়েও এক রাজা এমনটা হতে দেন না যে, তিনি নিজে যে রাজ্য স্থাপন করেছেন, তা পরের হাতে যাবে, পরের অধীন হবে, ও নিজের কর্তৃত্ব থেকে চলে যাবে; বরং তিনি পত্র দ্বারা আপন প্রজাদের ব্যাপারটা স্মরণ করান ও সেই পত্র প্রায়ই বন্ধুদের মাধ্যমে প্রজাদের কাছে পাঠান, এবং দরকার হলে নিজের উপস্থিতিতে তাদের মন জয় করার জন্য অবশেষে তিনি নিজে তাদের কাছে যান; তিনি তেমনটা করেন পাছে তার প্রজারা পরের অধীন হয় ও তাঁর নিজের কর্ম ব্যর্থ হয় (ক)। [৬] তবে ঈশ্বর কি তাঁর আপন সৃষ্টজীবদের প্রতি আরও বেশি দয়া বোধ করবেন না পাছে তারা তাঁর কাছ থেকে পথভ্রষ্ট হয় ও তাদেরই সেবা করে যারা শূন্যতা মাত্র? তিনি অবশ্যই সেইভাবে ব্যবহার করবেন, বিশেষভাবে একারণে যে, প্রজাদের তেমন ভুল তাদের নিজেদের সর্বনাশ ও বিলুপ্তির কারণ হবে; এবং যারা একসময় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অংশ ছিল, তাদের পক্ষে ধ্বংসিত হওয়া আদৌ ন্যায্য নয়। [৭] অতএব, ঈশ্বরের কী করার ছিল? অথবা, কীবা করা প্রয়োজন ছিল এছাড়া যে, যা একসময় ছিল তাঁর আপন প্রতিমূর্তি, তা তিনি পুনরায় নবায়িত করবেন যাতে করে তা দ্বারা মানুষ পুনরায় তাঁকে জানতে পারে? কিন্তু তেমনটা কেমন করেই বা হতে পারত যদি না ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমূর্তি যিনি, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট নিজেই না আসতেন? কেননা তেমন কর্ম সাধন করা মানুষদের দ্বারা সম্ভব ছিল না, কেননা তাদের কেবল প্রতিমূর্তি অনুসারেই গড়া হয়েছিল; স্বর্গদূতদের দ্বারাও তেমনটা সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁরাও প্রকৃত প্রতিমূর্তি ছিলেন না। তাই ঈশ্বরের বাণী নিজেই এলেন, যাতে করে তাঁর আপন পিতার প্রতিমূর্তি হওয়ায় তিনি সেই মানুষকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারতেন যে মানুষ তাঁর

আপন প্রতিমূর্তিতে উপস্থিত। [৮] মৃত্যু ও অবক্ষয়ের বিনাশ না হলে কর্মটা অন্যভাবে হতে পারত না। [৯] তাই তাঁর পক্ষে এটা সঙ্গত ছিল যে, তিনি একটা মরণশীল দেহ ধারণ করবেন যাতে করে সেই দেহে মৃত্যু বিনষ্ট হয় ও মানুষ পুনরায় তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে নবায়িত হতে পারে। সুতরাং, তেমন কর্ম সাধনের জন্য পিতার স্বয়ং প্রতিমূর্তি বাদে অন্য কেউই যথেষ্ট হত না (খ)।

১৪। **ঐশবাণী মানুষের পরিত্রাণার্থে মানুষ হলেন**

[১] কেননা যেমন কাঠে আঁকা একটা ছবি ধুলো দ্বারা কলঙ্কিত হলে যে লোকটার ছবি আঁকা তার পক্ষে পুনরায় আসা প্রয়োজন হয় যাতে ছবিটা একই পদার্থে নবীকৃত হয় (কেননা যে পদার্থে তার প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে তা ফেলে দেওয়া হয় না কিন্তু ছবিটা সেই একই কাঠে নতুন করে আঁকা হয়), [২] তেমনি পিতার প্রতিমূর্তি যিনি, পিতার সর্বত পবিত্র সেই পুত্র যে মানুষ তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে গড়া হয়েছিল তাকে নবীকৃত করার জন্য, ও হারানো ব্যক্তিরূপে তাকে পাপক্ষমা দ্বারা সন্ধান করার জন্য আমাদের বাসস্থানে এলেন, সেইভাবে যেভাবে তিনি সুসমাচারে বলেছিলেন, *যা হারানো ছিল, তা ত্রাণ করতে ও তা খুঁজতেই আমি এসেছি* (ক)। সেজন্য তিনি ইহুদীদের এও বলেছিলেন, *মানুষ পুনরায় জন্ম না নিলে* (খ) ইত্যাদি, কিন্তু তারা যা ভাবছিল অর্থাৎ নারী থেকে জন্ম সেই অনুসারে নয়, কিন্তু সেই মানবাত্মারই কথা ইঙ্গিত করছিলেন যা পুনরায় জন্ম নেয় ও প্রতিমূর্তিতে নিজের অস্তিত্বে নবীকৃত হয়। [৩] কিন্তু, যেহেতু প্রতিমাপূজা ও অভক্তি জনিত উন্মাদনা জগতের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করছিল ও ঈশ্বরজ্ঞান গুপ্তই ছিল, সেজন্য পিতা সম্পর্কে জগৎকে শিক্ষাদান করা কার্ দায়িত্ব ছিল? কেউ না কেউ বলতে পারত, তেমন দায়িত্ব একটা মানুষের দায়িত্ব। কিন্তু গোটা পৃথিবী পার হওয়া মানুষের সাধ্যের বাইরে, তাছাড়া নিজের প্রকৃতি অনুসারে তত দূরে দৌড়োতে বা এবিষয়ে বিশ্বাস জাগরিত করতেও মানুষ সক্ষম ছিল না, ও নিজে থেকে অপদূতদের প্রতারণা ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধ করতেও মানুষ সক্ষম ছিল না। [৪] কেননা সবাই নিজ নিজ আত্মায় বিভ্রান্ত হয়েছিল বিধায় ও অপদূতদের প্রতারণা ও প্রতিমার অসারতা দ্বারা হতবুদ্ধি হয়েছিল বিধায় তারা যখন মানুষের আত্মা ও মন দেখতেও সক্ষম ছিল না, তখন কেমন করে মানুষদের সেই আত্মা ও মন পরিবর্তন করতে পারত? কেননা মানুষ যা দেখতে পারে না

কেমন করে তার মনপরিবর্তন ঘটাবে? [৫] কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ না কেউ বলতে পারে যে, তেমন কর্মের জন্য সৃষ্টিই যথেষ্ট। কিন্তু সৃষ্টি যথেষ্ট হলে তবে এসমস্ত অমঙ্গল হত না। সৃষ্টি তো ছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে একই ভুল-ভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত ছিল। [৬] সুতরাং আর একবার বলি, যিনি আত্মা ও মন দু'টোই দেখতে পান ও সৃষ্টিকর্মের সমস্ত কিছুর গতি যোগান ও তা দ্বারা পিতাকে জ্ঞাত করেন, সেই বাণী-ঈশ্বরকে বাদে কাকে দরকার ছিল? কেননা যিনি নিজের পূর্বজ্ঞান ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণ দ্বারা পিতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই মাত্র সেই শিক্ষাও নবীকৃত করতে পারতেন। [৭] তবে এসমস্ত কিছু কীভাবে করা যেতে পারত? হয় তো কেউ না কেউ বলবে যে, সেই সমস্ত কিছু সেই একই উপায়ে অবলম্বন করায়ই সম্ভব ছিল যাতে করে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি পিতা সংক্রান্ত সত্য পুনরায় দেখাতে পারতেন। কিন্তু এ উপায় এবার আর তত নির্ভরযোগ্য ছিল না; এমনকি ব্যাপারটা একেবারে উল্টো, কেননা মানুষ আগেও তা অবহেলা করেছিল, ও মানুষের চোখ আর ঊর্ধ্বের দিকে নয়, নিম্নের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। [৮] তাই যেহেতু মানুষকে সহায়তা করতে ইচ্ছা করা তাঁর পক্ষে ন্যায্য ছিল, সেজন্য তিনি মানুষ হিসাবে এলেন ও মানুষদের দেহের সদৃশ একটা নিম্নাবস্থার দেহ আপন করে নিলেন [আমি বলতে চাই, দেহের কর্মের মধ্য দিয়ে] যাতে করে যারা তাঁর পূর্বজ্ঞান ও বিশ্বনিয়ন্ত্রণ দ্বারা তাঁকে জানতে অনিচ্ছুক ছিল, তারা যেন কমপক্ষে দেহের মাধ্যমে সাধিত কর্মকাণ্ড দ্বারা সেই ঈশ্বরের বাণীকে জানতে পারত যিনি সেই দেহে উপস্থিত ছিলেন, ও তাঁর দ্বারা পিতাকেও জানতে পারত।

১৫। ঐশবাণীর আবির্ভাব

[১] কেননা যে উত্তম শিক্ষক নিজের ছাত্রদের যত্ন নেন তিনি যেমন যারা ঊর্ধ্বতর বিষয়ে উন্নতি করতে পারে না তাদের সহজতর উপায় দ্বারা শিক্ষাদান করতে সবসময় সম্মত হন, ঈশ্বরের বাণী তেমনিই ব্যবহার করেন; এক্ষেত্রে পল বলেন, *কেননা যেহেতু ঈশ্বরের প্রজ্ঞায় জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানল না, সেজন্য ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন* (ক)। [২] কেননা যেহেতু মানুষ ঈশ্বরদর্শন থেকে দূরে সরে গেছিল ও নিজের চোখ নিম্নের দিকে নিবদ্ধ রেখে কেমন যেন একটা অতল গহ্বরে নিমজ্জিত ছিল (খ), সৃষ্টিকর্মে ও

ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে ঈশ্বরকে খুঁজত, ও নিজেদের জন্য ঈশ্বর রূপে মরণশীল মানুষ ও অপদূত বানিয়েছিল, সেজন্য দয়াবান ও সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই ঈশ্বরের বাণী নিজের জন্য একটা দেহ ধারণ করলেন, মানুষদের মাঝে মানুষের মত জীবনযাপন করলেন, ও সকল মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো আপন করে নিলেন যাতে করে যারা মনে করছিল, ঈশ্বর দেহগত বস্তুতে বিরাজ করছিলেন, তারা যেন প্রভু নিজের দেহের কর্ম দ্বারা যা যা সম্পাদন করলেন, সেই কর্মগুলোর মধ্য দিয়ে সত্য উপলব্ধি করতে পারত ও তাঁর দ্বারা পিতাকে চিনে নিতে পারত। [৩] এবং যেহেতু তারা মানুষ ছিল ও সমস্ত কিছু মানবীয় ভাবে ভাবত, সেজন্য তারা যে দিকে নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলো ফেরাত সেখানে বোধগম্য বিশ্বকে দেখত ও সব দিক থেকে সত্য শিখত। [৪] কেননা তারা যদি সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যেত, তবু তারা দেখত, সৃষ্টি খ্রিষ্টকে প্রভু বলে স্বীকার করছিল; ও তাদের মন যদি মানুষদের দিকে এমন ভাবে সরে যেত যে, তারা সেই মানুষদের ঈশ্বর বলে ভাবত, তবু যখন তারা সেই মানুষদের কাজকর্ম ত্রাণকর্তার কর্মগুলোর সঙ্গে তুলনা করত, তখন এটাই দেখা যেত যে, মানুষদের মধ্যে কেবল ত্রাণকর্তাই ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, কেননা মানুষদের এমন কর্ম ছিল না যা বাণী-ঈশ্বরের সাধিত কর্মের মত। [৫] কিন্তু তারা যদি অপদূতদের দিকে ঝুঁকে পড়ত, তবু যখন দেখত সেই অপদূতেরা প্রভু দ্বারা তাড়িত হচ্ছিল, তখন তারা এ মেনে নিত যে, কেবল তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের বাণী ও অপদূতেরা ঈশ্বর ছিল না। [৬] আর যদি তাদের মন এমনভাবে মৃতদের উপর নিবদ্ধ ছিল যার ফলে তারা বীরপুরুষদের পূজা করত ও তাদেরও পূজা করত যারা কবিদের দ্বারা ঈশ্বর বলে কীর্তিত ছিল, তবু তারা যখন দেখত ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান, তখন স্বীকার করত, আগেকার সেই সবকিছু মিথ্যাই ছিল, ও কেবল পিতার বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি মৃত্যুর উপরে ক্ষমতা রাখেন। [৭] ঠিক এই কারণেই তিনি জন্ম নিলেন, মানুষ রূপে আবির্ভূত হলেন, মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরুত্থান করলেন; আর এইভাবে তিনি নিজের কর্ম দ্বারা আগেকার যত মানুষের কর্ম দুর্বল ও আচ্ছাদিত করলেন যাতে করে মানুষ যেই দিক থেকে আকর্ষিত ছিল না কেন, তিনি তাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে নিজের সত্যকার পিতার কথা শেখাতে পারেন, যেইভাবে তিনি নিজে বলেন, *যা হারানো ছিল, তা ত্রাণ করতে ও তা খুঁজতেই আমি এসেছি* [গ]।

১৬। তিনি এলেন যাতে মানুষ তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে

[১] কেননা যেহেতু মানুষের মন ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে নেমে গেছিল, সেজন্য বাণী একটা দেহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে মেনে নিলেন যাতে করে তিনি মানুষ হিসাবেই মানুষকে নিজের কাছে আনতে পারতেন ও তাদের ইন্দ্রিয়গুলো নিজের দিকে ফেরাতে পারতেন, ও এর ফলে যেহেতু মানুষ তাঁকে মানুষ হিসাবে দেখত, সেজন্য তিনি যেন নিজের সাধিত কর্ম দ্বারা এবিষয়ে তাদের মন জয় করতে পারতেন যে, তিনি কেবলমাত্র মানুষ নয় বরং ঈশ্বর ছিলেন, ও তাছাড়া ছিলেন সত্যকার ঈশ্বরের বাণী ও প্রজ্ঞা। [২] পল ঠিক একথার দিকে অঙুলি নির্দেশ করতে ইচ্ছা করছিলেন যখন বললেন, *ভালবাসায় দৃঢ়রোপিত ও দৃঢ়স্থাপিত হয়ে তোমরা যেন সকল পবিত্রজনের সঙ্গে সেই বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়ে ওঠ; এবং খ্রিষ্টের জ্ঞানাতীত ভালবাসাও জানতে পার, ফলে ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ* (ক)। [৩] কেননা বাণী ঊর্ধ্বে ও নিম্নে, গভীরে ও বিস্তারে তথা সর্বত্রই নিজেকে বিস্তীর্ণ করছিলেন: ঊর্ধ্বে তথা সৃষ্টিকর্মে; নিম্নে তথা মানবস্বরূপ ধারণে; গভীরে তথা পাতালে; বিস্তারে তথা জগতে। সমস্ত কিছু ঈশ্বরজ্ঞানে পরিপূর্ণ (খ)। [৪] ঠিক একারণেই তিনি আপন আগমন-লগ্নে সাথে সাথে সকলের খাতিরে নিজের আত্মোৎসর্গ পূর্ণভাবে সাধন করেননি, নিজের দেহকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেননি ও সেই দেহকে পুনরুত্থিত করেননি, কেননা তেমনটা করলে তিনি নিজেকে অদৃশ্যই করতেন। কিন্তু তিনি যা যা সাধন করলেন, তা দ্বারা নিজেকে যথেষ্ট দৃশ্যমান করলেন, সেই দেহে বসবাস করলেন এবং এমন কর্ম সম্পন্ন করলেন ও এমন চিহ্নকর্ম দেখালেন যা তাঁকে আর শুধু মানুষ নয় কিন্তু বাণী-ঈশ্বর বলে জ্ঞাত করল। [৫] কেননা মানুষ হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের ত্রাণকর্তা দুই ভাবে দয়া দেখালেন, তথা তিনি মৃত্যু থেকে আমাদের মুক্ত করলেন ও আমাদের নবীভূত করলেন; আর শুধু তা নয়, তিনি অদৃশ্যমান ও অদৃষ্টিগোচর হয়েও তবু নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র ও পিতার বাণী, বিশ্বের শাসনকর্তা ও রাজা বলে প্রকাশ করলেন ও জ্ঞাত করলেন (গ)।

১৭। ঐশবাণীর মাংসধারণ

[১] তিনি সেই দেহে সীমাবদ্ধ ছিলেন না, আবার তিনি যে সেই দেহে থাকতে অন্য কোথাও ছিলেন না তাও নয়। আর তিনি দেহকে স্থানান্তর করলে বিশ্ব যে তাঁর কর্ম ও পূর্বজ্ঞান বিহীন হয়ে যেত তাও নয়। কিন্তু যা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তা হলো যে, বাণী যে তিনি, কারও দ্বারা ধারণকৃত ছিলেন না বরং নিজেই সমস্ত কিছু ধারণ করছিলেন। তিনি তো গোটা সৃষ্টিতে বিদ্যমান, সত্তায় তিনি বিশ্বের বাইরে কিন্তু নিজের পরাক্রম গুণে সবকিছুতে বিদ্যমান: হ্যাঁ, তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখেন ও নিজের পূর্বজ্ঞান সমস্ত কিছুর উপরে বিস্তার করেন। এবং পৃথক পৃথক ভাবে আবার সমষ্টিগতভাবে সকলকে জীবন দান করায় তিনি বিশ্বকে ধারণ করে রাখেন ও তা দ্বারা ধারণকৃত নন, কিন্তু কেবল তাঁর আপন পিতাতেই তিনি সবকিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। [২] তাই মানব দেহে থাকতেও ও নিজে সেই দেহকে জীবনদান করতে করতেও তিনি সেই অনুসারে সমস্ত কিছুকে জীবন দান করেন; হ্যাঁ, তিনি একাধারে সমস্ত কিছুতে ছিলেন ও সমস্ত কিছুর বাইরে ছিলেন। আর যদিও নিজের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের দেহ দ্বারা জ্ঞাত ছিলেন, তবু বিশ্ব জুড়ে নিজের কর্ম দ্বারা তিনি অদৃশ্যমান ছিলেন না।

[৩] নিজের দেহের বাইরে যা কিছু রয়েছে, যুক্তিক্ষমতা দ্বারা তা দেখা হলো মানবাত্মার কর্ম; তবু আত্মা কখনও নিজের দেহের বাইরে কোন কর্ম সম্পাদন করে না, ও নিজের দেহ থেকে যা দূরে রয়েছে নিজের উপস্থিতি দ্বারা তা স্থানান্তর করাও আত্মার কর্ম নয়। সুতরাং, যখন মানুষ দূরবর্তী বস্তুর কথা ভাবে, সে প্রত্যক্ষভাবে সেই সমস্ত বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করে না, সেগুলোকে স্থানান্তরও করে না। একইপ্রকারে, একটা মানুষ ঘরে বসে স্বর্গীয় বস্তুগুলোর কথা ভাবলে সে সরাসরি সূর্যকে স্থানান্তর করে না, আকাশমণ্ডলকেও ঘোরায় না, কিন্তু সে এমনি দেখে, সেগুলো কোন এক দিকে সরে ও এও দেখে যে সেগুলো আছেই, যদিও নিজে থেকে সেগুলোর উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম। [৪] কিন্তু মানুষে থাকতে ঈশ্বরের বাণী সেরকম ছিলেন না। কেননা তিনি নিজের দেহে আবদ্ধ ছিলেন না বরং তিনি দেহকে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, ফলে তিনি দেহে ও সমস্ত কিছুতে ছিলেন আবার সৃষ্টির বাইরেও ছিলেন, কেবল পিতাতেই তিনি বিশ্রামরত ছিলেন। [৫] এবং আসল আশ্চর্যময় ব্যাপার এটা ছিল যে, তিনি একাধারে

মানুষরূপে জীবনযাপন করছিলেন, ও বাণী হিসাবে সমস্ত কিছু উজ্জীবিত করছিলেন, এবং পুত্র হিসাবে পিতার সঙ্গে ছিলেন। অতএব যখন সেই কুমারী প্রসব করেছিলেন, তিনি নিজে কষ্টভোগ করেননি, যখন তিনি সেই দেহে ছিলেন তখনও তিনি দূষিত হননি বরং তিনি সেই দেহকেই পবিত্র করে তুললেন। [৬] আর যখন তিনি সমস্ত কিছুতে ছিলেন তখনও তিনি সেই সমস্ত কিছুর অংশী ছিলেন না (ক); বরং সমস্ত কিছু তাঁরই দ্বারা সঞ্জীবিত ছিল ও তাঁর দ্বারা সুস্থির করা হচ্ছিল। [৭] কেননা সেই যে সূর্য তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ও আমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছি, সে আকাশে ঘুরতে ঘুরতে যখন পার্থিব বস্তু স্পর্শ করলেও কলঙ্কিত হয় না ও অন্ধকার দ্বারা বিলীন হয় না বরং সেই সমস্ত বস্তু আলোকিত ও বিশুদ্ধ করে, তখন এর চেয়ে সূর্যের নির্মাতা ও প্রভু যিনি, ঈশ্বরের সেই বাণী মহত্তর কারণেই তাঁর নিজের দেহে জ্ঞাত হওয়ার সময়ে কলঙ্কিত হলেন না বরং অক্ষয়শীল হওয়ায় মরণশীল সেই দেহকেও সঞ্জীবিত ও বিশুদ্ধ করে তুললেন (খ)। কেননা শাস্ত্রে বলে, *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* (গ)।

১৮। মানব কর্মকাণ্ডে ঐশবাণীর অবস্থা

[১] অতএব, যে ঐশতত্ত্ববিদগণ তাঁর বিষয়ে কথা বলেন, তাঁরা যখন বলেন যে তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন, পান করতেন ও জন্ম নিলেন, তখন তুমি একথা জেনে নাও যে, তাঁর দেহ দেহ হিসাবেই জন্ম নিল ও সেই দেহকে উপযুক্ত অন্নে পোষণ করা হচ্ছিল, কিন্তু যে ঈশ্বরের বাণী সেই দেহের সঙ্গে ছিলেন অথচ বিশ্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখছিলেন, সেই বাণীও দেহে সাধিত নিজের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এটাই জ্ঞাত করলেন যে, তিনি মানুষ নয় বরং ছিলেন বাণী-ঈশ্বর। তথাপি তাঁর বিষয়ে সেসমস্ত কিছু বলা হয়, কারণ যে দেহ খাওয়া-দাওয়া করছিল, জন্ম নিয়েছিল ও কষ্টভোগ করেছিল, সেই দেহ অন্য কারও দেহ ছিল না, কেবল প্রভুরই দেহ ছিল। আর যেহেতু তিনি মানুষ হলেন সেজন্য এ ন্যায্যই ছিল যে, সেই সমস্ত কিছু তাঁর বিষয়ে মানুষ হিসাবেই বলা হবে, যাতে করে তাঁর বিষয়ে দেখানো যেতে পারত যে, তিনি ছিলেন প্রকৃতই একটা দেহের অধিকারী, অবাস্তব একটা দেহের অধিকারী নন। [২] কিন্তু যেমন তিনি দৈহিক দিক দিয়ে উপস্থিত বলে জ্ঞাত ছিলেন, তেমনি যে সমস্ত কর্ম তিনি সেই দেহের মধ্য দিয়ে

সম্পাদন করেছিলেন, তা দ্বারা তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রমাণ করলেন। এজন্য তিনি অবিশ্বাসী ইহুদীদের উদ্দেশ করে জোর গলায় বলেছিলেন, *আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখুন; তাতেই আপনারা জানবেন ও বুঝবেন যে, পিতা আমাতে, আর আমি পিতাতে আছি* (ক)। [৩] কেননা তিনি যেমন অদৃশ্যমান হয়েও সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হন, তেমনি মানুষ হয়ে ও দেহে অদৃশ্যমান হয়ে তাঁরই কর্মের মধ্য দিয়ে এ জানা যেতে পারত যে, একটা মানুষ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রম ও বাণীই সেই তিনি যিনি সেই সমস্ত সাধন করছিলেন। [৪] কেননা তিনি যে অপদূতদের আজ্ঞা দিতেন ও তাড়িয়ে দিতেন, তেমন কর্ম মানবীয় ছিল না, ছিল ঐশ্বরিকই একটা কর্ম। অথবা, মানবজাতি যে পীড়নের অধীনস্থ, তিনি তেমন পীড়ন নিরাময় করতে দেখে কেইবা ভাবছিল তিনি ঈশ্বর ছিলেন না বরং ছিলেন একটা মানুষ? কেননা তিনি সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষকে শুচীকৃত করতেন, খোঁড়াকে হাঁটতে দিতেন, বধিরের কান খুলে দিতেন, অন্ধকে দেখতে দিতেন, এমনকি মানুষ থেকে যত ধরনের অসুস্থতা ও পীড়ন তাড়িয়ে দিতেন। তাতে যেকোন মানুষ তাঁর ঈশ্বরত্বকে দেখতে পেত। কেননা যারা জন্ম থেকে ত্রুটিযুক্ত ছিল, তারা দেহে যা অভাবী তিনি যে তাদের সেই দৈহিক অভাব পূরণ করতেন ও জন্মান্ধের চোখ খুলে দিতেন তেমনটা দেখে কেইবা এমনটা উপলব্ধি করত না যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করার অধিকার রাখছিলেন ও তিনি ছিলেন মানুষের প্রণেতা ও নির্মাতা? কেননা যিনি মানুষকে তা-ই ফিরিয়ে দিতেন যা বিষয়ে মানুষ জন্ম থেকে অভাবী ছিল, তিনি স্পষ্টভাবেই হলেন মানবসৃষ্টির প্রভু। [৫] অতএব সেই প্রথম কালেও যখন তিনি আমাদের কাছে নেমে এলেন, তখন নিজের জন্য একটি কুমারী থেকে একটা দেহ গড়লেন যাতে করে তিনি সকল মানুষকে নিজের ঈশ্বরত্বের এমন প্রমাণ দিতে পারতেন যা সামান্য নয়; কেননা যিনি নিজের জন্য তেমনটা গড়লেন তিনি বাকি সমস্ত কিছুরও নির্মাতা। কেননা মানুষ ছাড়া কেবল একটা কুমারী থেকে একটা দেহ নির্গমন করছে তেমনটা দেখে কেইবা এমনটা উপলব্ধি করত না যে, যিনি সেই দেহে প্রকাশ পাচ্ছিলেন তিনি অন্য সকল দেহেরও নির্মাতা ও প্রভু? [৬] অথবা, জল পদার্থটা যে রূপান্তরিত হয়ে আঙুররসে পরিণত হয়, তেমনটা দেখে

কেইবা উপলব্ধি করত না যে, যিনি তেমনটা করছিলেন তিনি সমস্ত তরল পদার্থের প্রভু ও স্রষ্টা? ঠিক এই কারণেই তিনি প্রভু হিসাবে সেইভাবে সাগরের উপর দিয়ে হাঁটলেন যেভাবে স্থলে হাঁটছিলেন, ও যারা তেমনটা দেখছিল, তাদের তিনি নিজের সার্বিক প্রভুত্বের প্রমাণ দিলেন। এবং যখন অল্প কিছু দিয়ে তিনি অসংখ্য মানুষের ভিড়কে পরিতৃপ্ত করেছিলেন ও অভাব থেকে এমন প্রাচুর্য এনে দিয়েছিলেন যার ফলে পাঁচ হাজার মানুষ পাঁচটা রুটিতে পেট ভরে খেয়েছিল ও বহু বহু কিছু বাকি রেখেছিল, তেমনটাও করে তিনি শুধু এটা দেখিয়েছিলেন যে, তিনিই সেই প্রভু যাঁর পূর্বজ্ঞান বিশ্বের উপরে বিস্তৃত।

১৯। মৃত্যুর উপরে বাণীর প্রভুত্ব

[১] মনে হচ্ছিল, আমাদের ত্রাণকর্তার পক্ষে এসমস্ত কিছু সম্পাদন করা ভাল ছিল যাতে করে, যেহেতু মানুষ বিশ্বে তাঁর পূর্বজ্ঞান চিনে নিতে ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে তাঁর ঈশ্বরত্বকেও উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়েছিল, সেজন্য মানুষ যদি তাঁর দেহের সাধিত কর্মের খাতিরে চোখ উত্তোলন করত, তাহলে, যেইভাবে আমি উপরে বলে এসেছি, তারা বিশিষ্ট একটা ঘটনা থেকে তাঁর সার্বিক পূর্বজ্ঞান অনুমান ক'রে তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে পারত। [২] কেননা যারা অপদূতদের উপরে তাঁর অধিকার দে'খে বা এটাও দে'খে যে, অপদূতেরা তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করছিল, তাদের মধ্যে কেইবা মনে মনে এবিষয়ে সন্দেহ করতে পারত যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম? (ক)। [৩] কেননা তিনি সৃষ্টিকেও নীরব থাকতে দিলেন না বরং এটাই অধিক বিস্ময়কর যে, তাঁর মৃত্যুক্ষণেও, প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর উপরে তাঁর বিজয়-ক্ষণেও (আমি তো ক্রুশেরই কথা বলছি) গোটা সৃষ্টি স্বীকার করছিল, যিনি দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন ও যন্ত্রণাভোগ করছিলেন তিনি এমনি একটা মানুষ ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র ও সকলের ত্রাণকর্তা। বস্তুতপক্ষে সূর্য মুখ ফেরাল, পৃথিবী কম্পান্বিত হল, পাহাড়পর্বত ফেটে গেল ও সবাই আতঙ্কিত হল; এসমস্ত কিছু এটাই দেখাচ্ছিল যে, যিনি ক্রুশে ছিলেন, সেই খ্রিষ্ট ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র; এটাও দেখাচ্ছিল যে, গোটা সৃষ্টি ছিল তাঁর দাসী ও সেই সৃষ্টি ভয়তে নিজের মালিকের আগমন বিষয়ে সাক্ষ্যদান করছিল।

এভাবে বাণী-ঈশ্বর নিজের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন।

এবার আমাদের সামনের পদক্ষেপ হলো দেহে তাঁর জীবনের ও কর্মকাণ্ডের শেষাংশ বর্ণনা করা; তাঁর দেহের যে কি ধরনের মৃত্যু হল, তাও আমাদের বলতে হবে, বিশেষভাবে একারণে যে, এটা আমাদের বিশ্বাসের মুখ্য বিষয় ও সকল মানুষ নির্বিশেষেই সেবিষয়ে কথা বলে; তবে এ থেকেই বিশেষভাবে তুমি জানতে পারবে যে, খ্রিষ্ট ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র বলে পরিচিত।

২০। বাণীর দেহ মরণশীল কিন্তু ক্ষয়শীল নয়

[১] তাই আমরা উপরে, আমাদের সাধ্যক্রমে ও বিষয়টা যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেই অনুসারে তাঁর দৈহিক আবির্ভাবের কারণ আংশিক ভাবে উল্লেখ করেছি, তথা: অন্য কেউই যা ক্ষয়প্রাপ্ত তা অক্ষয়শীলতায় আনতে পারত না, সেই স্বয়ং ত্রাণকর্তা ছাড়া যিনি আদিতে শূন্য থেকে বিশ্বকেও নির্মাণ করেছিলেন; আরও, পিতার প্রতিমূর্তি যিনি, তিনি বাদে অন্য কেউই মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে নবসৃষ্ট করতে পারত না; আরও, অন্য কেউই যা মরণশীল তা অমর করে তুলতে পারত না, আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্ট ছাড়া যিনি নিজেই জীবন; আরও, অন্য কেউই পিতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করতে ও প্রতিমাপূজা উল্টিয়ে দিতে পারত না, সেই বাণী ছাড়া যিনি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন ও যিনি একাই হলেন পিতার সত্যকার একমাত্র জনিত পুত্র। [২] কিন্তু, যেহেতু সেসময় সকল মানুষের দেয় ঋণ তখনও শোধ করা হয়নি যেহেতু (যেমনটা উপরে বলেছি) সকলে মরতে বাধ্য ছিল, সেজন্য, নিজের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রমাণের পর তিনি এখন সকল মানুষের হয়ে বলি উৎসর্গ করলেন ও সকলের হয়ে তাঁর নিজের মন্দির মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন যাতে করে তিনি সকলকে নিরপরাধী ও সেই প্রথম বিধান-লঙ্ঘন থেকে মুক্ত করতে পারেন, ও নিজের অক্ষয়শীল দেহকে সার্বিক পুনরুত্থানের প্রথমফসল হিসাবে দেখিয়ে নিজেকে মৃত্যুর চেয়ে বলবান দেখাতে পারেন[ক]।

[৩] আর তুমি এতে বিস্মিত হয়ো না যখন আমরা একই বিষয় বারে বারে উপস্থাপন করি, কেননা যেহেতু আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে কথা বলছি, সেজন্য

আমরা একই ধারণা বহুরূপে ব্যক্ত করি পাছে এমনটা মনে হয় যে আমরা কিছুটা বাদ দিচ্ছি, ফলে পাছে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হই যে, আমরা অতিরিক্ত স্বল্প কথা বলছি। বাস্তবিকই, যা জোর দিয়ে ব্যক্ত করা দরকার সেবিষয়ে কিছু না কিছু বাদ দেওয়ার চেয়ে বারে বারে একই কথা বলার জন্য অভিযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[৪] সুতরাং, সেই দেহ সকল দেহের সাধারণ পদার্থের অধিকারী হওয়ায় ছিল একটা মানব দেহ। যদিও সেই দেহ নবীন একটা অলৌকিক কাজের ফলে কেবল একটি কুমারী থেকে গঠিত হয়েছিল, তবু সেই দেহ ছিল মরণশীল ও সেই দেহের সদৃশ সমস্ত দেহের মত মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু সেই দেহে বাণীর আগমনের মধ্য দিয়ে দেহটা নিজের প্রকৃতি অনুসারে আর ক্ষয়শীল ছিল না, বরং যেহেতু সেই দেহে বাণী বসবাস করছিলেন সেজন্য দেহটা ক্ষয়প্রাপ্তি থেকে মুক্ত ছিল। [৫] আর এ বিষয় দু'টো একসাথে একই মুহূর্তে অলৌকিক ভাবে ঘটেছিল, তথা, সকলের মৃত্যু প্রভুর দেহে সিদ্ধিলাভ করল, ও সেইসঙ্গে মৃত্যু ও অবক্ষয়ও ধ্বংস হল সেই বাণীর কারণে যিনি সেই দেহে বিদ্যমান ছিলেন। কেননা মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল, এমন মৃত্যু যা সকলের হয়ে ঘটবে যাতে করে সকল মানুষের যা দেয় ছিল তা শোধ করা যেতে পারত। [৬] এজন্য, যেমন আগে বলেছি, অমর হওয়ায় বাণী যেহেতু নিজেই মৃত্যুবরণ করতে পরতেন না, সেজন্য নিজের জন্য এমন একটা দেহ আপন করে নিলেন যা মৃত্যুবরণ করতে পারত যাতে সেই দেহকে সকলের হয়ে নিজেরই দেহ বলে উৎসর্গ করতে পারেন ও সকল মানুষের হয়ে নিজেই যন্ত্রণাভোগ করে বাণী যেন সেই দেহে নিজের উপস্থিতি গুণে *মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন* [খ]।

২১। বাণীর মৃত্যু কেন প্রয়োজন ছিল?

[১] সুতরাং, যেহেতু সকলের সার্বজনীন ত্রাণকর্তা আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, সেজন্য খ্রিষ্টে বিশ্বস্ত এই আমরা এখন আগের মত বিধানের হুমকি অনুসারে আর মৃত্যুবরণ করি না, কেননা সেই হুমকি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু অবক্ষয় বন্ধ হয়েছে বলে ও পুনরুত্থানের অনুগ্রহ দ্বারা ধ্বংস হয়েছে বলে এখন দেহের মরণশীলতায় আমরা

বিলীন হচ্ছি শুধু সেই সময়কাল ধরে যা ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের জন্য স্থির করেছেন, যাতে আমরা '*শ্রেয়তর পুনরুত্থান*' (ক) পেতে পারি। [২] কেননা সেই বীজের মত যা মাটিতে বোনা হয়, আমরা যখন বিলীন হই তখন আমাদের ধ্বংস হয় না বরং একটা গাছের মত পুনরুত্থান করব, কেননা মৃত্যুকে ত্রাণকর্তার অনুগ্রহ দ্বারা ধ্বংস করা হল। সেজন্য পুনরুত্থান বিষয়ে যিনি জামিন স্বরূপ ছিলেন, সেই ধন্য পল বললেন, *এই ক্ষয়শীল দেহকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীল দেহকে অমরতা পরিধান করতে হবে। আর এই মরণশীল দেহ অমরতাকে পরিধান করার পর, তখনই শাস্ত্রের এই বাণী সার্থক হবে: মৃত্যু কবলিত হয়েছে বিজয়ের উদ্দেশে। ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (খ)

[৩] তাই কেউ না কেউ হয় তো জিজ্ঞাসা করবে, যখন তাঁর পক্ষে সকলের হয়ে নিজের দেহ সঁপে দেওয়া অপরিহার্য ছিল, তখন কেন তিনি মানুষ হিসাবে সেই দেহকে ব্যক্তিগত ভাবে সরিয়ে দেননি বরং এত দূরেই গিয়েছেন যে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হল? কেননা অপমানজনক মৃত্যু বরণ করার চেয়ে তিনি যে নিজের দেহকে সম্মানের সঙ্গে সরিয়ে দেবেন, তাঁর পক্ষে এটাই অধিক সমীচীন হত। [৪] এবার তুমি বিচার কর তেমন আপত্তি মানবীয় কিনা, ও অপরদিকে আমাদের ত্রাণকর্তা যা করেছিলেন তা সত্যিই ঐশ্বরিক ও বহু কারণেই তাঁর ঈশ্বরত্বের যোগ্য কিনা। প্রথমত এই কারণে যে, মানুষের সাধারণ ভাগ্য তথা তাদের মৃত্যু তাদের প্রকৃতির দুর্বলতার মধ্য দিয়েই তাদের উপরে নেমে আসে, কেননা যেহেতু তারা বেশিদিন বাঁচতে পারে না, সেজন্য সময়মত তারা বিলীন হয়। একইপ্রকারে, মানুষের উপর বহু রোগ-ব্যাধি আসে যার ফলে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে মরে যায়। কিন্তু প্রভু তো দুর্বল নন, বরং তিনি হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম, ঈশ্বরের বাণী ও নিজেই জীবন। [৫] তাই যদি তিনি কোন এক ব্যক্তিগত স্থানে ও মানুষের রীতি-নীতি অনুযায়ী নিজের দেহকে একটা খাটে ফেলে রেখে সরে যেতেন, তাহলে একজন এমনটা অনুমান করতে পারত যে, তিনিও নিজের প্রকৃতির দুর্বলতার কারণে তেমনটা করেছিলেন ও অন্যান্য মানুষের চেয়ে ঊর্ধ্বতর তাঁর কিছুই ছিল না। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন জীবন ও ঈশ্বরের বাণী, ও যেহেতু সকলেরই হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটবার কথা ছিল, সেজন্য জীবন ও পরাক্রম হওয়ায় তিনি দেহকে শক্তি দিলেন।

[৬] এবং যেহেতু মৃত্যু অনিবার্যই ছিল সেজন্য তিনি নিজের আত্মবলিদান সার্থক করার জন্য নিজেই কিছু না করে পরের হাতে মৃত্যুবরণ করলেন। কেননা যিনি পরের পীড়ন নিরাময় করেছিলেন, সেই প্রভুর পক্ষে পীড়িত হওয়া ন্যায্য ছিল না; ও যিনি পরের দুর্বলতা বলবান করেছিলেন, তাঁর দেহ যে দুর্বল হবে তাও ন্যায্য ছিল না। [৭] তবে তিনি যেমন পীড়ন সংযত রাখতেন, তেমনি মৃত্যুকেও সংযত রাখেননি কেন? কেননা এটাই ছিল সেই কারণ যার জন্য তাঁর একটা দেহ ছিল, এবং মৃত্যুকে এড়ানো সমীচীন ছিল না, পাছে পুনরুত্থানও এড়ানো হয়। তাছাড়া অসুস্থতা যে মৃত্যুর আগে দেখা দেবে তাও অনুপযুক্ত ছিল, পাছে যিনি দেহে ছিলেন তাঁর বিষয়ে এমনটা ভাবা হতে পারত যে, তিনি কোন না কোন দুর্বলতায় ভুগছিলেন। তবে তিনি কি ক্ষুধায় ভুগতেন না? তাঁর দেহের প্রকৃতির কারণে অবশ্যই তিনি ক্ষুধায় ভুগতেন। কিন্তু তিনি অনাহারের ফলে মরেননি কারণ প্রভুই সেই দেহ পরিধান করছিলেন। সুতরাং, যদিও তিনি সকলের মুক্তিমূল্যে মৃত্যুবরণ করলেন, তবু *অবক্ষয় দেখলেন না* (গ)। কেননা তিনি একেবারে সুস্থ অবস্থায় পুনরুত্থান করলেন যেহেতু সেই দেহ এমনি কোন একজনের অধিকার ছিল না; না, তাঁরই অধিকার ছিল যিনি স্বয়ং জীবন।

২২। কেন বাণী নিজের অমরতা রক্ষা করেননি?

[১] কিন্তু কেউ না কেউ এমনটা বলতে পারে যে, নিজের দেহ সম্পূর্ণরূপে অমর বলে রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষে ইহুদীদের মতলব থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা উচিত ছিল। তেমন আপত্তি যে উত্থাপন করে তাকে বলা হোক যে, প্রভুর পক্ষে তেমন ব্যবহার অনুপযুক্ত ছিল। কেননা যিনি স্বয়ং জীবন, তিনি যে নিজের দেহকে মৃত্যুর হাতে নিজেই দিয়ে দেবেন তা যেমন ঈশ্বরের বাণী হিসাবে তাঁর অনুপযুক্ত ছিল, তেমনি একই যুক্তি অনুসারে, অন্যেরা তাঁর জন্য যা করতে যাচ্ছিল তা থেকে পালিয়ে যাওয়াও তাঁর পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল; এমনকি, তাঁর পক্ষে বরং ধ্বংস পর্যন্তই তা মেনে নেওয়া উপযুক্ত ছিল। সুতরাং এটা ন্যায্যই হলো যে তিনি নিজের দেহকে ফেলে রেখে সরে যাননি ও ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করলে তিনি পালিয়ে যাননি। [২] তেমন ব্যবহার বাণীর দুর্বলতা দেখায়নি, বরং এটাই প্রমাণিত করল যে, তিনি ত্রাণকর্তা ও জীবন, কেননা তিনি মৃত্যুকে ধ্বংস করার জন্য মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকলেন, ও তাঁর নিজের উপরে যে মৃত্যুদণ্ড চাপিয়ে দেওয়া

হয়েছিল, সকলের পরিত্রাণের জন্য তা সার্থক করার লক্ষ্যে মৃত্যুর দিকে ত্বরা করলেন। [৩] অন্যদিকে, ত্রাণকর্তা নিজের মৃত্যু সার্থক করার জন্য নয়, বরং মানুষেরই মৃত্যু সার্থক করার জন্য এসেছিলেন। সেজন্য তিনি নিজের সাধিত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নিজের দেহকে ফেলে রাখেননি, কেননা জীবন হওয়ায় মৃত্যুর মত তাঁর নিজস্ব এমন কিছু ছিল না, কিন্তু অন্যেরা যে মৃত্যুকে নির্ধারণ করেছিল তিনি সেই মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিলেন যাতে করে, সেই মৃত্যু তাঁর নিজের দেহে এলে তিনি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারতেন। [৪] আরও, যা বলতে যাচ্ছি, তা থেকে একজন দেখতে পায় যে, প্রভুর দেহ উপযুক্ত ভাবে মৃত্যুবরণ করল। প্রকৃতপক্ষে প্রভু দেহের সেই পুনরুত্থানেরই বিষয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন যা তিনি সম্পাদন করতে অভিপ্রায় করছিলেন। কেননা মৃত্যুর উপরে তাঁর জয়চিহ্ন ছিল সকলের কাছে পুনরুত্থানকে দেখানো ও সকলকে এতেই নিশ্চিত করা যে, তিনি অবক্ষয় নিশ্চিহ্ন করেছিলেন ও ফলত তাদের দেহ অক্ষয়শীল হবে; এবং যে পুনরুত্থান সবাই ভোগ করতে যাচ্ছিল, সেই পুনরুত্থানের অঙ্গীকার ও প্রমাণ স্বরূপ বলে তিনি নিজের দেহকে অক্ষয়শীল অবস্থায় রেখেছিলেন। [৫] সুতরাং, যদি এমনটা হত যে তাঁর দেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল ও বাণীকে সকলের চোখের সামনে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, তাহলে এমনটা উপযুক্ত হত না যে যিনি পরের অসুস্থতা নিরাময় করেছিলেন তিনি তাঁর নিজের মাধ্যমকে অসুস্থতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেবেন। কেননা তেমনটা হলে তবে তিনি যে পরের অসুস্থতা বহিষ্কার করেছিলেন তা কেমন করে বিশ্বাসের বিষয় হতে পারত যখন তাঁর মধ্যে তাঁর নিজের মন্দির দুর্বল ছিল? কেননা হয় তিনি অসুস্থতা বহিষ্কার করার দায়ে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে যেতেন, না হয় তা বহিষ্কার করতে সক্ষম হলে কিন্তু তা বহিষ্কার না করায়, তাঁর বিষয়ে এমনটা ভাবা হত যে তিনি পরের ব্যাপারে উদাসীন।

২৩। পুনরুত্থান ধর্মতত্ত্বের জন্য প্রকাশ্য মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা

[১] কিন্তু যদি কোন অসুস্থতা বা কষ্ট ছাড়া তিনি নিজের দেহকে একা *‘এক কোণায়’* (ক) বা জনহীন এক স্থানে অথবা একটা ঘরে বা অন্য যেকোন এক স্থানে লুকিয়ে রাখতেন, ও তারপরে তিনি হঠাৎ করে পুনরায় দেখা দিয়ে বলতেন, তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে নিজেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, তাহলে প্রত্যেকেই মনে করত তিনি গল্প

বানাচ্ছিলেন; ও এর ফলে তিনি পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আরও বেশি অবিশ্বাসের পাত্র হতেন, কেননা তাঁর মৃত্যু বিষয়ে সাক্ষ্যদান করার মত কেউই থাকত না। এদিকে, মৃত্যু পুনরুত্থানের আগেই ঘটবার কথা, কেননা পুনরুত্থান হতে পারে না যদি না আগে মৃত্যু হয়। সুতরাং, যদি তাঁর দেহের মৃত্যু কোন সাক্ষীর সামনে নয় কিন্তু কোন এক স্থানে গোপনে হত, তাহলে সেই দেহের পুনরুত্থানও অদৃশ্য ও সাক্ষীহীন হত। [২] এবং এমনটা করলে যে তাঁর মৃত্যু অদৃশ্যেই ঘটবে, তবে পুনরুত্থান করার পর কেনই বা তিনি পুনরুত্থানের সংবাদ দিলেন? অথবা, কেনই বা তিনি সকলের দৃষ্টিগোচরে অপদূতদের তাড়িয়েছিলেন, সেই জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি পেতে দিয়েছিলেন ও জলকে আঙুররসে পরিণত করেছিলেন যাতে করে এসমস্ত কিছু দ্বারা তাঁকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করা হত অথচ সকলের দৃষ্টিগোচরে নিজের মরণশীল দেহকে অক্ষয়শীল বলে দেখালেন না যাতে করে তাঁকে জীবন বলে বিশ্বাস করা হত? [৩] আরও, যদি তাঁর শিষ্যেরা একথা আদৌ বলতে পারতেন না যে তিনি আগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাহলে তাঁরা কেমন করে সৎসাহসের সঙ্গে পুনরুত্থানের কথা উচ্চারণ করতে পারতেন? বা তাঁরা একথা বলে যে, আগে মৃত্যু ও পরে পুনরুত্থান হয়েছিল, কেমন করে তাঁদের বিশ্বাস করা যেতে পারত যদি না যাদের কাছে তাঁরা এত সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছিলেন তারা সেই শিষ্যদের তাঁর মৃত্যুর সাক্ষী বলে মেনে না নিত? কেননা যখন তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এভাবে সকলের দৃষ্টিগোচরে ঘটেছিল, তখন যদি সেকালের ফরিশীরা তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না ক'রে বরং যারা পুনরুত্থান দেখেছিল তাদের তা অস্বীকার করতে বাধ্য করত, তাহলে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেসমস্ত কিছু যদি গোপনে ঘটে থাকত তাহলে নিজেদের অবিশ্বাসের জন্য সেই ফরিশীরা কতগুলো ছুতাই না উত্থাপন করত? [৪] আরও, কেমন করে মৃত্যুর শেষ পরিণাম ও মৃত্যুর উপরে বিজয়টা প্রদর্শিত হতে পারত যদি না তিনি সকলের দৃষ্টিগোচরে সেই মৃত্যুকে [আসামী রূপে মঞ্চে (খ)] হাজির করে তা মৃত বলে ও নিজের দেহের অক্ষয়শীলতা দ্বারা নিঃশেষিত বলে প্রমাণিত করতেন?

২৪। প্রভুর মৃত্যু সংক্রান্ত অন্য সম্ভাব্য অভিযোগ

[১] কিন্তু অন্যান্যরাও যা বলতে পারবে, আমাদের এ পক্ষসমর্থনে তা আগে থেকে ব্যক্ত করা উচিত। হয় তো এমন কেউ একথাও বলতে পারত, 'যদি এমনটা প্রয়োজন হত যে, পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাসযোগ্য হবার জন্য তাঁর মৃত্যু সকলের দৃষ্টিগোচরে ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ঘটবে, তাহলে তিনি নিজের জন্য এমন গৌরবময় মৃত্যুও কল্পনা করতে পারতেন, কমপক্ষে যেন তা দ্বারা ক্রুশের অবমাননা এড়াতে পারতেন।' [২] কিন্তু তেমনটা করলে তিনি নিজের উপরে এ সন্দেহ উত্থাপন করতেন যে সমস্ত মৃত্যুর উপরে তাঁর কোন অধিকার ছিল না, কেবল তাঁর জন্য স্থির করা মৃত্যুর উপরেই তিনি অধিকার রাখতেন; আর এইভাবেও পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করার অজুহাত আদৌ কমত না। অতএব মৃত্যু তাঁর দেহে তাঁর নিজের দ্বারা নয় কিন্তু ষড়যন্ত্র দ্বারাই এসেছিল যাতে তিনি সেই মৃত্যু ধ্বংস করতে পারতেন যা তারা ত্রাণকর্তার উপর চেপে দিচ্ছিল। [৩] এবং যেমন বুদ্ধি ও সাহসের দিক দিয়ে মহান এক সুযোগ্য কুস্তিযোদ্ধা নিজের প্রতিযোগী হিসাবে নিজে থেকে কাউকে বাছাই করে না পাছে সে এমন সন্দেহ জাগাতে পারে যে, সে কোন না কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভয় পায়, কিন্তু দর্শকদের উপরে, বিশেষভাবে নিজের প্রতি শত্রুভাব সম্পন্ন দর্শকদেরই উপরে নির্বাচনের ভার আরোপ করে যাতে করে তারা যাকে তার সমকক্ষ বলে বাছাই করেছে তাকে পরাভূত ক'রে সে সকলের চেয়ে বলবান বলে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, তেমনি সকলের জীবন যিনি, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা সেই খ্রিষ্টও নিজের দেহের জন্য কোন মৃত্যু কল্পনা করে বাছাই করেননি পাছে তিনি অন্য ধরনের মৃত্যু বিষয়ে নিজেকে ভীত বলে দেখাতেন; কিন্তু অন্যান্যদের দ্বারা, বিশেষভাবে তাঁর শত্রুদেরই দ্বারা স্থির করা এমন মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিলেন ও ক্রুশের উপরে তা বরণ করলেন যা সেই শত্রুরা ভয়ঙ্কর, অসম্মানজনক ও আতঙ্কময় মনে করছিল; তিনি তেমনটা মেনে নিলেন যাতে সেই মৃত্যুর ধ্বংস হলে পর তাঁকে জীবন বলে বিশ্বাস করা হত, ও এও বিশ্বাস করা হত যে, মৃত্যুর প্রতাপ একেবারে বিলুপ্ত হয়েছিল। [৪] তাই আশ্চর্যময় ও অসাধারণ কিছু ঘটল, তথা, সেই যে মৃত্যুকে তারা তাঁর উপর চেপে দেবে বলে অসম্মানজনক বলে ভেবেছিল, সেই মৃত্যু হয়ে উঠল মৃত্যুর উপরে তার বিজয়ের গৌরবময় চিহ্ন। এভাবে [বাপ্তিস্মদাতা] যোহনের

মতও শিরশ্ছেদ দ্বারা তাঁর মৃত্যু হয়নি ও ইশাইয়ার মতও তাঁকে করাত দিয়ে দু'ভাগে কাটা হয়নি যাতে করে তিনি মৃত্যুতে নিজের দেহ অক্ষুণ্ন ও অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন, ও যারা মণ্ডলীকে বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছা করে তাদের যেন কোন অজুহাত না থাকে।

২৫। যত মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে কেন তিনি ক্রুশমৃত্যুতে দণ্ডিত হলেন?

[১] আমার এই মন্তব্য তাদেরই লক্ষ করে যারা মণ্ডলীর বাইরে থেকে নিজেদের সুবিধার জন্য অসঙ্খ্য তর্কাতর্কি তৈরি করতে পছন্দ করে। কিন্তু যদি আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবে নয় কিন্তু সত্যান্বেষণেরই আকাঙ্ক্ষায় অনুসন্ধান করত কেন তিনি অন্য ধরনের মৃত্যু বরণ করেননি কিন্তু ক্রুশমৃত্যুই বরণ করলেন, তাহলে সে একথা শুনুক যে, ক্রুশমৃত্যু ছাড়া অন্য ধরনের মৃত্যু থেকে আমাদের কোন উপকার হত না, ও প্রভু যে আমাদের খাতিরে সেই ধরনের মৃত্যু বরণ করলেন তা ন্যায্যই ছিল। [২] কেননা তিনি নিজে যখন আমাদের উপরে পড়া সেই অভিশাপ বহন করতে এসেছিলেন, তবে কেমন করেই বা তিনি '*অভিশাপস্বরূপ*' (ক) হতে পারতেন যদি না সেই মৃত্যু বরণ করতেন যা অভিশাপের জন্য স্থিরীকৃত? আর সেই মৃত্যু হলো ক্রুশ, কেননা লেখা আছে, *অভিশপ্ত সেই মানুষ যে গাছে ঝুলছে* (খ)। [৩] আরও, যখন প্রভুর মৃত্যু হলো সকলের মুক্তিমূল্য, তাঁর মৃত্যু দ্বারা *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর* (গ) ভেঙে গেল, ও বিজাতীয়দের আহ্বান সার্থক হলো, তখন যদি তাঁকে ক্রুশে না দেওয়া হত কেমন করে তিনি আমাদের ডাকতে পারতেন? কেননা শুধু ক্রুশেই একজন হাত দু'টো প্রসারিত করে মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং প্রভুকে তেমনটা বরণ করতে হল ও তিনি হাত দু'টো প্রসারিত করলেন, যেন একটা হাত দিয়ে তিনি প্রাচীনকালের জনগণকে ও অন্য হাত দিয়ে বিজাতীয়দের জনগণকে আকর্ষণ করতে পারেন ও উভয়কে নিজেতে মিলিত করতে পারেন (ঘ)। [৪] একথা তিনি নিজে তখনই বলেছিলেন যখন ইঙ্গিত দিলেন কোন ধরনের মৃত্যু দ্বারা তিনি সকল মানুষের মুক্তিমূল্য দেবেন, *আমাকে যখন উত্তোলন করা হবে, তখন সকলকে নিজের কাছে আকর্ষণ করব* (ঙ)। [৫] একথা ছাড়া, যদি আমাদের মানবজাতির শত্রু সেই দিয়াবল স্বর্গ থেকে পতিত হয়ে এই নিম্নলোকে ঘোরাফেরা করে ও এখানে অবাধ্যতায় তার সঙ্গী অপদূতদের উপর প্রভুত্ব ক'রে তাদের দ্বারা মানুষকে প্রতারণা করার জন্য অসার বিভ্রমজনক কর্ম সাধন করে ও মানুষকে ঊর্ধ্বের দিকে ওঠার

জন্য রোধ করতে চেষ্টা করে, তাহলে এবিষয়ে প্রেরিতদূত এও বলেন, *বিদ্রোহের সন্তানদের মধ্যে এখন সক্রিয় যে আত্মা, বায়ুলোকের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজ অনুসারে* (চ) ইত্যাদি। কিন্তু প্রভু দিয়াবলকে উল্টিয়ে দিতে, বায়ুলোক বিশুদ্ধ করতে, ও আমাদের জন্য স্বর্গ পর্যন্ত আরোহণ-পথ উন্মুক্ত করতে এলেন *সেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসেরই মধ্য দিয়ে* (ছ), যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেছিলেন। এ এমন কিছু যা তাঁর মৃত্যু দ্বারা সাধিত হওয়ার কথা; ব্যাপারটা তেমনটা হলে তবে অন্য কোন্ ধরনের মৃত্যু দ্বারা এসমস্ত কিছু হতে পারত সেই মৃত্যু দ্বারা ছাড়া যা বায়ুলোকে ঘটে? আর আমি তো ক্রুশেরই কথা বলছি। কেননা যিনি ক্রুশে সিদ্ধতা অর্জন করেন, কেবল তিনিই বায়ুলোকে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং প্রভুর পক্ষে তেমন মৃত্যুবরণ করা উপযুক্তই ছিল। [৬] কেননা এভাবে বায়ুলোকে উত্তোলিত হওয়ায় তিনি দিয়াবলের ও সব ধরনের অপদূতদের দুষ্টতা থেকে বায়ুলোক বিশুদ্ধ করলেন, যেইভাবে তিনি বলেছিলেন, *আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত পড়তে দেখলাম* (জ); এবং তিনি স্বর্গ পর্যন্ত পথ নতুন করে উন্মুক্ত করেছিলেন, যেইভাবে তিনি এও বলেছিলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার* (ঝ)। কেননা এমনটা দরকার ছিল না যে স্বয়ং বাণীর জন্যই তোরণ উন্মুক্ত করা হবে, যেহেতু তিনি হলেন সবকিছুর প্রভু; তাঁর সাধিত কোন কাজও যে আপন নির্মাতার জন্য বন্ধ ছিল তাও নয়, কিন্তু আমরাই ছিলাম সেই তারা যাদের জন্য সেই সবকিছু দরকার ছিল, সেই আমাদেরই তিনি নিজের দেহ দ্বারা ঊর্ধ্বে তুলে নিলেন। কেননা তিনি যেমন সকলের হয়েই সেই দেহ মৃত্যুর কাছে নিবেদন করলেন, তেমনি আবার সেই দেহ দ্বারা তিনি স্বর্গ পর্যন্ত আরোহণ-পথ উন্মুক্ত করলেন।

২৬। তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন

[১] অতএব আমাদের জন্য ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যু উপযুক্ত ও সমীচীন ছিল, ও সেই মৃত্যুর কারণ সব দিক দিয়ে খুবই যুক্তিসঙ্গত বলে দেখা দিল। এক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলা যেতে পারে যে, সকলের পরিত্রাণ ক্রুশ দ্বারা ছাড়া অন্য উপায় দ্বারা সাধিত হতে পারত না। কেননা এভাবেও অর্থাৎ সেই ক্রুশেও তিনি নিজেকে অদৃশ্যমান রাখেননি বরং এমনটা করলেন যাতে সৃষ্টি নিজেই নিজের স্রষ্টার সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। তিনি নিজের দেহ-মন্দির বেশিক্ষণ ধরে রাখেননি, কিন্তু সেই দেহ-মন্দির যে মৃত্যুর সঙ্গে

সংস্পর্শের ফলে মৃত ছিল বলে তা প্রদর্শন করার পর তিনি সরাসরি সেই তৃতীয় দিনে তা উত্তোলন করলেন, আর সেইসঙ্গে মৃত্যুর উপরে জয়চিহ্ন ও জয়লাভের প্রমাণ হিসাবে দেহের অক্ষয়শীলতা ও যন্ত্রণাহীনতা সঙ্গে করে নিলেন। [২] তিনি মৃত্যুর পর পরেও দেহটাকে পুনরুত্থিত করতে পারতেন ও এও দেখাতে পারতেন যে, সেই দেহ জীবিত, কিন্তু ত্রাণকর্তা প্রজ্ঞাময় পূর্বজ্ঞান দেখিয়ে তেমনটা করলেন না। কেননা তিনি সাথে সাথে পুনরুত্থান প্রকাশ করলে তবে কেউ না কেউ এমনটা বলতে পারত যে, তিনি আদৌ মরেননি অথবা মৃত্যু তাঁকে সম্পূর্ণরূপে স্পর্শ করেনি। [৩] এবং যদি মৃত্যুক্ষণ ও পুনরুত্থানক্ষণ একই ক্ষণ হত, তাহলে হয় তো অক্ষয়শীলতার গৌরব তত স্পষ্ট নাও হতে পারত। সুতরাং, যাতে দেখানো যেতে পারত যে দেহটা সত্যিই মৃত, সেই লক্ষ্যে ত্রাণকর্তা মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাঝামাঝি কালে অতিরিক্ত একটা দিন সন্নিবিষ্ট করলেন ও তৃতীয় দিনে সকলের কাছে দেহটাকে অক্ষয়শীল বলে দেখালেন। [৪] অতএব, যাতে ক্রুশের উপরে মৃত্যু প্রমাণিত হতে পারত তিনি নিজের দেহ তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত করলেন। [৫] কিন্তু পাছে এমনটা না ঘটত যে, মৃতদেহটা অতিরিক্ত সময় থেকে যাবার পর ও সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পর তা পুনরুত্থিত করলে তাঁকে বিশ্বাস করা হত না এই অজুহাতে যে তিনি দেহটাকে অন্য দেহের সঙ্গে পাল্টিয়েছিলেন (কেননা অতিরিক্ত সময় কেটে গেলে কেউ না কেউ যা দেখেছিল তা বিশ্বাস নাও করতে পারত ও যা ঘটেছিল তা ভুলেও যেতে পারত), সেজন্য তিনি তিন দিনের বেশি সময়কাল অপেক্ষা করেননি, ও যাঁদের কাছে তিনি আগে নিজের পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন তাঁদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষমান অবস্থায় ফেলে রাখেননি, [৬] বরং তাঁর নিজের কথা তখনও তাঁদের কানে ধ্বনিত হতে হতে, তাঁদের চোখ তখনও প্রত্যাশী হতে হতে ও তাঁদের মন তখনও অপেক্ষমান হতে হতে, এবং যারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল ও প্রভুর দেহের মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল তারা তখনও এ পৃথিবীতে জীবিত থাকতেই ও একই অঞ্চলে থাকতেই ঈশ্বরের পুত্র তিন দিন সময়কাল পরে মৃত্যু হয়েছিল যে দেহের, তা অমর ও অক্ষয়শীল বলে দেখালেন; তাতে সকলের কাছে প্রমাণিত হল যে, যে বাণী সেই দেহে বসবাস করছিলেন, সেই বাণীর প্রকৃতির দুর্বলতার ফলেই দেহটা মরেনি, বরং দেহটা মরে গেছিল যাতে ত্রাণকর্তার পরাক্রম গুণে মৃত্যু সেই দেহে ধ্বংসিত হয়।

২৭। ক্রুশের উপরে প্রভুর মৃত্যু, ও মানুষের মৃত্যু যা আর ভয়ঙ্কর নয়

[১] মৃত্যু যে বিলীন হয়েছিল, ক্রুশ যে মৃত্যুর উপরে বিজয় স্বরূপ, ও সেই মৃত্যু যে আর প্রভাবশালী নয় এমনকি সত্যিই মৃত, তা এতেই অনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত ও স্পষ্ট ভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, মৃত্যু খ্রিষ্টের সকল শিষ্যের দ্বারা অবজ্ঞাত ও প্রত্যেকেই তা পদদলিত করে ও তাতে ভীত আর নয়, বরং ক্রুশচিহ্ন দিয়ে ও খ্রিষ্টবিশ্বাসে তারা সেই মৃত্যু মৃত বস্তু যেন পায়ে মাড়িয়ে দেয়। [২] কেননা সেই অতীতে অর্থাৎ ত্রাণকর্তার দিব্য আগমন হওয়ার আগে সকলে মৃতদের জন্য কেমন যেন ধ্বংসিতই ব্যক্তিদের জন্য চোখের জল ফেলত। কিন্তু এখন, যখন ত্রাণকর্তা নিজের দেহ উত্তোলন করেছেন, সেই মৃত্যু এখন ভয়ের বস্তু আর নয়, বরং খ্রিষ্টের সকল বিশ্বাসী মৃত্যুর উপরে শূন্যতারই উপরে যেন পা বাড়ায় ও খ্রিষ্টে আপন বিশ্বাস অস্বীকার করার চেয়ে মরতেও সম্মত (ক)। কেননা তারা নিশ্চিত হয়ে জানে যে, যখন তারা মৃত্যুবরণ করে, তখন তাদের ধ্বংস হয় না বরং জীবিত থাকে ও পুনরুত্থান দ্বারা অক্ষয়শীল হয়ে ওঠে। [৩] এবং সেই যে দিয়াবল একসময় দুষ্টভাবে মৃত্যুতে উল্লাস করত, যেহেতু সেই *মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করা হয়েছে* (খ) সেজন্য কেবল সেই দিয়াবলই সত্যিকারে মৃত অবস্থায় রয়েছে। একথার প্রমাণ হলো এ যে, খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার আগে মানুষ মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর কিছুর মত দেখে ও তাতে আতঙ্কিত, কিন্তু খ্রিষ্টে ও তাঁর শিক্ষায় বিশ্বাসী হওয়ার পর তারা মৃত্যুকে এতই অবজ্ঞা করে যে তারা সুখী মনে সেটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছোটে ও ত্রাণকর্তা দ্বারা মৃত্যুর উপরে যে বিজয় সাধিত হয়েছে তারা সেবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে। কেননা তারা ছোট্ট বালক হয়েও মৃত্যুবরণ করার জন্য দৌড়োয়, আর পুরুষমানুষ শুধু নয়, স্ত্রীলোকেরাও আত্মিক অনুশীলন দ্বারা সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি নেয়। মৃত্যু এতই দুর্বল হয়েছে যে, যে স্ত্রীলোকেরা এককালে তাতে প্রবঞ্চিত হত, তারাও এখন সেই মৃত্যুকে মৃত ও পক্ষাঘাতগ্রস্তই যেন বিদ্রূপ করে। [৪] কেননা যেমন কোন স্বৈরশাসক কোন বৈধ রাজা দ্বারা পরাজিত হলে তাকে হাতে পায়ে বাঁধা হয়, পথিক সবাই তাকে বিদ্রূপ করে, মারে ও অবজ্ঞা করে, ও যে রাজা তাকে পরাভূত করেছেন সেই রাজার কারণে সেই স্বৈরশাসকের রোষ বা হিংস্রতা বিষয়ে আর ভীত নয়, তেমনিভাবে ক্রুশের উপরে ত্রাণকর্তা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা হয়েছে ও তাচ্ছিল্যের বস্তু করা হয়েছে, হাতে পায়ে

বাঁধা হয়েছে, ও সকল খ্রিষ্টিয়ান পথিক তাকে পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে মৃত্যুকে বিদ্রূপ করতে করতে খ্রিষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, এবং ঠাট্টা ক'রে তাকে উদ্দেশ করে তা-ই বলে যা একসময় তার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* (গ)

২৮। এসমস্ত কিছু উপলব্ধি করার জন্য খ্রিষ্টবিশ্বাস দরকার

[১] তাই যখন খ্রিষ্টিয়ান বালক-বালিকা এই বর্তমান জীবনকে অবজ্ঞা করে ও মৃত্যুবরণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে, তখন এ কি মৃত্যুর দুর্বলতা বিষয়ে অর্থহীন যুক্তি বা মৃত্যুর উপরে ত্রাণকর্তার জয়লাভের কাঁচা প্রমাণ মাত্র? [২] কেননা স্বভাবে মানুষ মৃত্যু ও দেহের বিলুপ্তির ব্যাপারে ভয় পায়। কিন্তু এতে আশ্চর্য ব্যাপার এ হলো যে, যে কেউ ক্রুশ-বিশ্বাস পরিধান করেছে, সে প্রকৃতির সবকিছু অবজ্ঞা করে ও খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যুকে ভয় পায় না। [৩] এবং যেমন আগুনের প্রকৃতি হলো পুড়িয়ে দেওয়া, যদি এমন কেউ বলত যে এমন কিছু রয়েছে যা আগুনের শিখা ভয় পায় না বরং এমনটা দেখায় যে আগুন দুর্বল (যেইভাবে হিন্দুস্তানীয়দের মধ্যে 'আসবেস্তন' বিষয়ে বলা হয়), তাহলে যে কেউ একথা বিশ্বাস করে না, সে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলে এই অগ্নিরোধী দ্রব্য পরিধান ক'রে ও আগুনের কাছে গিয়ে অবশ্যই এতে নিশ্চিত হত যে, আগুন দুর্বল; [৪] অথবা, যে কেউ কোন স্বৈরশাসককে বাঁধা অবস্থায় দেখতে ইচ্ছা করত, সে অবশ্যই স্বৈরশাসককে যিনি পরাজিত করেছিলেন তাঁর এলাকায় প্রবেশ করে দেখতে পেত যে, যে একসময় ছিল অন্যান্যদের ভয়ের কারণ, সে এখন দুর্বল অবস্থায় রয়েছে, তেমনিভাবে, যে কেউ এখনও অবিশ্বাসী ও তত মহৎ ঘটনা ঘটবার পরে, তত মানুষ খ্রিষ্টে সাক্ষ্যমর হয়েছে এমনটার পরে, খ্রিষ্টে বীরদের দ্বারা প্রতিদিন মৃত্যুর উপরে দেখানো বিদ্রূপের পরে, এসমস্ত কিছু সত্ত্বেও সে যদি মৃত্যুর বিনাশ ও তার শেষ পরিণাম সম্পর্কে মনে মনে এখনও সন্দেহ পোষণ করত, তাহলে তার উচিত উপরোল্লিখিত বিষয়ে বিস্মিত হওয়া; কিন্তু সে যেন অবিশ্বাসে স্থিতমূল না থাকে ও তেমন স্পষ্ট ঘটনার সামনে যেন নির্লজ্জ ব্যবহার না করে। [৫] বরং সেই যে ব্যক্তি 'আসবেস্তন' পরিধান করে সে যেমন আগুনের সামনে সেই 'আসবেস্তন' এর প্রভাব মেনে নেয়, ও যে ব্যক্তি বাঁধা স্বৈরশাসককে দেখতে ইচ্ছা করে স্বৈরশাসককে যিনি পরাজিত করেছেন সে যেমন তাঁর এলাকায় প্রবেশ করে,

তেমনি যে কেউ মৃত্যুর উপরে বিজয়ের কথা বিশ্বাস করে না, সে খ্রিষ্ট-বিশ্বাস গ্রহণ করুক ও তাঁর শিক্ষায় প্রবেশ করুক, তবেই সে মৃত্যুর দুর্বলতা ও মৃত্যুর উপরে বিজয় দেখতে পাবে। কেননা অনেকে শুরুতে অবিশ্বাস করল ও বিদ্রূপ করল, কিন্তু পরে বিশ্বাস ক'রে মৃত্যুকে এমনভাবে অবজ্ঞা করল যে নিজেরাই খ্রিষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর হয়ে উঠল।

২৯। ক্রুশের ফল

[১] কিন্তু যখন ক্রুশের চিহ্ন ও খ্রিষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মৃত্যু ভূপাতিত হয়, তখন সত্যই বিচারক হলে (ক) তবে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে স্বয়ং খ্রিষ্ট ছাড়া এমন কেউ নেই যে মৃত্যুর উপরে গৌরবময় বিজয় লাভ করল ও মৃত্যুকে শক্তিহীন করে ফেলল। [২] আর যখন মৃত্যু আগে শক্তিশালী হওয়ায় ভয়ের বস্তু ছিল কিন্তু ত্রাণকর্তার আগমনের পরে ও তাঁর দেহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে গেছে, তখন একথা সুস্পষ্ট যে, খ্রিষ্ট ক্রুশে আরোহণ করায়ই মৃত্যু ধ্বংসিত ও পরাভূত হয়েছে। [৩] কেননা যেমন রাতের পরে সূর্য আবির্ভূত হলে পৃথিবীর সকল প্রান্ত তার আলোতে আলোকিত হওয়ায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, যে সূর্য নিজের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে, তা সেই একই সূর্য যা অন্ধকার দূর করে দিল ও সবকিছু আলোকিত করল, তেমনি যখন দেহে ত্রাণকর্তার পরিত্রাণদায়ী আবির্ভাব ও ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর পরেই মৃত্যু অবজ্ঞার বস্তু হল ও ভূপাতিত হল, তখন একথা স্পষ্ট যে, তিনিই সেই একই ত্রাণকর্তা যিনি দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মৃত্যু ধ্বংস করলেন ও আপন শিষ্যদের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর উপর নতুন নতুন বিজয় দিনে দিনে দেখিয়ে থাকেন। [৪] কেননা যখন দেখা যায়, স্বভাবে দুর্বল মানুষ মৃত্যুর অবক্ষয়ে ভীত না হয়ে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলে, ও পাতালে নামতে ভয় না করে তৎপর অন্তরে পাতাল তুচ্ছই করে ও তার যন্ত্রণার চিন্তায়ও অটল থাকে, কিন্তু এ বর্তমান জীবনের চেয়ে খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যুরই আকাঙ্ক্ষা করে; আবার, যখন দেখা যায়, খ্রিষ্টভক্তির খাতিরে নর-নারী ও বালকও মৃত্যুর দিকে স্বচ্ছন্দেই ধাবিত, তখন তত নির্বোধ বা অবিশ্বাসী এমন কেইবা থাকতে পারে, অথবা মনে তত অন্ধ এমন কেইবা না বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে যে, মানুষ যাঁর সাক্ষ্য বহন করছে, সেই খ্রিষ্টই প্রত্যেককে মৃত্যুর উপর বিজয় দান ও মঞ্জুর করেন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ও

ক্রুশচিহ্ন পরিধান করে, তাদের মধ্যে তিনিই মৃত্যুকে শক্তিহীন করে ফেলেন। [৫] কেননা যে কেউ পায়ে মাড়িয়ে দেওয়া সাপ দেখে, বিশেষভাবে সে যদি সেটার তীব্রতা জেনে থাকে, সে মনে দুর্বল ও দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলোতে কাঁচা না হলে তবে তার আর কোন সন্দেহ থাকে না যে সাপটা মৃত ও একেবারে শক্তিহীন। আরও, বালকেরা যে একটা সিংহকে নিয়ে ফুর্তি করছে তা দেখে কেইবা এমনটা বুঝবে না যে, হয় সিংহটা মৃত, না হয় সিংহটা শক্তিহীন? [৬] তাই যেমন চোখ দিয়ে এসমস্ত কিছু যে সত্য কিনা তা দেখা সম্ভব, তেমনি যখন মৃত্যু তাদেরই দ্বারা ফুর্তির বস্তু বলে গণিত ও অবজ্ঞাত যারা খ্রিষ্টে বিশ্বাসী, তখন কেউই যেন এতে আর সন্দেহ না করে বা একথা অবিশ্বাস করে যে, মৃত্যু খ্রিষ্টে ধ্বংসিত হয়েছে ও তার অবক্ষয় বিনষ্ট ও নিঃশেষিত হয়েছে।

৩০। পুনরুত্থানের প্রমাণ

[১] আমরা এতক্ষণে যা বলে এসেছি, তা এবিষয়ে সামান্য প্রমাণ নয় যে, মৃত্যু ধ্বংসিত হয়েছে, ও প্রভুর ক্রুশ হলো সেটার উপরে জয়চিহ্ন স্বরূপ। আবার, একটা মরদেহের অমর পুনরুত্থান যে সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই সত্যকার জীবন খ্রিষ্ট দ্বারাই সাধিত হয়েছে, যাদের মনশ্চক্ষু সুস্থ, তাদের কাছে একথা বাহ্যিক যুক্তির চেয়ে এই সমস্ত দৃশ্যমান ঘটনা দ্বারাই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। [২] কারণ যখন মৃত্যু ধ্বংসিত হয়েছে—একথা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে—ও খ্রিষ্টের খাতিরে সকলেই মৃত্যুকে পদদলিত করে থাকে, তখন অধিক যুক্তিসঙ্গত কথা যে তিনিই প্রথম আপন দেহে মৃত্যু পায়ে মাড়িয়ে দিলেন ও ধ্বংস করলেন। আর যখন মৃত্যু তাঁর দ্বারা নিহত হয়েছে, তখন দেহ যে পুনরুত্থান করবে ও মৃত্যুর উপরে জয়চিহ্নরূপে প্রতীয়মান হবে, এছাড়া আর কীবা হতে পারত? প্রভুর দেহ যদি পুনরুত্থান না করত, তাহলে কেমন করে দেখা যেতে পারত যে এবার মৃত্যু ধ্বংসিত? তবু তাঁর পুনরুত্থান বিষয়ে এই প্রমাণ যদি কার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তাহলে চোখে যা দেখা যেতে পারে, সে কমপক্ষে তার সাহায্যেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক। [৩] কেননা যে কেউ মৃত, সে আর কিছুই করতে পারে না, আর তার স্মৃতি সেইপর্যন্ত মাত্র জীবিত থাকে, যেপর্যন্ত তাকে কবর দেওয়া হয়; তারপর স্মৃতিও নিঃশেষ হয়। যারা জীবিত, তারাই মাত্র কাজ সাধন করতে পারে ও অন্য মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই যে কেউ ইচ্ছা করে, সে দেখুক; আর যা দৃষ্টিগোচর তা

দ্বারাই সে বিচার করুক ও সত্য স্বীকার করুক। [৪] কেননা যখন ত্রাণকর্তা লোকদের মাঝে তত কাজ সাধন করে থাকেন, ও প্রতিদিন সর্বস্থানে তিনি নীরবে গ্রীক ও বর্বরদের বিরাট জনতার মন জয় করেন যাতে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয় ও সকলে তাঁর ধর্মশিক্ষা মেনে নেয়, তখন ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান যে সত্যিই ঘটেছে ও খ্রিষ্ট যে জীবিত, এমনকি তিনি যে স্বয়ং জীবন, এবিষয় সন্দেহ করার মত আর কেউ কি থাকবে? [৫] অথবা, মানুষদের বিবেকে এমন ভাবে খোঁচা দেওয়া যার ফলে সেই মানুষেরা পিতৃ-বিধিনিয়ম প্রত্যাখ্যান ক'রে (ক) খ্রিষ্টের শিক্ষায় মাথা নত করে, এটা কি মৃতব্যক্তিরই কাজ? অথবা, তিনি নিজে সক্রিয় না হলে (কেননা সেটা হলো মৃত ব্যক্তিরই চিহ্ন), তবে যারা সক্রিয় ও জীবিত ছিল, কেমন করে তিনি এমনটা করলেন যাতে তারা নিজ নিজ কাজকর্ম ত্যাগ করে, যার ফলে যে ব্যভিচারী সে আর ব্যভিচার করে না, খুণী আর খুন করে না, অন্যায়কারী আর অন্যায় করে না ও ভক্তিহীন এখন থেকে ভক্তপ্রাণ হয়ে ওঠে? (খ)। আরও, তিনি যদি পুনরুত্থান না করে থাকেন ও মৃতই হন, তবে অবিশ্বাসীরা যাদের জীবিত বলে মানে ও যে অপদূতদের তারা পূজা করে, কেমন করে তিনি সেই মিথ্যা দেব-দেবীকে ও অপদূতদের তাড়াতে, ধাওয়া করতে ও নমিত করতে পারেন? [৬] কেননা যেখানে খ্রিষ্টের নাম উচ্চারিত ও তাঁর বিশ্বাস স্বীকৃত, সেখান থেকে সমস্ত প্রতিমাপূজা উৎপাটিত, অপদূতদের সমস্ত প্রবঞ্চনা খণ্ডিত, ও কোন অপদূত সেই নাম সহ্য করে না, বরং সেই নাম শোনামাত্রই পালিয়ে যায় (গ)। এ এমন কাজ যা মৃত ব্যক্তির কাজ নয়, কিন্তু জীবিত ব্যক্তির কাজ, এমনকি ঈশ্বরেরই কাজ। [৭] যে সমস্ত অপদূতকে তাঁর দ্বারা তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ও যে সমস্ত প্রতিমাকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন, সেই সমস্ত অপদূত ও প্রতিমাকে জীবিত বলে সমর্থন করা, কিন্তু যিনি সেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ও নিজের প্রভাবে সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, এমনকি যাঁকে সকলে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তাঁকে মৃত বলে সমর্থন করা, তা সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার হত।

৩১। জীবনের চিহ্ন সম্পর্কে

[১] যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না, যাঁকে তারা মৃত বলে সমর্থন করে, যদি তাদের সেই পূজিত অপদূতেরা ও দেব-দেবী সেই খ্রিষ্টকে তাড়িয়ে দিতে না পারে বরং

সেই খ্রিষ্টই সেগুলোকে মৃত বলে প্রমাণিত করেন, তাহলে সেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের গুরুতর খণ্ডনের সম্মুখীন করে। [২] কেননা যখন একথা সত্য যে, কোন মৃত ব্যক্তি কিছুই করতে পারে না কিন্তু ত্রাণকর্তা মানুষকে ঈশ্বরভীতিতে চালনা করায়, সদ্‌গুণ বিষয়ে মানুষের মন জয় করায়, অমরতা বিষয়ে মানুষকে শিক্ষাদান করায়, স্বর্গীয় বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় মানুষকে আকর্ষণ করায়, পিতা বিষয়ে জ্ঞান মানুষের কাছে প্রকাশ করায়, মানুষের অন্তরে মৃত্যুর বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করায়, এক একজনকে নিজেকে প্রকাশ করায় ও ঈশ্বরবিহীন প্রতিমাকে ধ্বংস করায় প্রতিদিন কতগুলো কাজ না সাধন করেন, অথচ অবিশ্বাসীদের সেই দেব-দেবী ও অপদূতেরা উল্লিখিত এ সমস্ত কিছুর একটামাত্র কর্মও সম্পাদন করতে পারে না, বরং খ্রিষ্ট আসা মাত্রই সেগুলো মৃত হয়ে পড়ে ও তাদের নাটক অসার ও অর্থশূন্য হয়ে যায়; অপরদিকে ক্রুশের চিহ্নে সমস্ত জাদুকর্ম শূন্য হয়, সমস্ত প্রতিমা পরিত্যক্ত ও অস্বীকৃত হয়, যুক্তিহীন যত কামনা-বাসনা নিঃশেষিত হয় ও প্রত্যেকে নিজের চোখ পৃথিবী থেকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করে, তখন কাকে মৃত বলে ঘোষণা করা উচিত? সেই খ্রিষ্ট কি, যিনি এ সমস্ত কিছু সাধন করে থাকেন? কিন্তু সক্রিয় হওয়া, তা তো মৃত ব্যক্তির চিহ্ন নয়। নাকি তাকেই মৃত বলে ঘোষণা করা উচিত যে কোন অধিকার আদৌ রাখে না কিন্তু প্রাণহীন ভাবে শুয়ে রয়েছে? কেননা মৃত বস্তুগুলোর মত তেমনটাই হলো অপদূতদের ও প্রতিমাগুলোর চিহ্ন। [৩] কেননা ঈশ্বরের পুত্র হলেন *জীবন্ত* ও *কার্যকর* (ক) ও দিনে দিনে কাজ করেন ও সকলের পরিত্রাণ সার্থক করেন। কিন্তু মৃত্যু দৈনন্দিন শক্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যাত, ও অপদূতেরা উত্তরোত্তর প্রাণহীন হয়, যার ফলে এসমস্ত কিছু থেকে তাঁর দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে আর কেউই সন্দেহ রাখতে পারে না।

[৪] যে কেউ খ্রিষ্টের দেহের পুনরুত্থান সম্পর্কে অবিশ্বাসী, তার বিষয়ে এমনটা মনে হয়, সে ঈশ্বরের বাণী ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ। কেননা তিনি যখন সম্পূর্ণরূপেই একটা দেহ ধারণ করলেন ও যেভাবে আমাদের বক্তব্য ব্যক্ত করেছে, সেই অনুসারে তিনি যখন যুক্তিসঙ্গত ভাবে সেই দেহকে নিজেরই বলে আপন করলেন (খ), তখন তা দিয়ে প্রভুর কী করার ছিল? অথবা, বাণী সেই দেহে এসে উপস্থিত হলে তবে সেই দেহের পরিণামের কী হওয়ার কথা ছিল? তেমন দেহ মৃত্যুবরণ না করতে অক্ষম ছিল যেহেতু মরণশীল

ছিল ও সকলের হয়ে মৃত্যুর হাতে অর্পিত হয়েছিল, কেননা ঠিক এই উদ্দেশ্যেই ত্রাণকর্তা সেই দেহ নিজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু সেইসঙ্গে তেমন দেহ মৃত অবস্থায় থাকতেও পারত না যেহেতু জীবনের মন্দির হয়ে উঠেছিল। সুতরাং মরণশীল হওয়ায় সেই দেহ মৃত্যুবরণ করল, কিন্তু তার মধ্যে জীবন ছিল বিধায় পুনরুজ্জীবিত হল; এবং সেই দেহের সমস্ত কাজ হলো তার পুনরুত্থানের প্রমাণ।

৩২। খ্রিষ্টের কর্মকাণ্ডই তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ

[১] কিন্তু, তিনি অদৃশ্যমান বিধায় যখন তারা তাঁর পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখে না, তখন সেই সময় এসেছে যে সময়ে এই অবিশ্বাসীদের প্রকৃতির গতিপথ অস্বীকার করতে হবে। কেননা ঈশ্বর যে অদৃশ্যমান থাকবেন কিন্তু নিজের কর্ম দ্বারা জ্ঞাত হবেন, তা তাঁরই নিজের বিশেষ অধিকার—যেভাবে ইতিমধ্যে উপরে বলা হয়েছে। [২] তবে, যদি কোন কর্ম না থাকত, তাহলে সেই অবিশ্বাসীরা যিনি অদৃশ্যমান তাঁর প্রতি বিশ্বাস না রাখার জন্য ঠিকই করত; কিন্তু যখন এই কর্মগুলো চিৎকার করে ও তাঁকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তখন তারা যা অনস্বীকার্য কেন একগুঁয়ে হয়ে সেই পুনরুত্থানের জীবন অস্বীকার করে? যদিও মনশ্চক্ষুর দিক দিয়ে তারা অন্ধ হত, তবু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমেই তারা খ্রিষ্টের তর্কাতীত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব দেখতে পেত[ক]। [৩] কেননা একটা অন্ধ মানুষও যদি সূর্য না দেখতে পায় কিন্তু সূর্য থেকে নির্গত তাপ অনুভব করলে সে জানে যে, সূর্য পৃথিবীর ঊর্ধ্বে রয়েছে; কিন্তু তবও যারা আমাদের প্রতিবাদ করে, তারা যদিও এখনও বিশ্বাস করে না ও সত্য বিষয়ে এখনও অন্ধ, তথাপি বিশ্বাসীদের প্রভাব মেনে নিয়ে তারা যেন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব ও তাঁর সাধিত পুনরুত্থান অস্বীকার না করে। [৪] কেননা এটা অনস্বীকার্য যে খ্রিষ্ট মৃত হলে তিনি অপদূতদের তাড়াতেন না ও প্রতিমা বিনষ্ট করতেন না, কেননা অপদূতেরা একটা মৃত মানুষের প্রতি বাধ্য হত না। কিন্তু সেই অপদূতেরা যখন সুস্পষ্ট ভাবে তাঁর নাম দ্বারা বিতাড়িত, তখন এ অনস্বীকার্য যে, তিনি এক মৃত ব্যক্তি নন, বিশেষভাবে একারণে যে, মানুষের পক্ষে যা অদৃশ্য যারা তা দেখতে পায়, সেই অপদূতেরা অবশ্যই জানতে পারত খ্রিষ্ট মৃত ছিলেন কিনা ও তাঁর প্রতি আদৌ বাধ্য হতে অস্বীকার করতে পারত। [৫] তবে ভক্তিহীন মানুষ যা অবিশ্বাস করে অপদূতেরা তা দেখতে পায়, তথা খ্রিষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর। সেজন্য তারা পালায় ও তাঁর

সামনে প্রণত হয়, ও সেই একই উক্তি উচ্চারণ করে যা তখনই উচ্চারণ করেছিল যখন তিনি দেহে উপস্থিত ছিলেন, ‘আমরা জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন’ এবং *হে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন না* (খ)। [৬] অতএব, যেহেতু অপদূতেরা স্বীকার করে ও তাঁর কর্মকাণ্ড প্রতিদিন সাক্ষ্য বহন করে, সেজন্য এ স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, (এবং এবিষয়ে কেউই যেন একগুঁয়ে হয়ে সত্যকে প্রতিরোধ না করে), ত্রাণকর্তা নিজের দেহকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, ও তিনি হলেন সেই ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র যাঁর কাছ থেকে, পিতা থেকেই যেন তিনি প্রকৃত বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম রূপে উদ্গত, যিনি কালের পূর্ণতায় সকলের পরিত্রাণার্থে একটা দেহ ধারণ করলেন, জগতের কাছে পিতার বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, মৃত্যুকে বিনাশ করলেন ও পুনরুত্থানের প্রতিজ্ঞা দ্বারা (গ) সকলের উপরে অক্ষয়শীলতা প্রদান করলেন, সেই যে পুনরুত্থানের প্রথমফল (ঘ) হিসাবে তিনি নিজের দেহকে পুনরুত্থিত করলেন ও ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা সেই দেহকে মৃত্যুর উপরে ও মৃত্যুর অবক্ষয়ের উপরে জয়চিহ্ন রূপে প্রদর্শন করলেন।

৩৩। খ্রিষ্টের আগমন সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী

[১] ব্যাপারটা তেমন হলে ও দেহের পুনরুত্থানের প্রমাণ ও ত্রাণকর্তা দ্বারা মৃত্যুর উপরে সাধিত বিজয় সুস্পষ্ট হলে, তবে এসো, আমরা ইহুদীদের অবিশ্বাস ও গ্রীকদের বিদ্রূপও খণ্ডন করি। [২] কেননা হয় তো ঠিক একারণেই ইহুদীরা বিশ্বাস করে না ও গ্রীকেরা বিদ্রূপ করে যখন তারা ক্রুশের অনুপযুক্ততা ও ঈশ্বরের বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ অবজ্ঞা করে; কিন্তু উভয়ের বিপক্ষে আমরা আমাদের যুক্তি ফেরাতে দ্বিধা করি না, বিশেষভাবে একারণে যে, তাদের বিপক্ষে আমাদের সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

[৩] অবিশ্বাসী ইহুদীরা সেই পুস্তকগুলোরই ভিত্তিতে অস্বীকার করে যা তারা নিজেরাও পাঠ করে থাকে; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অনুপ্রাণিত পুস্তক বরাবরই এসমস্ত বিষয় ঘোষণা করে, ঠিক সেইভাবে যেভাবে পুস্তকগুলোর বাণীসকলও সুস্পষ্ট। কেননা নবীগণ পূর্বে কুমারী সংক্রান্ত অলৌকিক কাজ ও সেই কুমারী থেকে সেই জন্মের কথা এইভাবে পূর্বঘোষণা করেছিলেন, *দেখ, একটি কুমারী গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে; নামটির অর্থ হল,*

আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর (ক)। [৪] এবং সত্যকার মহান ব্যক্তি সেই মোশি যাঁকে তারা সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে, তিনি ত্রাণকর্তার মানবস্বরূপ ধারণ সংক্রান্ত উক্তিটা একেবারে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতেন, ও তা সত্য বলে স্বীকার করে তা এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, *যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হবে ও ইস্রায়েল থেকে একটি মানুষ উৎপন্ন হবেন, এবং তিনি মোয়াবের নেতৃবৃন্দকে ভেঙে দেবেন* (খ); আরও, *যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো, ইস্রায়েল, তোমার আবাসগুলো কেমন মনোরম। সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত, নদীর কূলে উদ্যানের মত, প্রভুর স্থাপিত তাঁবুর মত, জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত। তার বীজ থেকে বের হবেন এক মানুষ, ও তিনি বহু জাতির উপর প্রভুত্ব করবেন* (গ); আবার সেই ইশাইয়া বলেছিলেন, *বালকটির "বাপ-মা" একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই তিনি দামাস্কের প্রতাপ ও সামারিয়ার লুণ্ঠিত সম্পদ আশুরের রাজার চোখের সামনেই কেড়ে নেবেন* (ঘ)। [৫] তবে, একটি মানুষ যে আবির্ভূত হবেন, তা এ নবীদের দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, এবং যিনি আসন্ন তিনি যে হলেন সকলের প্রভু, তাও তাঁরা পূর্বঘোষণা করে বলেন, *দেখ, প্রভু দ্রুতগামী এক মেঘে চড়ে মিশরে প্রবেশ করবেন, ও মিশরের যত হাতে গড়া মূর্তিগুলো কম্পিত হবে* (ঙ)। কেননা সেখান থেকে পিতাও তাঁকে ডেকে বলেন, *আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম* (চ)।

৩৪। প্রভুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী

[১] তাঁর মৃত্যু নীরবে হয়নি, বরং শাস্ত্রে তা একেবারে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত। কেননা তাঁর মৃত্যুর কারণ, অর্থাৎ তিনি যে নিজের খাতিরে নয় কিন্তু সকলের অমরতা ও পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুভোগ করলেন, শাস্ত্র তা বর্ণনা করতে ভয় পায়নি; ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ও যে সমস্ত অসম্মান তারা তাঁর উপর চাপিয়ে দিল, তাও শাস্ত্রে বর্ণিত যাতে করে কেউই সেবিষয়ে অসচেতন না হয় বা যা ঘটেছিল সেসম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে। [২] তাই পুস্তকগুলো বলে, *এমন কষ্টভোগী মানুষ যন্ত্রণার সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয়; কেননা তাঁর মুখ ফেরানো। তিনি অসম্মানিত ছিলেন, তাঁকে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। তিনি আমাদের পাপ তুলে বহন করছেন ও আমাদের খাতিরে কষ্ট বরণ করে নিচ্ছেন; আমরা নাকি মনে করছিলাম, তিনি প্রহারিত, আঘাতগ্রস্ত ও জর্জরিত। কিন্তু তিনি*

আমাদেরই অন্যায়-অপকর্মের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন; আমাদের শঠতার জন্যই কষ্টভোগ করছিলেন; আমাদের শান্তির শাস্তি তাঁর উপরেই রয়েছে; তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম [ক]। আহা, বাণীর কৃপায় বিস্মিত হও, কেননা তিনি আমাদের খাতিরে অবজ্ঞাত হন যেন আমরা সম্মানের পাত্র হতে পারি। শাস্ত্রে বলে চলে, *আমরা সকলে মেষপালের মত পথভ্রষ্ট হয়েছি, মানুষ ভ্রান্ত পথ ধরে চলেছে, ও প্রভু আমাদের সকলের অপরাধের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন। আর তিনি কষ্টের মধ্যে ছিলেন বলে মুখ খোলেন না। তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন ও লোমকাটিয়ের সামনে মেষশাবক যেমন নীরব থাকে, তিনি তেমনি মুখ খোলেন না। তাঁর অবমাননায় তিনি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন* [খ]। [৩] তবে তাঁর কষ্টের জন্য কেউ যেন তাঁকে সাধারণ একটা মানুষ গণ্য না করে, সেজন্য শাস্ত্র মানুষদের সন্দেহ আগে থেকে উপলব্ধি করে ও তাঁর অতিমানবিক পরাক্রম ও আমাদের স্বরূপের সঙ্গে তাঁর স্বরূপের পার্থক্য তুলে ধরে বলে, *তাঁর জননের কথা কে ঘোষণা করতে পারবে? কেননা তাঁর জীবন পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করা হল, জনগণের শঠতার জন্যই তাঁকে মৃত্যুর হাতে দেওয়া হল। আমি তাঁর সমাধির বিনিময়ে দুর্জনদের, ও তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে ধনবানদের দিয়ে দেব, কারণ তিনি কোন অপকর্ম করেননি, তাঁর মুখেও ছলনার কথা পাওয়া যায়নি। এবং প্রভু তাঁর কষ্ট থেকে তাঁকে নিরাময় করতে ইচ্ছা করেন* [গ]।

৩৫। **ক্রুশ সংক্রান্ত সাক্ষ্যবাণী**

[১] কিন্তু হয় তো এমনটা হতে পারে যে, তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে তুমি তা-ও শিখতে ইচ্ছা করছ যা ক্রুশ সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা এ বিষয়টাও বাদ পড়েনি, কিন্তু সেই পবিত্র মানুষদের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। [২] কেননা, মোশিই প্রথম ক্রুশের কথা মুক্তকণ্ঠে পূর্বঘোষণা করেন যখন বলেন, *তুমি তোমার জীবনকে তোমার চোখের সামনে ঝুলতে দেখবে, ও বিশ্বাস করবে না* [ক]। [৩] ও তাঁর পরের নবীগণ এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, ‘জবাইয়ের জন্য চালিত নিরপরাধী মেষশাবকের মত আমি একথা জানতাম না। তারা আমার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্র করে বলছিল: *এসো, তার রুটিতে কাঠ দিই, জীবিতের দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করি* [খ]; [৪] আরও, *ওরা আমার হাত ও আমার পা বিঁধে ফেলেছে; আমার সকল হাড়*

গুনল। *নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল, ও আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল* (গ)। [৫] কিন্তু বায়ুলোকে সেই মৃত্যু যা বৃক্ষকাষ্ঠে হয়, তা ক্রুশ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না; আরও, অন্য কোন ধরনের মৃত্যুতেই তো হাত ও পা বিঁধিয়ে দেওয়া হয় না, কেবল ক্রুশেই তেমনটা হয়। [৬] কিন্তু যেহেতু ত্রাণকর্তার আগমনের সময় থেকে সকল জাতি সর্বস্থানে ঈশ্বরকে জানতে শুরু করেছে, সেজন্য সেই ভাববাদীগণ একথাও অঘোষিত রাখেননি, ও ঘটনাটা পবিত্র শাস্ত্রেও উল্লিখিত, *তিনি হবেন যেসের শিকড় যিনি জাতিসকলকে চালনা করার জন্য উঠে দাঁড়ান, ও তাঁর উপর জাতিগুলো প্রত্যাশা রাখবে* (ঘ)।

[৭] এই স্বল্প উদ্ধৃতাংশ নানা ঘটনার প্রমাণ, কিন্তু গোটা শাস্ত্র ইহুদীদের অবিশ্বাস-খণ্ডনে পূর্ণ। কেননা পবিত্র শাস্ত্রে উল্লিখিত যে ন্যায়বান মানুষেরা ও পবিত্র নবীগণ ও পিতৃকুলপতিগণ, তাঁদের মধ্যে কার্ দেহগত জন্ম কেবল একটি কুমারী থেকে হল? অথবা, পুরুষ ছাড়া কোন্ নারী মানুষ উৎপন্ন করতে সক্ষম হল? আবেল কি আদম থেকে জন্ম নেননি? ও এনোখ কি যারেদ থেকে, নোয়া কি লামেখ থেকে, আব্রাহাম কি তেরাহ্ থেকে, ইসহাক কি আব্রাহাম থেকে, যাকোব কি ইসহাক থেকে জন্ম নেননি? যুদা কি যাকোব থেকে এবং মোশি ও আরোন কি আমেরাম থেকে জন্ম নেননি? শামুয়েল কি এল্কানা থেকে, দাউদ কি যেসে থেকে, শলোমন কি দাউদ থেকে, হেজেকিয়া কি আহাজ থেকে, যোশিয়া কি আমোজ থেকে, ইশাইয়া কি আমোজ থেকে, যেরেমিয়া কি হিল্কিয়া থেকে ও এজেকিয়েল কি বুজি থেকে জন্ম নেননি? এঁদের এক একজনের কি নিজের জননের উদ্ভবকারী হিসাবে তাঁর আপন পিতা ছিলেন না? তবে যিনি কেবল একটি কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, তিনি কে? কেননা নবী এই চিহ্ন বিষয়ে একেবারে সূক্ষ্ম প্রমাণ দিয়েছিলেন। [৮] অথবা, কার জন্মের পূর্বে একটা তারা কি আকাশমণ্ডলে দৌড়িয়ে জগৎকে দেখাল কার্ জন্ম হয়েছিল? কেননা যখন মোশির জন্ম হয়েছিল তাঁকে পিতামাতা দ্বারা লুকোনো হয়েছিল; দাউদও নিজের প্রতিবেশীদের কাছে অচেনা ছিলেন যেহেতু মহান সেই শামুয়েল পর্যন্তও তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন ও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেসের অন্য কোন ছেলে ছিল কিনা। আরও, আব্রাহাম যখন নিজের বংশের লোকদের কাছে পরিচিত হন তখন তিনি যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টের জন্ম বিষয়ে

যদিও কোন মানুষ সাক্ষী ছিল না, তবু একটা জ্যোতিষ্ক সেই স্বর্গে আবির্ভূত হলো যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন।

৩৬। খ্রিষ্টের জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী

[১] কিন্তু যত রাজাদের মধ্যে, *"বাপ-মা" একথা উচ্চারণ করার জ্ঞান হওয়ার আগেই* (ক) কোন্ রাজা রাজ্যভার গ্রহণ করলেন ও নিজের শত্রুদের উপরে বিজয়চিহ্ন জয় করলেন? যখন দাউদ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স কি ত্রিশ বছর ছিল না? শলোমনও কি যৌবনকালেই মাত্র রাজাসনের অধিকারী হননি? যোয়াশ যখন রাজাসনের অধিকারী হন তখন তাঁর বয়স কি সাত বছর ছিল না? ও পরবর্তীকালের রাজ-অধিকার পাবার সময়ে সেই যোশিয়ার বয়স কি মোটামুটি সাত বছর ছিল না? অথচ এঁরা তেমন বয়সের মানুষ হওয়ায় 'বাপ' বা 'মা' কথাটা উচ্চারণ করতে সক্ষমই ছিলেন। [২] তবে ইস্রায়েলে ও যুদায় কে সেই রাজা (ইহুদীরাই অনুসন্ধান করুক ও আমাদের বলুক) যাঁর উপরে জাতিসকল নিজেদের প্রত্যাশা রেখে শান্তি পেল? সেই জাতিসকল বরং সব দিক দিয়ে তাদের শত্রু ছিল না? [৩] কেননা যতদিন যেরুশালেম দাঁড়াল ততদিন ধরে সেই জাতিসকল অবিরাম যুদ্ধ চালাল ও তারা সকলে ইস্রায়েলের শত্রুই ছিল; হ্যাঁ, আশুরীয়েরা তাদের অত্যাচার করত, মিশরীয়রা তাদের নির্যাতন করত, বাবিলনের লোকেরা তাদের আক্রমণ করত; ও এতে বিস্ময়কর ব্যাপার এটা যে, তাদের প্রতিবেশী সেই সিরীয়রাও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। দাউদ কি মোয়াবের অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সিরীয়দের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলেন না? যোশিয়া কি নিজের প্রতিবেশী জাতির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন না? হেজেকিয়া কি সেন্নাখেরিবের দর্পে ভয় পাচ্ছিলেন না? আমালেক কি মোশির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংগ্রাম করল না? আমোরীয়রা কি নূনের সন্তান যোশুয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত না? ও যেরিখো শহরবাসীরা কি তাঁকে প্রতিরোধ করেনি? বিজাতীয়দের ও ইস্রায়েলের মধ্যে মিত্রতা-সন্ধি আদৌ ছিল না। তাই আমাদের দেখাতে হবে সেই বিজাতীয়রা কার্ উপরেই বা প্রত্যাশা রাখল, কেননা তেমন ব্যক্তি অবশ্যই ছিলেন যেহেতু নবী যে মিথ্যা বলেছিলেন তা সম্ভব নয়। [৪] পবিত্র নবীদের ও পুরাকালের পিতৃকুলপতিদের মধ্যে কে সকলের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশে মরলেন? সকলের নিরাময়ের খাতিরে কে ক্ষত-বিক্ষত হলেন ও বিনষ্ট হলেন?

ন্যায়বান মানুষদের ও রাজাদের মধ্যে কে মিশরে নেমে গেছিলেন ও তাঁর আগমনে মিশরীয়দের প্রতিমাগুলো নিষ্ক্রিয় হল? আব্রাহাম তো সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিমাপূজা সকলের উপর নিজের প্রভাব রেখেছিল; মোশি সেইখানে জন্ম নিয়েছিলেন, অথচ যারা পথভ্রষ্ট ছিল তাদের কুসংস্কার এক বিন্দুও হ্রাস পায়নি।

৩৭। সাম ২২:১৬ ইত্যাদির সাক্ষ্যবাণী

[১] শাস্ত্রে যাদের বিষয়ে সাক্ষ্য রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কেউই আছে কি যার হাত ও পা বিঁধিয়ে দেওয়া হল, এমনকি যাকে এক বৃক্ষকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ও সকলের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশের উপরে প্রাণ দিল? আব্রাহাম খাটেই শেষ নিশ্বাস ফেলে মৃত্যুবরণ করলেন; ইসহাক ও যাকোবও নিজ নিজ খাটে পা উঠিয়ে দেবার পর মরলেন। মোশি ও আরোন এক পর্বতচূড়ায় মরলেন; দাউদ জনগণের কোন ষড়যন্ত্রের বস্তু না হয়ে এমনি নিজের বাড়িতে মরলেন, এবং যদিও সৌল তাঁকে ধাওয়া করছিলেন, তবু তিনি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে গেছিলেন। ইশাইয়াকে দু'ভাগে কাটা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁকে কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়নি; যেরেমিয়া যথেষ্ট অপমানের পাত্র হলেন, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হননি; এজেকিয়েল কষ্টভোগ করলেন, কিন্তু জনগণের খাতিরে নয়, কিন্তু একারণে যে, জনগণের যা ঘটতে যাচ্ছিল তা তিনি প্রচার করেছিলেন। [২] তাছাড়া, এঁরা যাঁরা কষ্টভোগ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মানুষ, ও তাঁরা সবাই ছিলেন এমন মানব স্বরূপের অধিকারী যা অন্য সকল মানুষের সমান; কিন্তু শাস্ত্রে যাঁর কথা ঘোষণা করে তিনি সকলের হয়ে কষ্টভোগ করবেন, তিনি তো এমনি সাধারণ মানুষ নন, বরং তিনি মানুষদের স্বরূপের সদৃশ স্বরূপের অধিকারী হয়েও সকলের জীবন বলে অভিহিত। বাস্তবিকই শাস্ত্রে বলে, *তুমি তোমার জীবনকে তোমার চোখের সামনে ঝুলতে দেখবে* (ক); আরও বলে, *তাঁর জননের কথা কে ঘোষণা করতে পারবে?* (খ)। কেননা একজন সকল পবিত্রজনের বংশধারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার উৎপত্তি থেকে তা ঘোষণা করতে পারে ও তাও ঘোষণা করতে পারে এক একজন কোন্ মানুষ থেকে জন্ম নিলেন; কিন্তু শাস্ত্রে ঘোষণা করে যে, যিনি জীবন, তাঁর জননের কথা অনির্বচনীয়।

[৩] তবে তিনি কে যাঁর বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্র তেমন কথা বলে? বা কে এত মহান যে নবীগণ তাঁর বিষয়ে তেমন কথা পূর্বঘোষণা করেন? শাস্ত্রের মধ্যে কাউকে পাওয়া যায়

না, কেবল সকলের সার্বজনীন ত্রাণকর্তাকেই পাওয়া যায় যিনি বাণী-ঈশ্বর, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট। কেননা তিনিই একটি কুমারী থেকে নির্গত হলেন, পৃথিবীতে মানুষের মত আবির্ভূত হলেন, ও নিজের মাংসে অনির্বচনীয় জননের অধিকারী। কেননা এমন কেউই নেই যে মাংস অনুযায়ী তাঁর পিতার কথা উল্লেখ করতে পারে, কেননা তাঁর দেহ একটা পুরুষ থেকে নয় কিন্তু কেবল একটি কুমারী থেকে উদ্গত। [৪] একজন যেমন দাউদ ও মোশি ও সকল পিতৃকুলপতির বংশধারার কথা বলতে পারে, তেমনি এমন কেউই নেই যে একটা পুরুষ থেকে মাংস অনুযায়ী ত্রাণকর্তার জননের কথা ঘোষণা করতে পারে। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এমনটা করলেন যেন একটা জ্যোতিষ্ক তাঁর আপন দেহের জন্মের কথা ঘোষণা করে। কেননা যেহেতু বাণী স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, সেজন্য স্বর্গ থেকে যে তাঁর একটা চিহ্নও থাকবে তা সমীচীন ছিল; এবং যেমন সৃষ্টির রাজা এগিয়ে এলেন, তেমনি সমগ্র জগৎ যে তাঁকে স্পষ্টভাবে চিনে নেবেন তা আবশ্যক ছিল। [৫] বাস্তবিকই তিনি যুদেয়ায় জন্ম নিলেন ও পারস্যরাই তাঁকে উপাসনা করতে এলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজের দৈহিক আবির্ভাবের পূর্বেও প্রতিদ্বন্দ্বী অপদূতদের উপরে জয়লাভ করলেন ও প্রতিমাপূজার উপরে বিজয়চিহ্ন অর্জন করলেন। এভাবে সকল বিজাতীয়রা সর্বত্রই নিজেদের পিতৃপুরুষদের প্রথা ও প্রতিমাগুলোর নিন্দাজনক অভক্তি পরিত্যাগ ক'রে এখন খ্রিষ্টে নিজেদের প্রত্যাশা রাখছে ও তাঁর প্রতি নিজেদের উৎসর্গীকৃত করছে; এ এমন কিছু যে এক একজন নিজের চোখে দেখতে পায়। [৬] বাস্তবিকই মিশরীয়দের নিন্দাজনক অভক্তি আগে কখনও বন্ধ হয়নি, তখনই মাত্র বন্ধ হল যখন সকলের প্রভু একটা মেঘরথেই চ'ড়ে যেন সেখানে নিজের দেহে নেমে গেলেন, প্রতিমাগুলোর ভ্রান্তি বিনাশ করলেন, ও সকল মানুষকে নিজের কাছে, ও নিজের মাধ্যমে পিতার কাছে আনলেন। [৭] তিনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে সূর্য ও গোটা সৃষ্টি ও যারা তাঁর উপর সেই মৃত্যু চেপে দিল তারাও সাক্ষীরূপে দাঁড়াতেই ক্রুশে দেওয়া হল; তাঁর মৃত্যু দ্বারা সকলের জন্য পরিত্রাণ সাধিত হল ও সমস্ত সৃষ্টি নিষ্কৃতি পেল। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি সকলের জীবন, যিনি মেষই যেন নিজের দেহকে সকলের পরিত্রাণের জন্য মুক্তিমূল্য হিসাবে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন, যদিও ইহুদীরা তা বিশ্বাস করে না।

৩৮। মাংসে ঈশ্বরের আগমন সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যবাণী

[১] কিন্তু তারা যদি এসমস্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলে মনে না করে, তাদের মন অন্য অন্য উক্তি দ্বারা জয় করা হোক; এমন উক্তি যা তাদের নিজেদের আয়ত্তেও রয়েছে। কেননা নবী কার্ বিষয়ে বলেন, *যারা আমার অনুসন্ধান করত না, আমাকে তাদের কাছে প্রকাশ করা হল; যারা আমার খোঁজ-খবর নিত না, তাদের আমি নিজেকে খুঁজে পেতে দিয়েছি; যে জাতি আমার নাম করত না, আমি তাকে বলেছি, 'এই যে আমি আছি'। আমি অবাধ্য ও বিদ্রোহী এক জাতির প্রতি আমার হাত বাড়িয়েছি* (ক)। [২] ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারত, যাঁকে প্রকাশ করা হল, তিনি কে? কারণ তিনি নিজে সেই নবী হলে তবে তারা বলুক সেই নবী কখন লুকিয়ে ছিলেন, যাতে পরে তাঁকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইনি এমন কোন্ নবী, যিনি অদৃশ্যমান হবার পর প্রকাশিত হলেন ও ক্রুশের উপরে নিজের হাত বাড়িয়েছেন? ন্যায়বান মানুষদের মধ্যে কেউই নেই, কেবল ঈশ্বরের সেই বাণীই রয়েছেন, যিনি স্বরূপে অশরীরী হয়ে তবু আমাদের জন্য একটা দেহে প্রকাশিত হলেন ও আমাদের খাতিরে কষ্টভোগ করলেন। [৩] কিন্তু তাদের জন্য তেমনটাও যথেষ্ট না হলে তবে যেহেতু তাদের অস্বীকৃতি এত স্পষ্ট, সেজন্য তাদের অন্য বচন দ্বারা নিস্তব্ধ করা হোক; কেননা শাস্ত্রে বলে, *সবল হও, দুর্বল যত হাত ও অস্থির যত হাঁটু; প্রাণে ভীরু যারা, তোমরা সান্ত্বনা পাও, সাহস ধর, ভয় করো না; দেখ, আমাদের ঈশ্বর বিচার দাবি করছেন; তিনি আসবেন ও আমাদের ত্রাণ করবেন। তখন অন্ধের চোখ খুলে দেওয়া হবে, বধিরের কান শুনতে পাবে; তখন খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে ও বোবার জিহ্বা বাকপটু হবে* (খ)। [৪] এবার তারা এবিষয়ে আর কী বলবে, বা কেমন দুঃসাহস দেখিয়ে এ বচনের সামনে প্রতিবাদ করবে? কেননা ভবিষ্যদ্বাণীটা এমনটা ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর আসছেন, ও তাঁর আগমনের চিহ্ন ও সময় প্রকাশ করে; তারা বলে যে, ঐশ্বরিক আগমনের সময়ে অন্ধেরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, খোঁড়া মানুষ লাফ দেবে, বধির শুনতে পাবে ও তোতলার জিহ্বা বাকপটু হবে। তবে তারা বলুক কোন্ সময়ে ইস্রায়েলে তেমন চিহ্ন দেখা দিল বা যুদায় কোথায় তেমন কিছু ঘটল। [৫] সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত সেই নামান শুচীকৃত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন বধির শোনেনি, খোঁড়া কোন মানুষও হেঁটে বেড়ায়নি। এলিয় ও এলিশেয় মৃত মানুষকে

পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, কিন্তু কোন জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়নি। মৃত মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু এটা এমন অলৌকিক কাজ নয় যা প্রভুর বিস্ময়কর কাজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তথাপি যখন শাস্ত্র সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত মানুষ সম্পর্কে ও সেই বিধবার ছেলে সম্পর্কে নীরব ছিল না, তখন এটা আবশ্যক ছিল যে, যদি এমনটাও হত যে একটা খোঁড়া মানুষ হেঁটে বেড়াত বা একটা অন্ধ মানুষ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত, তাহলে শাস্ত্রের বর্ণনা তাও উল্লেখ করায় বাদ দিত না। কিন্তু যেহেতু শাস্ত্রে সেবিষয়ে কোন উল্লেখ নেই সেজন্য এটা স্পষ্ট যে, তেমন কিছু আগে কখনও ঘটেনি। [৬] অতএব, যখন ঈশ্বরের বাণী নিজে দেহে আগমন করলেন, সেই সময়ে ছাড়া তেমন কিছু কখনই বা ঘটেছিল? এবং যখন সেই খোঁড়া মানুষ হেঁটে বেড়াল, সেই বোবা কথা বলতে লাগল, সেই বধির শুনতে লাগল ও সেই জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, সেসময়ে ছাড়া কখনই বা তিনি এসেছিলেন? তাই একারণে ইহুদীরাও সেসময় তেমন কিছু দেখে বলেছিল, তেমন কিছু যে আগে কখনও ঘটেছিল সেসম্পর্কে তারাও অন্য সময়ে তা শোনেনি, *জগতের আদি থেকে এমন কথা কখনও শোনা যায়নি যে, জন্মান্ধ মানুষের চোখ কেউ খুলে দিয়েছে। তিনি যদি ঈশ্বর থেকে আগত না হতেন, তাহলে কিছুই করতে পারতেন না* (গ)।

৩৯। নানা আপত্তি খণ্ডন

[১] কিন্তু এমনটাও হতে পারে যে, যা সুস্পষ্ট তা প্রতিরোধ করতে অক্ষম হওয়ায় ইহুদীরাও যা লেখা রয়েছে তা অস্বীকার করবে না, কিন্তু এমনটা বলবে যে, তারা এখনও এসমস্ত কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে ও বাণী-ঈশ্বর এখনও আসেননি। কেননা তারা তেমন কথা সর্বস্থানে রটিয়ে বেড়ায় ও যা সুস্পষ্ট তার বিপক্ষে একগুঁয়ে হয়ে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ করে না। [২] কিন্তু অন্য সব কিছুর আগে তাদের যুক্তি আমাদের দ্বারা নয়, অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান সেই দানিয়েল দ্বারাই এই একটা বিষয়ই বিশেষভাবে খণ্ডন করা হবে যিনি এই বর্তমান কাল ও ত্রাণকর্তার দিব্য আগমন কাল, এ কাল দু'টো এভাবে প্রচার করেন, *তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য, পাপ মুছে দেবার জন্য, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য, চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য, দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য, ও মহাপবিত্রজনকে তৈলাভিষিক্ত*

করার জন্য, সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে। তাই তুমি জেনে রাখ, বুঝে নাও: যেরুশালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে জনপ্রধান সেই খ্রিস্টের আগমন পর্যন্ত (ক)। [৩] অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে হয় তো এমনটা হতে পারে যে তারা কোন না কোন অজুহাত খুঁজে বের করতে পারত ও যা লেখা হয়েছিল, ভাবীকালের জন্যই তা স্থগিত করতে পারত; কিন্তু উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তারা কী বলতে পারে বা ভবিষ্যদ্বাণীটা কেমন করে আদৌ প্রতিরোধ করতে পারে? কেননা উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে খ্রিস্টকে নির্দেশ করা হচ্ছে ও যাঁকে তৈলাভিষিক্ত করা হয় তাঁকে এমনি সাধারণ একটা মানুষ বলে নয় বরং তাঁকে মহাপবিত্রজনকে বলে চিহ্নিত করা হয়; এবং তাঁর আগমন পর্যন্ত যেরুশালেমকে দাঁড়াতে হবে, ও তারপর ইস্রায়েলে নবী ও দর্শন বন্ধ হয়ে যাবে। [৪] পুরাকালে দাউদ, শলোমন ও হেজেকিয়াকে তৈলাভিষিক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু যেরুশালেম ও পবিত্রধামটা তখনও থেকে গেছিল, ও নবীরা নবীয় বাণী দিচ্ছিলেন যেমন সেই গাদ, আসাফ ও নাথান, ও তাঁদের পরে ইশাইয়া, আমোস, হোশেয়া ও অন্য অন্য নবী। আরও, যাঁদের তৈলাভিষিক্ত করা হত তাঁদের পরমপবিত্র বলে নয়, পবিত্র মানুষ বলেই অভিহিত করা হত। [৫] কিন্তু আত্মরক্ষা করার জন্য যদি তারা বন্দিত্বের বিষয় উত্থাপন করে ও সেই ভিত্তিতে এমনটা দাবি রাখে যে যেরুশালেম আর ছিল না, তাহলে নবীদের সম্পর্কে তারা আর কি বলবে? কেননা সেই পুরাকালে যখন জনগণ বাবিলনে নেমে গেছিল, তখন দানিয়েল ও যেরেমিয়া তো ছিলেন, এবং এজেকিয়েল, হগয় ও জাখারিয়া নবীয় বাণী দিতেন।

৪০। মসীহ সম্পর্কে

[১] তাই ইহুদীরা রূপকথা বলছে ও বর্তমান কালটা স্থগিত করছে। কেননা ইস্রায়েল থেকে কখন নবী ও দর্শন বন্ধ হল এই বর্তমানকাল ছাড়া যখন পরমপবিত্রজন সেই খ্রিস্ট এসে গেছেন? কেননা ঈশ্বরের বাণীর আগমনের চিহ্ন ও মহৎ প্রমাণ এটা হলো যে, যেরুশালেম আর দাঁড়ায় না, কোন নবীর উদ্ভবও আর হয় না, তাদের কাছে কোন দর্শনও প্রকাশিত হয় না, এবং ব্যাপারটা সঠিক। কেননা যাঁর আগমনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল যখন তিনি এসে গেছেন, তখন যারা সংবাদ দেয় তাদের আর কি দরকার আছে? যখন সত্য উপস্থিত, তখন ছায়ার আর কি দরকার আছে? এজন্য তাঁরা

ততক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী দিলেন যতক্ষণ না ন্যায় নিজেই আসবেন ও সকলের পাপ ক্ষমা করেন যিনি, তিনিও আগমন করবেন। এবং এজন্যই যেরুশালেম ততদিন ধরে থেকে গেল, যাতে তারা প্রথমে সেখানে সত্যের নানা ধরনের পূর্বচ্ছবি সম্পর্কে ভাবতে পারত। [৩] অতএব, যেহেতু সেই পরমপবিত্রজন উপস্থিত, সেজন্য দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী ন্যায়সঙ্গত ভাবে সীলমোহরযুক্ত করা হয়েছে ও যেরুশালেম-রাজ্য বন্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজাদের ততক্ষণ পর্যন্ত তৈলাভিষিক্ত করা হত যতক্ষণ সেই পরমপবিত্রজন তৈলাভিষিক্ত না হন; মোশিও এ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন যে, ইহুদীদের রাজ্য সেই পরমপবিত্রজনের আগমন পর্যন্ত থেকে যাবে; তিনি বলেছিলেন, *যুদা থেকে কোন রাজপুরুষের অভাব হবে না, তার কটিযুগল থেকে কোন গণশাসকেরও অভাব হবে না, যতদিন তার জন্য যা নিরূপিত তা না আসে; এবং তিনি হলেন জাতিসকলের প্রত্যাশা* (ক)। [৪] সেজন্য ত্রাণকর্তা নিজে জোর গলায় বলেছিলেন, *সমস্ত নবী ও বিধান যোহন পর্যন্তই ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছে* (খ)। তাই যদি ইহুদীদের আজ একটা রাজা বা নবী বা দর্শন থাকত, তাহলে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তাদের অস্বীকার করতে হত যে সেই খ্রিষ্ট এসে গেছেন; কিন্তু যখন তাদের কোন রাজা বা দর্শন নেই বরং সেকাল থেকে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সীল করা হয়েছে এবং শহর ও মন্দির পরাজিত হয়েছে, তখন তারা কেন এত ভক্তিহীন ও বিকৃতমনা হচ্ছে যখন যা ঘটেছে তা দেখতে পাচ্ছে অথচ সেই খ্রিষ্টকে অস্বীকার করে যিনি এসমস্ত কিছু ঘটিয়েছেন। এবং বিজাতীয়রা যে প্রতিমাগুলো ত্যাগ করছে ও খ্রিষ্টের দ্বারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরে প্রত্যাশা স্থাপন করছে, তা দেখে তারা কেন সেই খ্রিষ্টকে অস্বীকার করছে যিনি মাংসে যেসের শিকড় থেকে জন্ম নিলেন ও সেসময় থেকে রাজত্ব করছেন? কেননা যদি বিজাতীয়রা অন্য কোন দেবতাকে উপাসনা করত ও আব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব ও মোশির ঈশ্বরকে স্বীকার না করত, তাহলে ঈশ্বর যে আসেননি তেমন দাবি রাখার মত তাদের ন্যায়সঙ্গত একটা ছুতা থাকত। [৫] কিন্তু যিনি মোশিকে সেই বিধান ও আব্রাহামকে সেই অঙ্গীকার দিয়েছিলেন ও যাঁর বাণী ইহুদীরা অবজ্ঞা করেছিল, যখন বিজাতীয়রা সেই ঈশ্বরকে উপাসনা করে, তখন কেন ইহুদীরা প্রভুকে চিনে নেয় না, বা আরও সূক্ষ্মভাবে কথা বলতে গেলে কেন তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে এটা দেখতে অস্বীকার করে যে, যে প্রভুর বিষয়ে শাস্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিল তিনি

জগৎকে আলোকিত করেছেন ও জগতের কাছে দৈহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন সেইভাবে যেভাবে শাস্ত্রে বলে, *প্রভু ঈশ্বর আমাদের কাছে দেখা দিলেন* (গ), আরও, *তিনি আপন বাণী পাঠিয়ে তাদের নিরাময় করলেন* (ঘ), আরও, *সাধারণ এক দূত বা স্বর্গদূত যে তাদের ত্রাণ করল এমন নয়, কিন্তু প্রভু নিজেই তাদের পরিত্রাণ করলেন* (ঙ)।

[৬] অবস্থায় তারা মনে উন্মাদ এমন লোকের মত যে পৃথিবীকে সূর্য দ্বারা আলোকিত দেখতে পায় কিন্তু সেই সূর্য অস্বীকার করে যা সেই আলো দান করে (চ)। কেননা তারা যাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছে, তিনি এলে তাঁর করার মত আর বেশি কীবা থাকবে? তিনি কি বিজাতীয়দের আহ্বান করবেন? কিন্তু তারা আহূত হয়ে গেছে। তিনি কি ভবিষ্যদ্বাণী বা রাজাকে বা দর্শন বন্ধ করবেন? তাও হয়ে গেছে। তিনি কি প্রতিমার নিন্দাজনক অভক্তি খণ্ডন করবেন? তা খণ্ডন করা হয়ে গেছে ও দণ্ডিতও হয়েছে। তিনি কি মৃত্যুকে বিনাশ করবেন? সেটার বিনাশ হয়ে গেছে। [৭] তাই এমন কিবা করা হয়নি যা খ্রিষ্টকে করতে হবে? অথবা, অপূর্ণাঙ্গ কীবা থেকে গেছে যা ইহুদীরা এখন খুশি মনে অবিশ্বাস করে? কেননা ব্যাপারটা এমনটা হলে যে, (আর আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ব্যাপারটা ঠিক তাই), তাদের রাজা নেই, নবী নেই, যেরুশালেম নেই, দর্শন নেই কিন্তু সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরজ্ঞানে পরিপূর্ণ (ছ) ও বিজাতীয়রা অভক্তি ছেড়ে এখন বাণী তথা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট দ্বারা আব্রাহামের ঈশ্বরে আশ্রয় নেয়, তবে যারা একেবারে একগুঁয়ে মানুষ তাদেরও কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে খ্রিষ্ট এসেছেন ও তিনি এখন নিজের আলো দিয়ে একেবারে সবকিছুই আলোকিত করেছেন ও তাঁর পিতা সম্পর্কে সত্যময় ও দিব্য শিক্ষা প্রদান করেছেন। [৮] এভাবে একজন ঐশশাস্ত্র থেকে নেওয়া এ বচনগুলো ও অন্য বচনের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত ভাবে ইহুদীদের দাবিসমূহ খণ্ডন করতে পারে।

৪১। গ্রীকদের দাবি সম্পর্কে

[১] গ্রীকদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে একজন এতে অধিক বিস্মিত হয় যে, তারা এমন বিষয়ে হাসাহাসি করে যা বিদ্রূপের বিষয় নয়, ও নিজেদের সেই লজ্জাকর আচরণে তারা অন্ধ যা এমন কিছু যা তারা অনুভব করে না কেননা পাথর ও কাঠের প্রতি নিজেদের সঁপে দিয়েছে। [২] কিন্তু যেহেতু আমাদের বক্তব্য প্রমাণের দিক দিয়ে অভাবী

নয়, সেজন্য এসো, যুক্তিসঙ্গত (ক) প্রমাণ উপস্থাপন দ্বারা ও বিশেষভাবে সেটাই দ্বারা যা আমরা নিজেরা দেখতে পাচ্ছি তাদেরও লজ্জায় ফেলি। কেননা আমাদের দিকে এমন কীবা রয়েছে যা অনুপযুক্ত বা হাস্যকর? আমরা তো এমনটা দাবি করি যে বাণী-লোগোস একটা দেহে আবির্ভূত হলেন, তবে এই দাবিটাই কি অনুপযুক্ত ও হাস্যকর? কিন্তু তারা সত্যের বন্ধু হলে তবে নিজেরাও এটা মেনে নেবে যে আমাদের সেই দাবি অনুসারে যা হয়েছে তা [তথা প্রভুর মানবস্বরূপ ধারণ] অনুপযুক্ত ভাবে হয়নি। [৩] তাই, ঈশ্বরের বাণী-লোগোস যে আছেন তারা যদি সেই কথা একেবারে অস্বীকার করে, তাহলে নির্বোধের মত ব্যবহার করে কেননা এমন বিষয় বিদ্রূপ করে যা সম্পর্কে কিছুই জানে না। [৪] কিন্তু তারা যদি এমনটা স্বীকার করে যে ঈশ্বরের বাণী-লোগোস আছেন ও সেই বাণী-লোগোস হলেন সকলের শাসনকর্তা, ও তাঁর দ্বারা পিতা সৃষ্টি নির্মাণ করেছেন ও যাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা সমস্ত কিছু আলো, জীবন ও অস্তিত্ব গ্রহণ করে ও তিনি সবার উপর রাজত্ব করেন যার ফলে তাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা তিনি জ্ঞাত হন ও তাঁর দ্বারা পিতাও জ্ঞাত, তাহলে, আমি ভিক্ষা করছি, ব্যাপারটা যদি তাদের মনোযোগ না এড়ায় তবে একথা ভাব যে, তারা তাদের হাস্যকর ব্যবহার নিজেদের উপরে আনে।

[৫] গ্রীকদের দার্শনিকেরা এমনটা সমর্থন করেন যে জগৎ বড় একটা দেহ স্বরূপ; ও তাঁরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সেই কথা বলেন, কেননা আমরা অনুভব করি যে জগৎ ও তার নানা অঙ্গ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো প্রভাবিত করে। তবে, যখন ঈশ্বরের বাণী-লোগোস দেহস্বরূপ-এই-জগতে বিদ্যমান, ও তিনি সেই গোটা জগতে ও তার যত অঙ্গে প্রবেশ করলেন, তখন আমরা যখন বলি তিনি একটা মানুষে এলেন, তখন আমাদের একথায় বিস্ময়কর বা অনুপযুক্ত কি আছে? [৬] কেননা তিনি যে একটা দেহে থাকবেন তা যদি অনুপযুক্ত হত, তাহলে এটাও অনুপযুক্ত হত যে তিনি গোটা জগৎ-দেহের মধ্যে আসবেন ও নিজের পূর্বজ্ঞান দ্বারা বিশ্বকে আলো ও গতি প্রদান করবেন, কেননা বিশ্বও এক দেহ। [৭] কিন্তু জগতে আসা ও সবকিছুতে জ্ঞাত হওয়া যদি তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, তাহলে তিনি যে একটা মানব দেহে আবির্ভূত হবেন ও সেই দেহ যে তাঁর দ্বারা আলোকিত হবে ও গতি অর্জন করবে, তাও উপযুক্ত হবে। কেননা মানবজাতি গোটা সবের একটা অঙ্গ, ও

যদি সেই অঙ্গ তাঁর ঈশ্বরত্বকে জ্ঞাত করার জন্য তাঁর মাধ্যম হতে অনুপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি যে গোটা বিশ্ব জুড়ে জ্ঞাত হবার যোগ্য তাও অনুপযুক্ত হবে।

৪২। নিজেকে প্রকাশ করার জন্যই বাণী-লোগোস মানবদেহ ধারণ করলেন

[১] গোটা দেহ যেমন মানুষ দ্বারা উজ্জীবিত ও আলোকিত হয় যার ফলে যদি এমন কেউ একথা বলত যে, মানুষের শক্তি যে তার পায়ের আঙুলেও থাকবে তা অনুপযুক্ত, তাহলে সেই লোক পাগল বলে গণ্য হত যেহেতু সে এমনটা মেনে নেয় যে, মানুষ গোটা দেহে প্রবেশ করে ও কার্যকর হয় কিন্তু সে তাকে দেহের একটা অঙ্গেও থাকতে দেয় না, তেমনি যে কেউ এমনটা মেনে নেয় ও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাণী-লোগোস সবকিছুতে বিদ্যমান ও সবকিছু তাঁর দ্বারা আলো ও গতি অর্জন করে, সে এমনটা অনুপযুক্ত বলে গণ্য করবে না যে, মানবদেহও তাঁর দ্বারা আলো ও গতি অর্জন করবে। [২] কিন্তু, যেহেতু মানবজাতি সৃষ্ট হল ও শূন্য থেকে নির্মিত হল, সেজন্য তারা যখন মনে করে যে, মানুষে ত্রাণকর্তার প্রকাশ সম্পর্কে কথা বলা আমাদের পক্ষে অনুপযুক্ত, তখন তাদের পক্ষে সেই সময় এসেছে যে সময়ে তারা ত্রাণকর্তাকে সৃষ্টি থেকে একেবারে বহিষ্কার করবে যেহেতু সৃষ্টিও বাণী-লোগোস দ্বারা শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনা হয়েছিল। [৩] কিন্তু যখন সৃষ্টি সৃষ্ট হলেও তবু বাণী-লোগোস যে সেটার মধ্যে বিদ্যমান তা অনুপযুক্ত নয়, তখন বাণী-লোগোস যে একটি মানুষে বিদ্যমান থাকবেন তাও অনুপযুক্ত নয়। কেননা গোটা সেইসবই সম্পর্কে তারা যেই ধারণা সমর্থন করুক না কেন, তবু তাদের পক্ষে অঙ্গগুলো সম্পর্কেও একই ধারণা প্রয়োগ করা উচিত, কেননা, যেইভাবে উপরে বলেছি, মানুষও গোটা সেইসবের একটা অঙ্গ। [৪] তাই বাণী-লোগোস যে একটা মানুষে বিদ্যমান থাকবেন ও বিশ্ব যে বাণী-লোগোস দ্বারা ও বাণী-লোগোসের মধ্য দিয়ে আলো ও জীবন পাবে, তা আদৌ অনুপযুক্ত নয়, যেহেতু তাদের লেখকেরাও বলে, *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত* (ক)। [৫] তাই আমরা যখন বলি যে, বাণী-লোগোস নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মাধ্যম হিসাবে (খ) সেই দেহ ব্যবহার করলেন যে দেহে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তখন আমাদের একথায় হাস্যকর কী আছে? কেননা বাণী-লোগোস যদি সেই দেহে বিদ্যমান না হতেন, তাহলে সেই দেহকে ব্যবহার করতেও সক্ষম হতেন না। যখন আমরা আগে এমনটা মেনে নিই যে বাণী-লোগোস

সবকিছুতে ও প্রতিটি অঙ্গে বিদ্যমান, তখন তিনি যেখানে বিদ্যমান সেখানে যে নিজেকে প্রকাশ করতে অক্ষম, তা কেন অবিশ্বাস্য হবে? [৬] কেননা যেমন তিনি নিজের প্রভাবে প্রতিটি অঙ্গে ও সবকিছুতে বিদ্যমান রয়েছেন ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি তিনি যদি ইচ্ছা করতেন গোটা সেইসবের একটা অঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করবেন—উদাহরণ স্বরূপ, খুশি মনে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তিনি যদি সূর্য বা চন্দ্র বা আকাশ বা পৃথিবী বা জল বা আগুনের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করতেন—তবে বাণী-লোগোস যে একটা কণ্ঠ ব্যবহার ক'রে নিজেকে ও পিতাকে জ্ঞাত করেছেন তাতে কেউই এমনটা বলত না যে, বাণী-লোগোসের পক্ষে তেমন ব্যবহার অনুপযুক্ত যেহেতু বাণী-লোগোস সবকিছু ধারণ করেন ও একইসঙ্গে নিজেকে অদৃশ্যভাবে প্রকাশ ক'রে সবকিছুর সঙ্গে ও সবকিছুর মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং, যেহেতু বাণী-লোগোস বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সবকিছুকে জীবনময় করেন, ও মানুষ দ্বারা নিজেকে জ্ঞাত হবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, সেজন্য পিতাকে সত্যময় ভাবে প্রকাশ ও ঘোষণা করার জন্য তিনি যে মাধ্যম হিসাবে একটা দেহ ব্যবহার করেছিলেন, তা অনুপযুক্ত নয়। [৭] এবং যে মন মানুষের সর্বত্রই বিদ্যমান, সেই মন যেমন দেহের একটা অঙ্গ দ্বারা ব্যক্ত (আমি তো জিহ্বার কথা বলছি) ও এক্ষেত্রে কেউই এমনটা বলে না যে, তাতে মনের সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি যে বাণী-লোগোস সবকিছুতে বিদ্যমান, যখন সেই বাণী-লোগোস যে একটা মানব মাধ্যম ব্যবহার করবেন, তা অনুপযুক্ত বলে গণ্য করা উচিত নয়। কেননা, যেইভাবে আমি উপরে বলেছি, মাধ্যম হিসাবে একটা দেহ ব্যবহার করা যদি অনুপযুক্ত, তখন তিনি যে সবকিছুতে বিদ্যমান তাও অনুপযুক্ত।

৪৩। মানুষ সৃষ্টিতে ঈশ্বরকে চেনেনি বিধায়ই বাণী এলেন

[১] তবে সেই গ্রীকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, তিনি কেন সৃষ্টির ভিন্ন ও অধিক মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গ দ্বারা আত্মপ্রকাশ করেননি, অথবা, তিনি কেন সূর্য বা চন্দ্র বা তারানক্ষত্র বা আগুন বা বায়ুর মত শ্রেয়তর একটা মাধ্যম ব্যবহার করেননি কিন্তু এমনি সাধারণ একটা মানুষকে ব্যবহার করলেন, তখন তারা একথা জানুক যে, প্রভু নিজেকে দেখাতে নয়, কিন্তু কষ্টভোগী যারা তাদের নিরাময় করতে ও শিক্ষাদান করতে এলেন। [২] কেননা যে প্রকাশিত হয়, তার কাজ হলো কেবল আবির্ভূত হওয়া ও যারা তাকে

দেখে তাদের বিস্মিত করা; কিন্তু নিরাময়কারী ও শিক্ষকের কাজ কেবল আগমন করা নয়, বরং যারা অভাবী তাদের সেবা-যত্ন করা ও নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করা যেন তারা তার আত্মপ্রকাশ বরণ করতে পারে, পাছে যারা কষ্টভোগী তাদের অভাবের উপরে নিজের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা সে সেই অভাবীদের আরও বেশি কষ্ট দেয় ও ঈশ্বরের আগমন কারও উপকারে না আসে। [৩] তাই সৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল না যা ঈশ্বর সংক্রান্ত ধারণা ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ছিল, কেবল মানুষই ভ্রান্ত ছিল। তেমনি সূর্য বা চন্দ্র বা আকাশ বা তারানক্ষত্র বা সমুদ্র বা বায়ুও নিজ নিজ কক্ষপথ পরিবর্তন করল না, কিন্তু নিজেদের নির্মাতা ও রাজাকে তথা বাণীকে জেনে সেগুলো যে অবস্থায় গড়া হয়েছিল ঠিক সেই অবস্থায় থেকে গেল। কেবল মানুষই মঙ্গল থেকে দূরে সরে গেল ও সেসময় থেকে সত্যের বদলে শূন্যতা কল্পনা করল ও ঈশ্বরকে দেয় সম্মান ও ঈশ্বরজ্ঞান অপদূতদের ও পাথুরে মানুষদের কাছে অর্পণ করল।

[৪] সেজন্য যেহেতু তেমন কিছু বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার পক্ষে অযোগ্য ছিল, ও যদিও মানুষ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছিল ও বিশ্বের মাথা ছিল যেহেতু তারা তাঁকে চিনে নিতে অক্ষম ছিল, সেজন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই গোটা সেইসব থেকে নিজের জন্য মাধ্যম হিসাবে একটা অংশ, তথা একটা মানবদেহ ধারণ করলেন ও সেই দেহে প্রবেশ করলেন যাতে, যেহেতু মানুষ গোটা সেইসবে তাঁকে জানতে অক্ষম ছিল সেজন্য যেন গোটা সেইসবের একটা অংশে তাঁকে জানতে পারে, ও যেহেতু মানুষ তাঁর অদৃশ্য পরাক্রমের দিকে, ঊর্ধ্বে, নিজের দৃষ্টি উত্তোলন করতে অক্ষম ছিল, সেজন্য তারা যেন একটা সাদৃশ্যের মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি ও দেখতে সক্ষম হয়। [৫] কেননা মানুষ হওয়ায় তারা নিজেদের দেহের সদৃশ একটা দেহের মাধ্যমে ও সেটার সাধিত ঐশকর্মগুলোর মাধ্যমে আরও তাড়াতাড়ি ও আরও প্রত্যক্ষভাবে বাণীর পিতাকে জানতে পারবে, একথাই বিবেচনা ক'রে যে, বাণী-লোগোসের সাধিত কাজকর্মসমূহ মানবীয় ছিল না বরং ছিল স্বয়ং ঈশ্বরের কাজকর্ম। [৬] এবং বাণী-লোগোস যে দেহের কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞাত হবে তাদের যুক্তি অনুসারে যদি এমনটা অনুপযুক্ত হত, তাহলে বাণী-লোগোসের পক্ষেও এটা অনুপযুক্ত হত যে তিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ম থেকে জ্ঞাত হবেন। কেননা যেমন তিনি সৃষ্টিতে বিরাজমান অথচ আদৌ সৃষ্টির অংশ নন বরং সবকিছু তাঁর

পরাক্রমের অংশ, তেমনি যদিও তিনি মাধ্যম হিসাবে একটা দেহ ব্যবহার করে থাকেন, তবু কোন দৈহিক গুণাবলির অংশী হলেন না (ক) বরং নিজেই দেহকে পবিত্রিত করলেন। [৭] কেননা যখন গ্রীকদের সম্মানের পাত্র সেই প্লেটোও এমনটা বলেন যে, জগতের জন্মদাতা যিনি যখন দেখলেন জগৎ বিপদগ্রস্ত ও অসারতার দেশে ডুবে যাবার ঝুঁকির সম্মুখীন, তখন তিনি মানবাত্মার হালে স্থান নিয়ে জগৎকে সাহায্য করলেন ও তার সমস্ত দোষ সংস্কার করলেন, তখন আমরা যখন বলি যে যখন মানবজাতি পথভ্রষ্ট হলো তখন বাণী-লোগোস হালে স্থান নিয়ে মানুষের আকারে প্রকাশিত হলেন যাতে তাঁর পরিচালনা (খ) ও মঙ্গলময়তা গুণে তিনি মানবজাতিকে তার সমস্যা থেকে ত্রাণ করতে পারেন, তখন আমাদের এই কথায় অবিশ্বাস্য কীবা রয়েছে?

৪৪। মানব সৃষ্টি, মানব দশা ও মানব পরিত্রাণ

[১] হয় তো গ্রীকেরা লজ্জাবোধ করে আমাদের উপরোল্লিখিত কথায় সম্মত হবে, কিন্তু একথা বলতে চাইবে যে, যখন ঈশ্বর মানুষকে শিক্ষা দিতে ও ত্রাণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন কেবল নিজের সম্মতি দ্বারাই তেমনটা করা উচিত ছিল, ও তাঁর বাণী-লোগোসের পক্ষে কোন দেহ স্পর্শ করা দরকার ছিল না, সেইভাবে যেভাবে পূর্বে ব্যবহার করেছিলেন যখন শূন্য থেকে জগতের উৎপত্তি ঘটিয়েছিলেন। [২] কিন্তু তাদের এই আপত্তির সামনে একথাই ন্যায়সঙ্গত ভাবে বলা যেতে পারত, তথা: সেই আদিতে, যখন আদৌ কিছু ছিল না, তখন বিশ্বসৃষ্টির জন্য একটা সম্মতি ও এমনি সৃষ্টি করার ইচ্ছাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখন মানুষকে গড়া হল ও যা অস্তিত্বহীন নয় কিন্তু যা অস্তিত্বমণ্ডিত তা নিরাময় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন এর ফল এ হলো যে, যা কিছু ইতিমধ্যে হয়েছিল সেটারই মধ্যে সেই নিরাময়কারী ও ত্রাণকর্তাকে আগমন করতে হয়েছিল যাতে যা ছিল তা তিনি নিরাময় করতে পারেন। ঠিক একারণেই তিনি মানুষ হলেন ও দেহটাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করলেন। [৩] এবং সেইভাবে তেমনটা করা যদি ন্যায়সঙ্গত ছিল না, তবে বাণী-লোগোস যখন একটা মাধ্যম ব্যবহার করতে ইচ্ছা করছিলেন, তখন তিনি কী ভাবে অন্যথায় আসতে পারতেন? অথবা, কোথা থেকে তিনি সেই মাধ্যম নিতে পারতেন যদি না তা তাদেরই কাছ থেকে না নিতেন যাদের ইতিমধ্যে অস্তিত্ব হয়েছিল ও তাদেরই সদৃশ একজনের দ্বারা যাদের তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রয়োজন ছিল?

কেননা যা অস্তিত্বহীন সেটারই যে পরিত্রাণ প্রয়োজন ছিল না তা নয়, কেননা তেমনটা হলে তবে একটা আদেশ যথেষ্ট হত, কিন্তু যাকে ইতিমধ্যে গড়া হয়েছিল, সেই মানুষই অবক্ষয় ও বিনাশের দিকে যাচ্ছিল। সুতরাং বাণী-লোগোসের পক্ষে মানব মাধ্যম ব্যবহার করা ও সবকিছুতে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

[৪] তাছাড়া এটাও জানা দরকার যে, যে অবক্ষয় পদার্পণ করেছিল তা দেহের বাইরে নয়, বরং দেহের সঙ্গে যুক্তই ছিল, এবং এমনটা প্রয়োজন ছিল যে, অবক্ষয়ের বদলে জীবনই দেহের সঙ্গে দৃঢ়সংলগ্ন থাকবে যাতে যেমন মৃত্যু দেহে বিদ্যমান ছিল তেমনি জীবনও দেহে বিদ্যমান থাকে। [৫] মৃত্যু যদি দেহের বাইরে অবস্থান করত, তবে জীবনও দেহের বাইরে অবস্থান করত; কিন্তু যখন মৃত্যু দেহের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল ও তার সঙ্গে একেবারে মিলিতই যেন তার উপরে প্রভুত্ব করছিল, তখন জীবনের পক্ষেও দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হতে প্রয়োজন ছিলর্ণ (ক) যেন দেহ জীবনকে পরিধান করে অবক্ষয় তাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যথা, যদি বাণী-লোগোস দেহের অভ্যন্তরে নয় কিন্তু বাইরেই অবস্থান করত, তাহলে মৃত্যু খুব সহজে তাঁর দ্বারা পরাজিত হতে পারত, কেননা মৃত্যু জীবনকে পরাভূত না করলেও তবু দেহের সঙ্গে সংলগ্ন সেই অবক্ষয় দেহেই থেকে যেত। [৬] ঠিক এই কারণে ত্রাণকর্তা একটা দেহ পরিধান করলেন যাতে করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহ মরণশীল হওয়ায় মৃত্যুতে আর অবস্থান না করত, বরং অক্ষয়শীলতা পরিধান করার ফলে দেহ যেন পুনরুত্থান করে অমর হয়ে থাকতে পারত। কেননা দেহ একবার ক্ষয়শীলতা পরিধান করলে পুনরুত্থান করতে পারত না যদি না জীবনকে পরিধান করত। তাছাড়া, মৃত্যু নিজে থেকে দেখা দেয় না, দেহেই দেখা দেয়; সেজন্যই তিনি একটা দেহ পরিধান করলেন, যাতে দেহে উপস্থিত সেই মৃত্যুর সন্ধান পেয়ে তা নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। কেননা প্রভু কেমন করে নিজেকে জীবন বলে দেখাতে পারতেন যদি না যা মরণশীল তা সঞ্জীবিত না করতেন? [৭] আর যেমন খড় এমনিই আগুন দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু একজন খড় থেকে আগুন সরালে খড় পুড়ে না গিয়ে আগের মত খড় হয়ে থাকে, অর্থাৎ এমন খড় হয়ে থাকে যা আগুন ভয় পায় যেহেতু আগুন এমনিই খড় নিঃশেষিত করে। কিন্তু যদি একজন খড়কে যথেষ্ট 'আসবেস্তন' দিয়ে ঢেকে রাখে, যা বিষয়ে বলা হয় তা অগ্নিরোধী পদার্থ, তাহলে খড় আগুন আর ভয় পায় না যেহেতু তা

সেই অদাহ্য পদার্থের আবরণ দ্বারা সংরক্ষিত; [৮] একজন একইপ্রকারে জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে বলতে পারে যে, যদি মৃত্যু কেবল আদেশ দ্বারা দেহ থেকে দূরে রাখা যেত, তা সত্ত্বেও দেহের প্রকৃতি অনুসারে দেহটা মরণশীল ও ক্ষয়শীল থেকে যেত। কিন্তু তেমন কিছু যেন না হয় সেই উদ্দেশ্যে দেহ ঈশ্বরের অশরীরী বাণী পরিধান করল, ও এর ফলে মৃত্যু বা অবক্ষয় আর ভয় পায় না যেহেতু আবরণ হিসাবে সে সেই জীবনের অধিকারী যা দ্বারা অবক্ষয় বিনষ্ট হয়।

৪৫। গোটা সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে

[১] সুতরাং, ঈশ্বরের বাণী উপযুক্ত ভাবেই একটা দেহ নিলেন ও মানবীয় একটা মাধ্যম ব্যবহার করলেন যাতে দেহকে জীবন দান করতে পারেন ও তিনি যেমন সৃষ্টিতে নিজের কর্মকীর্তির মধ্য দিয়ে জ্ঞাত, তেমনি যেন তিনি কোন কিছুই নিজের ঈশ্বরত্ব ও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না রেখে মানুষের মধ্যেও ক্রিয়াশীল হতে পারেন ও সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। [২] কেননা আমি আগে যা বলেছি তা ধরে নিয়ে একই বক্তব্য আর একবার উপস্থাপন করছি, তথা: ত্রাণকর্তা এসমস্ত কিছু করলেন যেন, তিনি যেমন নিজের উপস্থিতিতে বিশ্বকে সর্বত্রই পরিপূর্ণ করেন, তেমনি বিশ্বকে নিজের বিষয়ে জ্ঞানেও পরিপূর্ণ করতে পারেন, যেইভাবে ঐশশাস্ত্র বলে, *নিখিল বিশ্ব প্রভুজ্ঞানে পরিপূর্ণ* (ক)। [৩] কেননা যে কেউ আকাশের দিকে চোখ উত্তোলন করতে ইচ্ছা করে, সে সেটার সুবিন্যস্ততা দেখে; কিন্তু যদিও সে আকাশের দিকে তাকাতে না পারে ও কেবল মানুষদের দিকেই মুখ তোলে, সে তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষদের উপরে তাঁর অতুল্য পরাক্রম দেখে ও স্বীকার করে যে, কেবল তিনিই বাণী-ঈশ্বর। কিন্তু যে কেউ অপদূতদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় ও সেবিষয়ে হতভম্ব হয়, সে দেখে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেন, তাতে সে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, তিনি অপদূতদের শাসক। আর সে যদি জলে নিমজ্জিত হয়ে মনে করে জলরাশিই ঈশ্বর ঠিক সেইভাবে যেভাবে মিশরীয়রা জল উপাসনা করে, তবে সে দেখে জল তাঁর দ্বারা পরিণত হয় ও তাতে সে স্বীকার করে, প্রভুই জলের স্রষ্টা। [৪] এবং যে কেউ পাতালে নেমে যায় ও যারা সেখানে নেমে গেছে সে সেই বীরদের দিকে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় তারা দেবতাই যেন, কিন্তু সে তাঁর পুনরুত্থান ও মৃত্যুর উপরে সাধিত তাঁর বিজয় দেখে, তবে সে এমনটা বিবেচনা করবে যে, তাদের মধ্যেও

কেবল খ্রিষ্টই হলেন সত্যকার প্রভু ও ঈশ্বর। [৫] কেননা প্রভু সৃষ্টির সমস্ত অংশ স্পর্শ করলেন ও সেগুলোকে সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও প্রবঞ্চনাবিহীন করলেন, যেইভাবে পল বলেছিলেন, *যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের উপরে বিজয়ী হলেন* (খ) যাতে আর কেউই আর কখনও প্রবঞ্চিত না হয় বরং সর্বস্থানে ঈশ্বরের সত্যকার বাণীর সন্ধান পেতে পারে। [৬] এভাবে মানুষ সব দিক থেকে ঘেরাগ্রস্ত হয়ে ও সর্বস্থানে তথা স্বর্গে, পাতালে ও মানুষেও বাণীর জগৎজুড়ে পরিব্যাপ্ত সেই ঈশ্বরত্ব দে'খে ঈশ্বর সম্পর্কে আর বিভ্রান্ত না হয়ে বরং কেবল বাণীকেই উপাসনা করে ও তাঁর মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে পিতাজ্ঞান অর্জন করে। [৭] তাই যুক্তিসঙ্গত (গ) এসমস্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা গ্রীকদের মনও সম্ভবত জয় করতে পারব। কিন্তু যদি তারা মনে করে, এই সমস্ত যুক্তিসঙ্গত কথা লজ্জাবোধ করার জন্য তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবে যা কিছু সকলের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট, তা দ্বারা আমাদের বক্তব্যে বিশ্বাস রাখুক।

৪৬। গ্রীকদের ধর্মরীতির বিপক্ষে (১)

[১] কোন্ সময়ই বা মানুষ প্রতিমাপূজা ত্যাগ করতে লাগল, সেই সময়ে ছাড়া যখন ঈশ্বরের সত্যকার বাণী মানুষের মাঝে আগমন করলেন? কোন্ সময়ই বা গ্রীকদের মধ্যে ও অন্য সকল স্থানে দৈববাণী বন্ধ ও শূন্য হল, সেই সময়ে ছাড়া যখন ত্রাণকর্তা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করলেন? [২] কোন্ সময়ই বা দেব-দেবী ও বীর বলে অভিহিত যারা, তারা নবীদের দ্বারা এমনি মরণশীল মানুষ বলে দণ্ডিত হতে লাগল, সেই সময়ে ছাড়া যখন প্রভু মৃত্যুর উপরে জয়ী হলেন ও নিজের ধারণ করা দেহকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করায় তা অক্ষয়শীল অবস্থায় সংরক্ষণ করলেন? [৩] কোন্ সময়ই বা অপদূতদের প্রবঞ্চনা ও পাগলামি অবজ্ঞায় পড়ল, সেই সময়ে ছাড়া যখন সকলের ও এই গ্রীকদেরও প্রভু যিনি, ঈশ্বরের পরাক্রম সেই বাণী মানুষের দুর্বলতার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে প্রসন্ন হলেন? কোন্ সময়ই বা জাদুবিদ্যা ও জাদুশিক্ষা পদদলিত হতে লাগল, সেই সময়ে ছাড়া যখন বাণীর দিব্য আত্মপ্রকাশ মানুষদের মাঝে ঘটল? [৪] এক কথায়, কোন্ সময়ই বা গ্রীকদের প্রজ্ঞা উন্মাদনা হল (ক), সেই সময়ে ছাড়া যখন ঈশ্বরের সত্যকার প্রজ্ঞা পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করলেন? কেননা পুরাকালে গোটা জগৎ ও প্রতিটি স্থান প্রতিমাপূজা দ্বারা প্রবঞ্চিত ছিল ও মানুষ মূর্তিগুলোকে দেব-দেবী ছাড়া অন্য

কিছুই গণ্য করত না। কিন্তু এখন গোটা জগৎ জুড়ে মানুষ প্রতিমাপূজা জনিত কুসংস্কার ত্যাগ করছে ও খ্রিষ্টে আশ্রয় নিচ্ছে ও তাঁকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করছে; এবং যাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, তারা খ্রিষ্টের মাধ্যমে সেই পিতাকেও চিনে নেয়। [৫] এবং যা অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়, তা হলো যে, যেখানে সহস্র সহস্র আলাদা ধর্মরীতি ছিল ও প্রতিটি স্থান নিজ নিজ দেবমূর্তির অধিকারী ছিল, এবং কারও কারও দ্বারা যা দেবতা বলে গণ্য ছিল, তা দেবতা বলে পূজিত হবার জন্য প্রতিবেশীদের মন জয় করার লক্ষ্যে নিকটবর্তী স্থানে যেতে অক্ষম ছিল; এমনকি নিজের অনুসারীদের দ্বারাও প্রায়ই পূজিত হচ্ছিল না; কেননা কেউই নিজের প্রতিবেশীর দেবতাকে পূজা করত না, কিন্তু এক একজন নিজ নিজ দেবমূর্তি রাখত একথা ভেবে যে, সেটা-ই সকলের প্রভু (খ); কেবল খ্রিষ্টকেই সবার দ্বারা এক বলে ও সর্বস্থানে একই বলে উপাসনা করা হয়। এবং প্রতিমাপূজার দুর্বলতা যা সাধন করতে অর্থাৎ প্রতিবেশীদের মন জয় করতে অক্ষম ছিল, তা সেই খ্রিষ্টই সাধন করলেন যিনি নিকটবর্তী যারা তাদের শুধু নয়, কিন্তু গোটা জগতের মন জয় করলেন যেন সবাই এক ও একই প্রভুকে ও তাঁর মধ্য দিয়ে তাঁর পিতা সেই ঈশ্বরকেও উপাসনা করে।

৪৭। গ্রীকদের ধর্মরীতির বিপক্ষে (২)

[১] পুরাকালে সর্বস্থান দৈববাণী-প্রবঞ্চনাতে পরিপূর্ণ ছিল: দেল্ফি, দদোমা, বয়েওতিয়া, লিকিয়া, লিবিয়া ও মিশরে যে যে দৈববাণী, এবং কাবেইরির উচ্চারিত দৈববাণী ও পিথিয়া নিজেও মানুষদের বিভ্রমে অধিক বিস্ময়ের বিষয় ছিল; কিন্তু এখন, যেহেতু খ্রিষ্টের কথা সর্বস্থানে প্রচারিত হচ্ছে, তাদের উন্মাদনা শেষ হয়েছে ও তাদের মধ্যে কোন দৈবজ্ঞ আর নেই। [২] আগে অপদূতেরা জলের উৎস ও নদনদী বা কাঠ ও পাথর দখল করে নিজেদের বিভ্রম দ্বারা মানুষকে প্রবঞ্চিত করত, ও এইভাবে নিজেদের চালাকির মধ্য দিয়ে সরলমনা মানুষকে বিস্মিত করত (ক); কিন্তু এখন অর্থাৎ বাণীর দিব্য আত্মপ্রকাশের পরে অপদূতদের সেই বিভ্রম শেষ হয়েছে, কেননা মানুষ শুধু ক্রুশের চিহ্ন করায়ই অপদূতদের প্রবঞ্চনা তাড়াতে পারে (খ)। [৩] পুরাকালে মানুষ এমনটা মনে করত যে, কবিদের উল্লিখিত সেই দেব-দেবী যেমন জেউস, ক্রনোস ও আপল্লোস এবং সেই বীরপুরুষেরা ছিল প্রকৃত ঈশ্বর, ও তেমন ভ্রান্তির ফলে তাদের পূজা করত। কিন্তু

এখন ত্রাণকর্তা মানুষদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করলেন, ফলত সেই তথাকথিত দেব-দেবী ও বীরগণ মরণশীল মানুষ বলেই স্বীকৃত ও মানুষদের মাঝে কেবল খ্রিষ্ট, সত্যকার ঈশ্বরের ঐশবাণীই ঈশ্বর বলে জ্ঞাত হয়েছেন। [৪] এবং মানুষদের মাঝে যা সম্মানের বিষয় হয়েছিল, সেই জাদুবিদ্যা সম্পর্কে আর কীবা বলা যেতে পারে? বাণীর আগমনের আগে সেই জাদুবিদ্যা মিশরীয়, কাল্দীয় ও হিন্দুস্তানীয়দের মাঝে প্রভাবশালী ও সক্রিয় ছিল, ও যারা তেমনটা দেখত তারা অবাক হত; কিন্তু সত্যের আগমনে ও বাণীর আত্মপ্রকাশে এই জাদুবিদ্যাও খন্ডন করা হয়েছে ও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে।

[৫] গ্রীকদের প্রজ্ঞা ও দার্শনিকদের বড় বড় কথা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আমি মনে করি, কারও জন্য আমাদের কোন বক্তব্যের প্রয়োজন হয় না, কেননা বিস্ময়কর কাজ সকলের চোখের সামনে রয়েছে, অর্থাৎ, একদিকে গ্রীকদের মাঝে জ্ঞানবান মানুষেরা তত কিছু লেখা সত্ত্বেও অমরতা ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন সম্পর্কে নিকটবর্তী অল্পসংখ্যক মানুষেরও মন জয় করতে পারেনি, অন্যদিকে খ্রিষ্ট সরল ভাষার মাধ্যমে ও বাকপটু নয় এমন মানুষদের মাধ্যমে সারা জগৎ জুড়ে জনাকীর্ণ জনসমাবেশের মানুষদের মন জয় করেছেন ও তারা ক্ষণকালীন বিষয় থেকে মন ফিরিয়ে অনন্তকালীন বিষয় বিচার-বিবেচনা করে, ও পার্থিব গৌরবের চিন্তা শূন্য মনে করে কেবল অমরতাই অন্বেষণ করে।

৪৮। খ্রিষ্টীয় জীবন: চিরকৌমার্য, সাক্ষ্যমরণ ইত্যাদি বিষয়

[১] আমাদের এই সমস্ত বক্তব্য কেবল কথায় গন্ডিবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত অভিজ্ঞতায় সত্য বলে প্রমাণসিদ্ধ। [২] হ্যাঁ, যে কেউ ইচ্ছুক সে উঠুক ও খ্রিষ্টের চিরকুমারীদের মধ্যে ও চিরকৌমার্য পালনে যে যুবকেরা বিশুদ্ধ জীবন যাপন করে তাদের মধ্যে সদ্‌গুণের প্রমাণ দেখুক ও সাক্ষ্যমরদের মহাসঙ্ঘের মধ্যে অমরতায় বিশ্বাস দেখুক। [৩] উপরে যা বলা হয়েছে, যে কেউ তা পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক, সেও এগিয়ে আসুক, ও অপদূতদের বিভ্রমের সামনে ও দৈববাণীর প্রবঞ্চনার সামনে ও জাদুবিদ্যার বিস্ময়কর কর্মের সামনে সে সেগুলো দ্বারা অবজ্ঞাত সেই ক্রুশের চিহ্ন করুক ও কেবল খ্রিষ্টনাম উচ্চারণ করুক [ক], তবেই সে দেখবে কেমন করে সেই মন্দাত্মাগুলো সেখান থেকে পালিয়ে যায়, দৈবোক্তি নীরব হয় ও সমস্ত জাদুবিদ্যা ও মায়াবিদ্যা শূন্যতায় পরিণত হয়।

[৪] তবে কে ও কোন্ ধরনের মানুষ হলেন এই খ্রিষ্ট যিনি নিজের নাম ও উপস্থিতি গুণে সবকিছু সর্বস্থানে আচ্ছাদিত করেন ও শূন্যতায় আনেন, যিনি একাই সকলের উপরে শক্তিশালী ও নিজের শিক্ষাবাণী দিয়ে গোটা জগৎকে পরিপূর্ণ বরলেন? সেই গ্রীকেরাই উত্তর দিক যারা হাসাহাসি করতে প্রীত ও সেই হাসাহাসির বিষয়ে লজ্জাবোধ করে না। [৫] কেননা তিনি মানুষ হলে তবে একটা মানুষমাত্র কেমন করে তাদের সকল দেব-দেবীর পরাক্রম অতিক্রম করলেন ও নিজের পরাক্রম দ্বারা প্রমাণ করলেন সেগুলো শূন্যতামাত্র? তারা যদি বলে, তিনি জাদুকর, তাহলে কেমন হতে পারে যে জাদুবিদ্যা একটা জাদুকর দ্বারা সুপ্রমাণিত না হয়ে বরং বিনষ্ট হয়? কেননা তিনি যদি মানবীয় জাদুকরদের পরাভূত করতেন বা তাদের একজনের উপরেই মাত্র জয়ী হতেন, তাহলে তারা ন্যায়সঙ্গত ভাবে একথা সমর্থন করতে পারত যে তিনি নিজের মহত্তর জাদু কৌশল দ্বারাই অন্যান্য জাদুকরদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। [৬] কিন্তু যখন তাঁর ক্রুশ যত জাদুবিদ্যার উপর জয়লাভ করেছে ও জাদু নামটার উপরেও জয়ী হয়েছে, তখন এ স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ত্রাণকর্তা একটা জাদুকর নন, এমনটাও দে'খে যে, যে অপদূতেরা অন্যান্য জাদুকরদের দ্বারা আহ্বান করা হয় তারাও তাঁর কাছ থেকে নিজেদের শাসকের কাছ থেকেই যেন পালিয়ে যায়। [৭] তবে তিনি কে? যাদের একমাত্র চিন্তা হলো হাসাহাসি সেই গ্রীকেরাই উত্তর দিক। হয় তো তারা এমনটা বলবে যে, তিনিও ছিলেন একটা অপদূত ও সেই অনুসারেই নিজের প্রতাপ অনুশীলন করলেন। কিন্তু তেমন কথা বললে তারা নিজেরাই হাসাহাসির বস্তু হবে, কেননা আমাদের আগেকার দেওয়া প্রমাণ দ্বারা লজ্জায় পড়বে। কেননা একটা অপদূত যে অপদূতদের তাড়াবে এ কি করে সম্ভব? [৮] কেননা তিনি যদি শুধু কয়েকটা অপদূত তাড়াতেন, তাহলে ন্যায়সঙ্গত ভাবে এমনটা অনুমান করা যেতে পারত যে তিনি অপদূতদের অধিপতির প্রভাবেই নিম্নতর শ্রেণির অপদূতদের উপর নিজের প্রতাপ অনুশীলন করছিলেন, ঠিক সেইভাবে যেভাবে ইহুদীরা যিশুকে তখনই বলেছিল যখন তাঁকে অবজ্ঞা করতে ইচ্ছা করছিল [খ]। কিন্তু যখন অপদূতদের সমস্ত পাগলামি তাড়িত হয় ও তাঁর নামে পালিয়ে যায়, তখন এ সুস্পষ্ট হওয়া উচিত যে তারা এ ব্যাপারেও ভুল করছে ও তারা তাঁর বিষয়ে যা ধরে নেয়, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু সেই অনুসারে একটা অপদূতীয় প্রভাব নন।

[৯] তাই যখন আমাদের ত্রাণকর্তা এমনি সাধারণ একটা মানুষমাত্র নন, একটা জাদুকরও নন, একটা অপদূতও নন, বরং নিজের ঈশ্বরত্ব দ্বারা কবিদের ধারণাসমূহ, অপদূতদের জনিত বিভ্রম, ও গ্রীকদের প্রজ্ঞা বিনষ্ট ও আচ্ছাদিত করলেন, তখন এ স্পষ্ট হওয়া উচিত ও সকলে এমনটা মেনে নেবে যে, পিতার বাণী, প্রজ্ঞা ও পরাক্রম হওয়ায় তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র। এজন্যই তাঁর সমস্ত কর্ম মানবীয় নয় বরং অতিমানবীয় ও তাঁর সাধিত ঘটনাগুলো দ্বারা ও মানুষদের সাধিত কর্মের সঙ্গে তুলনা দ্বারাও ঈশ্বরের সত্যকার কর্ম বলে স্বীকৃত।

৪৯। প্রভুর সঙ্গে গ্রীকদের দেব-দেবীর তুলনার ফলাফল

[১] কেননা যত মানুষ জন্ম নিয়েছে, তাদের মধ্যে কোন্ মানুষ নিজের জন্য কেবল একটি কুমারী থেকে একটা দেহ গড়েছেন? অথবা, কোন্ মানুষ কখনও এমন রোগ-ব্যাধি নিরাময় করেছে যেভাবে সকলের সার্বজনীন সেই প্রভু করেছেন? আরও, প্রকৃতির দিক দিয়ে যা অভাব, কেই বা তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে ও এমনটা করেছে যে একটা জন্মান্ধ দেখতে পারে? [২] সেই আস্ক্লেপিউসকে তারা দেবতা করেছিল কারণ সে নিরাময় কর্ম সম্পাদন করত ও দৈহিক যন্ত্রণার জন্য উদ্ভিদজাতীয় ঔষধ আবিষ্কার করেছিল; সে যে নিজেই ভূমি থেকে তা নির্মাণ করছিল তা নয়, কিন্তু তার প্রকৃতিস্থ জ্ঞানের মাধ্যমে সেই সমস্ত আবিষ্কার করছিল। কিন্তু ত্রাণকর্তা যা সাধন করছিলেন তা সেই আস্ক্লেপিউসের কর্মের সঙ্গে তুলনার যোগ্য নয়, কেননা তিনি একটা ক্ষত সারাননি বরং অস্তিত্ব প্রদান করলেন ও মানবতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। [৩] হেরাক্লেস গ্রীকদের দ্বারা দেবতা বলে পূজিত ছিল কারণ নিজের সমকক্ষ মানুষদের সঙ্গে লড়াই করত ও চালাকি করে বন্যজন্তু মারত। বাণীর সাধিত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে হেরাক্লেসের কর্মকাণ্ড এমন কি? কেননা বাণী মানুষ থেকে রোগ-ব্যাধি, অপদূত এমনকি মৃত্যুকেও তাড়িয়ে দিতেন। গ্রীকেরা দিওনিসোসকে দেবতা বলে পূজা করত কারণ সে মানুষকে নেশা শিখিয়েছিল; কিন্তু যিনি সংযম শেখালেন, তাদের দ্বারা সেই সত্যকার ত্রাণকর্তা ও সকলের প্রভু হলেন বিদ্রূপের বস্তু। [৪] কিন্তু সেই কথা থাক্। তাঁর ঈশ্বরত্বের অন্যান্য বিস্ময়কর কাজ সম্পর্কে তারা কী বলবে? কোন্ মানুষের মৃত্যুতে সূর্য অন্ধকারময় হল ও পৃথিবী কেঁপে উঠল? মানুষ তো আজও মরতে থাকে, মানুষ আগেও মরছিল; মানুষের

বেলায় কখনই বা তেমন বিস্ময়কর কাজ ঘটল? [৫] অথবা, তাঁর দেহের মাধ্যমে সাধিত কর্মকীর্তির কথা রাখা হোক ও তাঁর দেহের পুনরুত্থানের পরে তাঁর সাধিত কর্মকীর্তি স্মরণ করা হোক: যত মানুষ পৃথিবীতে এল, কাদের শিক্ষা কখনও পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্থানে ও অক্ষুণ্ন হয়ে থেকে এমনভাবে সর্ববিজয়ী হল যে তার উপাসনা গোটা জগৎ জুড়ে বিস্তৃত হল? [৬] অথবা, সেই গ্রীকেরা যেইভাবে দাবি রাখে, সেই অনুসারে খ্রিষ্ট বাণী-ঈশ্বর না হলে কিন্তু মানুষমাত্র হলে, তবে তাঁর উপাসনা কেনই বা সেই দেব-দেবী দ্বারা সেই দেশগুলোতে যেতে রোধ করা হয় না যেখানে তারা নিজেরা থাকে? বরং বাণী নিজে এলেন ও নিজের শিক্ষা দ্বারা তাদের ধর্ম বিনাশ করলেন ও তাদের বিভ্রম লজ্জায় ফেলে দিলেন।

৫০। প্রভুর পুনরুত্থান সম্পর্কে গ্রীকদের ধারণা

[১] তাঁর আগে পৃথিবীতে বহু রাজা বহু স্বৈরশাসক হয়েছে; কাল্দীয়, মিশরীয় ও হিন্দুস্তানীয়দের মধ্যে বহুজন প্রজ্ঞাবান মানুষ ও জাদুকর ইতিহাসে তালিকাভুক্ত। এদের মধ্যে কে, (আমি তো তার মৃত্যুর পরে নয় কিন্তু জীবিত থাকতেই); হ্যাঁ, কে এমন প্রভাবের অধিকারী হল যে নিজের শিক্ষায় গোটা পৃথিবী পূর্ণ করল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিমাপূজা থেকে এত বহুসংখ্যক মানুষকে নিস্তার করল যেইভাবে আমাদের ত্রাণকর্তা বহুসংখ্যক মানুষকে প্রতিমাগুলো থেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনলেন? [২] গ্রীকদের দার্শনিকেরা প্রেরণাপূর্ণ ও শৈলীতে অলঙ্কারপূর্ণ অনেক কিছু লিখেছে, কিন্তু খ্রিষ্টের ক্রুশের সঙ্গে তুলনা করলে তারা কীবা প্রমাণ করেছে? কেননা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের যৌক্তিকতা নিজের প্রেরণাপূর্ণ শক্তি বাঁচিয়ে রাখল কিন্তু তারা জীবিত থাকতেও যা শেষ কথা বলে মনে করছিল তা অন্য দার্শনিকদের কাছে বিচার্য বিষয় বলে গণ্য ছিল, এবং তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে তর্কাতর্কি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। [৩] কিন্তু ঈশ্বরের বাণী—আর এটাই হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—সরল ভাষায় শিক্ষা দিতে দিতে সেই মহা মহা তর্কবিদদের আচ্ছাদিত করলেন ও তাদের তত্ত্বসমূহ শূন্যতায় পরিণত করে সকল মানুষকে নিজের কাছে চালনা করলেন ও নিজের গির্জাগুলো পূর্ণ করলেন। এবং যেটা আশ্চর্যের বিষয় তা এ যে, মানুষ হিসাবে মৃত্যু গ্রহণ করে নিয়ে তিনি প্রতিমাপূজা বিষয়ে প্রজ্ঞাবানদের বাকপটুতা নিঃশেষিত করলেন। [৪] কেননা কার্ মৃত্যু অপদূতদের

তাড়াল বা অপদূতেরা খ্রিষ্টের মৃত্যুতে যতখানি ভীত ছিল কার্ মৃত্যুতে ততখানি ভীত ছিল? কেননা যেখানে ত্রাণকর্তার নাম (ক) উচ্চারিত, সেখান থেকে অপদূতেরা বিতাড়িত। এবং কেই বা মানুষকে তার আত্মার ভাবাবেগ থেকে এমন ভাবে মুক্ত করল যে, ব্যভিচারীরা সচ্চরিত্র হয়, খুনীরা আর খড়্গ উচ্চ করে না ও ভীরু স্বভাবের মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে? [৫] এক কথায়, খ্রিষ্টে বিশ্বাস ও ক্রুশের চিহ্ন বাদে কেই বা বর্বরদের ও বিজাতীয় অঞ্চলের মানুষদের মন জয় করল যার ফলে তারা নিজেদের উন্মাদনা ছেড়ে এখন শান্তির কথা ভাবে? অথবা, খ্রিষ্টের ক্রুশ ও তাঁর দেহের পুনরুত্থান ছাড়া আর কেই বা অমরতা সম্পর্কে মানুষকে সুনিশ্চিত করেছে? [৬] কেননা যদিও গ্রীকেরা যা কিছু বলে এসেছে তা সবই মিথ্যা ছিল, তবু নিজেদের দেব-দেবীর জাল পুনরুত্থান করতে অক্ষম ছিল যেহেতু এমনটা আদৌ ভাবত না যে মৃত্যুর পরে দেহ অস্তিত্বমণ্ডিত হয়ে থাকতে পারত। এক্ষেত্রে কেউ না কেউ তাদের সঙ্গে একমত হতে পারে, কেননা তেমন ভাবনার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের প্রতিমাগুলোর দুর্বলতা প্রমাণসিদ্ধ করল ও সেই শক্তি খ্রিষ্টের হাতে ছেড়ে দিল, যার ফলে এ দ্বারাও তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে সকলের দ্বারা জ্ঞাত।

৫১। খ্রিষ্টধর্মের সৃষ্ট নবীন মানবতা

[১] আরও, কোন্ মানুষ নিজের মৃত্যুর পরে বা জীবিত থাকতেও চিরকৌমার্য বিষয়ে শিক্ষা দিল ও এমনটা ভাবল না যে চিরকৌমার্যের পক্ষে মানুষদের মধ্যে থাকা অসম্ভব ছিল? কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা ও সবার রাজা সেই খ্রিষ্ট এবিষয়ে এতই প্রভাবশালী হলেন যে এখনও বৈধ বয়ঃপ্রাপ্ত নয় এমন বালক-বালিকাও বিধানের কথা তুচ্ছ করে চিরকৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে। [২] কোন্ মানুষ এত দূরে যাত্রা করল যে স্কুথীয়দের বা ইথিয়পীয়দের, বা পারস্যদের বা আর্মেনীয়দের, বা গোতীয়দের দেশে বা তাদেরও দেশে গিয়ে পৌঁছল যারা মহাসাগরের ওপারে বাস করে বলে কথিত আছে? বা তাদের দেশে গিয়ে পৌঁছল যারা হির্কানিয়ার ওপারে বাস করে, এমনকি সেই মিশরীয় ও কাল্দীয়দের দেশে গিয়ে পৌঁছল যারা জাদুবিদ্যা অনুশীলন করে ও একেবারে অসাধারণ ভাবে কুসংস্কারবাদী ও আচরণে-ব্যবহারে বন্য? কেই বা তেমনটা করলেও সদ্গুণ, আত্মসংযম ও প্রতিমাপূজা বিরুদ্ধ শিক্ষা প্রচার করতে সক্ষম হল যেইভাবে এতে সক্ষম

হলেন সবার প্রভু, ঈশ্বরের পরাক্রম, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট? [৩] কেই বা নিজের শিষ্যদের দ্বারা শুধু নয়, কিন্তু তাদের মনও জয় করলেন যাতে তারা নিজেদের আচার-আচরণের নিষ্ঠুরতা ছেড়ে নিজেদের পিতৃপুরুষদের দেব-দেবীর উপাসনাকর্ম আর পালন না করে বরং তাঁকেই স্বীকার করে ও তাঁর মধ্য দিয়ে পিতাকে উপাসনা করে? [৪] কেননা সেই গ্রীকেরা ও সেই বর্বররা যখন প্রতিমাপূজা করত, সেই পুরাকালে তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ চালাত ও নিজেদের আত্মীয়দের প্রতিও নিষ্ঠুর ছিল। কেননা নিজেদের মধ্যে তেমন হত্যাকাণ্ডের কারণে এমন কেউই আদৌ ছিল না যে খড়্গা হাতে না করে স্থলভূমি বা সমুদ্র পার হত। [৫] হ্যাঁ, তাদের সারা জীবন অস্ত্র দ্বারাই চিহ্নিত ছিল, তাদের জন্য খড়্গা যষ্টির (ক) ও রক্ষাকারী অবলম্বনের (খ) স্থান পেত। কিন্তু, যেমনটা উপরেও বলেছি, তারা প্রতিমাপূজা করত ও অপদূতদের উদ্দেশে বলিদান করত, কিন্তু যারা তেমনটা ভাবত, তারা নিজেদের প্রতিমাপূজার জনিত কুসংস্কারের মাধ্যমে শ্রেয়তর কিছু শিখতে অক্ষম ছিল। [৬] কিন্তু যখন তারা খ্রিষ্টের শিক্ষার দিকে মন ফেরাল, তখন কেমন যেন হৃদয়ে-মনে বিদ্ধ হয়ে (গ) তারা খুনের নিষ্ঠুরতা ছেড়ে ও যুদ্ধের কথাও বাদ দিয়ে বরং সেসময় থেকে তাদের সমস্ত চিন্তা এখন শান্তিতে সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ।

৫২। অপদূতদের জনিত যুদ্ধ-সংগ্রাম খ্রিষ্টধর্ম দ্বারা প্রশমিত

[১] তবে যে তেমনটা করেছে, সে কে? অথবা সে-ই কে যে একে অন্যকে যারা ঘৃণা করত তাদের শান্তিতে আবদ্ধ বরল? আপন ভালবাসায় যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য সবকিছু বরণ করলেন, কেবল পিতার প্রিয় পুত্র, সবার সার্বজনীন ত্রাণকর্তা সেই যিশুখ্রিষ্টই তেমনটা করলেন। তিনি যে শান্তি আনলেন, সেবিষয়ে পুরাকাল থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হয়েছিল, যেইভাবে শাস্ত্রে বলে, *তারা নিজেদের খড়্গা পিটিয়ে পিটিয়ে করবে লাঙলের ফলা, নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে। এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়্গা উঁচু করবে না, তারা রণশিক্ষাও আর করবে না* (ক)। [২] এবং তেমনটা অবিশ্বাস্য বিষয় নয়, কেননা যাদের অন্তরে নিষ্ঠুর আচরণ রোপিত, সেই বর্বরেরা এখনও প্রতিমার উদ্দেশে বলি নিবেদন করে, একে অন্যের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত হয় ও এক মুহূর্ত মাত্রও খড়্গা ছাড়া থাকতে পারে না। [৩] কিন্তু তারা যখন খ্রিষ্টের শিক্ষা শোনে, তখনই যুদ্ধকে

চাষাবাদে ফেরায়, তাদের হাত খড়্গা-সজ্জিত না করে বরং প্রার্থনায় হাত প্রসারিত করে, এবং, এক কথায়, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না চালিয়ে এখন থেকে দিয়াবল ও অপদূতদের বিরুদ্ধেই বরং নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত ক'রে আত্মসংযম ও আত্মিক সদ্‌গুণের অস্ত্র দ্বারা তাদের বশীভূত করে। [৪] এটাই ত্রাণকর্তার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ; হ্যাঁ, মানুষ প্রতিমা থেকে যা শিখতে অক্ষম ছিল, তা তাঁরই কাছ থেকে শিখেছে। এবং এটা যে প্রতিমাগুলো ও অপদূতদের দুর্বলতা ও শূন্যতা বিষয়ে সামান্য খণ্ডন তা নয়। কেননা অপদূতেরা নিজেদের দুর্বলতা জানত বিধায়ই পুরাকালে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাত পাছে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করলে অপদূতদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। [৫] তাই যারা খ্রিষ্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে তারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ না চালিয়ে বরং নিজেদের সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবনধারণ ও কাজকর্ম দ্বারা অপদূতদের প্রতিরোধ করার জন্য একতাবদ্ধ হয় ও সেগুলোকে পালাতে বাধ্য করায় তাদের অধিপতি সেই দিয়াবলকে বিদ্রূপ করে। তাই তারা যৌবনকালে সংযমী, প্রলোভনের সময়ে নিষ্ঠাবান, ক্লেশের দিনে সহিষ্ণু; তারা অপমান সহ্য করে ও অভাব তুচ্ছ করে। এবং যা সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় তা হলো এ: তারা মৃত্যুকেও অবজ্ঞা করে ও খ্রিষ্টের সাক্ষ্যমর হয়ে ওঠে।

৫৩। খ্রিষ্টীয় শিক্ষা বিজাতীয়দের ঐতিহ্যে পরিবর্তন আনে

[১] এখন ত্রাণকর্তার ঈশ্বরত্ব বিষয়ে এমন প্রমাণ উল্লেখ করা হবে যা একেবারে আশ্চর্যজনক। কোন্ মানুষ বা জাদুকর, অথবা কোন্ স্বৈরশাসক বা রাজা সেইভাবে নিজের উপরে এসমস্ত কিছু আরোপ করতে সক্ষম হল ও সমস্ত প্রতিমাপূজা ও অপদূতদের গোটা সেনাবাহিনী, সমস্ত জাদুবিদ্যা ও সেই গ্রীকদের সমস্ত প্রজ্ঞার বিরুদ্ধ যুদ্ধ চালাল যারা খুবই শক্তিশালী ও এখনও বিস্ময়কর ভাবে প্রভাবশালী, ও এক সংগ্রামেই মাত্র তাদের সকলকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হল যেভাবে আমাদের প্রভু, ঈশ্বরের সেই সত্যকার বাণী করলেন যিনি অদৃশ্যভাবে তাদের এক একজনের ভ্রান্তি খণ্ডন করলেন ও একাই করে তাদের হাত থেকে সকল মানুষকে লুট করে নিলেন যাতে করে যারা প্রতিমা পূজা করত তারা এখন সেগুলোকে পায়ে মাড়িয়ে দেয়, যারা জাদুবিদ্যার বিভ্রমের অধীন ছিল তারা এখন সেই সমস্ত পুঁথিপত্র পুড়িয়ে দেয় (ক), ও প্রজ্ঞাবান যারা তারা অন্য সবকিছুর চেয়ে সুসমাচারের ব্যাখ্যা পছন্দ করে? [২] কেননা

যেগুলো তারা একসময় পূজা করত, তারা এখন সেগুলোকে ত্যাগ করে, কিন্তু যাঁকে তারা বিদ্রূপ করত, তারা এখন সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে উপাসনা করে ও তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে। এবং তাদের তথাকথিত দেব-দেবীকে ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা বিতাড়িত, কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ ত্রাণকর্তা সারা জগৎ জুড়ে ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষিত। গ্রীকেরা যে দেবতাগুলোকে পূজা করত, তারা সেগুলোকে লজ্জাকর বস্তু বলে নিন্দা করে, ও সেইসঙ্গে যারা খ্রিষ্টের শিক্ষা মেনে চলে তারা ওদের চেয়ে আরও বেশি শুদ্ধতর জীবন ধারণ করে।

[৩] তবে, তেমন কিছু ও তেমন কাজকর্ম মানবীয় হলে তবে যে কেউ ইচ্ছুক সে এ ঘটনাগুলোর মত আগেকার ঘটনাগুলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করুক ও সেই বিষয়ে আমাদের মন জয় করুক। কিন্তু সেই ঘটনাসমূহ মানবীয় নয় বলে পরিগণিত হলে, (কেননা সেই ঘটনাসমূহ প্রকৃতপক্ষে মানবীয় নয় কিন্তু ঈশ্বরেরই সাধিত ঘটনাসমূহ), তবে অবিশ্বাসীরা কেনই বা এতই ভক্তিহীন হয় যে, যিনি তাদের গড়েছেন সেই নিয়ন্তাকে তারা চিনে নিতে পারে না? [৪] কেননা তারা সেই একই অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থায় এমন একজন আছে যে সৃষ্টিকর্ম থেকে সেই সৃষ্টিকর্মের স্রষ্টা ঈশ্বরকে চিনে নিতে পারে না। কেননা তারা যদি তাঁর সার্বিক পরাক্রম থেকে তাঁর ঈশ্বরত্বকে চিনে নিয়ে থাকত, তাহলে তারা এও জেনে থাকত যে, দেহে সাধিত খ্রিষ্টের কর্মসমূহ মানবীয় নয় বরং সবার ত্রাণকর্তা, ঈশ্বরের সেই বাণীরই কর্ম ছিল, ও পল যেইভাবে বলেন, *তারা যদি একথা জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না* (খ)।

৫৪। ঐশবাণীর নানা কর্ম

[১] ব্যাপারটা এমন, ঠিক যেন একজন যে সেই ঈশ্বরকে দেখতে ইচ্ছা করে যিনি স্বরূপে অদৃশ্যমান ও কোন ভাবে দৃশ্যমান নন; সে তাঁর কর্ম থেকে তাঁকে উপলব্ধি করে ও জানে; সেই অনুসারে যে কেউ নিজের মনশ্চক্ষুতে খ্রিষ্টকে দেখে না, সে তাঁর দেহের সাধিত কর্ম থেকেই তাঁর বিষয়ে শিখে নিক, ও পরীক্ষা করুক সেই কর্মগুলো মানবীয় নাকি ঐশ্বরিক কর্ম। [২] সেই কর্মগুলো মানবীয় হলে তবে সে বিদ্রূপ করুক, কিন্তু সেগুলো মানবীয় বলে নয় বরং ঐশ্বরিক বলে মেনে নেওয়া হলে, তবে যা বিষয়ে বিদ্রূপ করা অনুচিত সে সেই বিষয়ে হাসাহাসি না করুক, বরং সে এতে বিস্মিত হোক যে,

তেমন ঐশ্বরিক বিষয় তত সামান্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে; এতেও বিস্মিত হোক যে, অমরতা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলের কাছে এল ও বাণী মানুষ হওয়ার মাধ্যমে [ঈশ্বরের] সার্বিক পূর্বজ্ঞান ও তাঁর অগ্রনায়ক ও নির্মাতাকে তথা ঈশ্বরের স্বয়ং বাণীকে জ্ঞাত করা হয়েছে। [৩] কেননা তিনি মানুষ হলেন যেন আমরা ঈশ্বর হতে পারি, ও তিনি একটা দেহের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করলেন যেন আমরা অদৃশ্যমান পিতার বিষয়ে একটা ধারণা পেতে পারি, এবং তিনি মানুষ থেকে অপমান মেনে নিলেন যেন আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে অক্ষয়শীলতা পেতে পারি (ক)। তিনি নিজে কোন ভাবে বিক্ষত হননি যেহেতু তিনি যন্ত্রণাতীত, অক্ষয়শীল, প্রকৃত বাণী ও ঈশ্বর, কিন্তু তিনি কষ্টভোগী মানুষদের প্রতি যত্নশীল হলেন ও তাদেরই ত্রাণ করলেন যাদের খাতিরে নিজের যন্ত্রণাতীত অবস্থা দ্বারা এসব কিছু বরণ করলেন। [৪] এক কথায়, তাঁর মানুষ হওয়ার মাধ্যমে ত্রাণকর্তার সাধিত কৃতিত্বসমূহ এমন ধরনের ও এমন মহৎ যে, যে কেউ সেগুলো ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করত, সে তাদেরই মত হত যারা সমুদ্রের ব্যাপক প্রশস্ততার দিকে তাকিয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুনতে ইচ্ছা করত। কেননা যেমন একজন নিজের চোখে সকল ঢেউ ধারণ করতে পারে না যেহেতু ঢেউগুলোকে যে গুনতে চেষ্টা করে, ধারাবাহিক ঢেউগুলো তার উপলব্ধি-শক্তি এড়ায়, তেমনি দেহে খ্রিষ্টের সাধিত কৃতিত্বসমূহ যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, সেও নিজের গণনায় সেই সবগুলো ধারণ করতে অক্ষম, কেননা যেগুলো তার মনের সামনে দিয়ে বয়ে যায়, সে যা ধারণ করেছে বলে মনে করে, তার চেয়ে সেগুলো অনেক বেশি। [৫] সুতরাং, একজন যা আংশিক ভাবেও ব্যক্ত করতে পারে না, সেটার পূর্ণতা না দেখা বা সেবিষয়ে কথা না বলা ভাল; বরং পূর্ণতা সম্পর্কে বিস্মিত হয়ে থেকে কেবল একটামাত্র অংশ উল্লেখ করা-ই বাঞ্ছনীয়। কেননা সেই সবকিছুই আশ্চর্যজনক, ও যেই দিকে একজন তাকায়, সে একেবারে বিস্মিত হয়ে সেইখানে বাণীর ঈশ্বরত্ব দেখতে পায়।

৫৫। সত্যকার রাজার উপস্থিতি

[১] সুতরাং, উপরে যা বলা হয়েছে, সেটার পরে যা কিছু অব্যক্ত থেকে যায় সেটার বিষয়ে নিয়ম হিসাবে এটাই তোমাকে শিখতে ও বিবেচনা করতে হবে ও তাতে অধিক বিস্মিত হতে হবে, তথা, যখন ত্রাণকর্তা এলেন তখন প্রতিমাপূজা আর বৃদ্ধি পায়নি,

এমনকি যা ছিল তাও কমছে ও ক্রমশ নিঃশেষিত হচ্ছে। গ্রীকদের প্রজ্ঞাও আর অগ্রসর হচ্ছে না বরং সেই প্রজ্ঞার যা কিছু এখনও রয়েছে তাও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এবং অপদূতেরা বিভ্রম, দৈববাণী ও জাদু দ্বারা আর কাউকে প্রবঞ্চিত করে না, কিন্তু যেইমাত্র তা করতে সাহস করে ও চেষ্টা করে, ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা তাদের লজ্জায় ফেলে দেওয়া হয়। [২] অবস্থাটা স্বল্প কথায় ব্যক্ত করতে গেলে, দেখ কেমন করে ত্রাণকর্তার শিক্ষা সর্বস্থানে বৃদ্ধি পায় ও সেইসঙ্গে সমস্ত প্রতিমাপূজা ও যা কিছু খ্রিষ্টবিশ্বাসের বিরুদ্ধ তা দিনে দিনে কমতে থাকে, দুর্বল হয় ও পতিত হয়। এবং তেমনটা দেখে *সবার উপরে যিনি* (ক) সেই ত্রাণকর্তাকে ও পরাক্রমী বাণী-ঈশ্বরকে উপাসনা কর, কিন্তু তিনি যাদের কমতি ঘটান ও নিঃশেষিত করেন তাদের নিন্দা কর। [৩] কেননা যেমন সূর্য উপস্থিত হলে (খ) অন্ধকার আর কোন শক্তির অধিকারী হয় না কিন্তু কিছুটা অন্ধকার কোথাও এখনও থাকলেও তা বিতাড়িত হয়, তেমনিভাবে এখন যে বাণী-ঈশ্বরের দিব্য আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, প্রতিমাপূজার জনিত অন্ধকার শক্তিহীন হয়েছে, কিন্তু জগতের সমস্ত অংশ সর্বস্থানে তাঁর শিক্ষা দ্বারা আলোকিত হয়। [৪] এবং কেউ না কেউ রাজা হলে (গ) ও তাঁকে কোথাও দেখতে না পারলেও তিনি কিন্তু নিজের প্রাসাদে থাকলে যেমন প্রায়ই বিদ্রোহী মানুষেরা তার অনুপস্থিতিকে সুযোগ করে নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করে ও তারা এক একজন নিজেকে রাজা বলে ভান করে সরল মানুষদের প্রবঞ্চিত করে, ও সেইভাবে মানুষেরা একটা নাম দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় যেহেতু তারা শোনে একটা রাজা আছেন কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না কারণ তারা সম্ভবত প্রাসাদে ঢুকতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত রাজা এগিয়ে এলে ও প্রকাশ পেলে প্রবঞ্চনাকারী সেই বিদ্রোহীরা তাঁর উপস্থিতি দ্বারা অস্বীকৃত হয় ও শহরবাসীরা প্রকৃত রাজাকে দেখে আগেকার প্রবঞ্চনাকারীদের প্রত্যাখ্যান করে, [৫] তেমনিভাবে অপদূতেরা ও মানুষেরা পুরাকালে প্রবঞ্চনা অনুশীলন করল ও ঈশ্বরকে দেয় সম্মান নিজেদের উপর আরোপ করল, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী দেহে প্রকাশিত হলে পর ও নিজের পিতাকে আমাদের কাছে জ্ঞাত করলে পর অপদূতদের প্রবঞ্চনা অদৃশ্য ও নিঃশেষিত হলে মানুষ পিতার প্রকৃত দিব্য বাণীর দিকে তাকিয়ে প্রতিমাগুলো প্রত্যাখ্যান করে ও এখন থেকে প্রকৃত ঈশ্বরকে চিনে নেয়। [৬] আচ্ছা, এটাই প্রমাণ যে খ্রিষ্ট হলেন বাণী-ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পরাক্রম। কেননা যেহেতু এসমস্ত

মানবীয় জিনিস বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু খ্রিষ্টের বাণী থেকে যায়, সেজন্য সকলের কাছে এটা স্পষ্ট যে, যে যে জিনিস বন্ধ হয় সেগুলো ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যিনি থেকে যান তিনি ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্যকার পুত্র, ও তাঁর একমাত্র জনিত বাণী।

৫৬। শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রভুর দ্বিতীয় আগমন ও শেষ বিচার

[১] হে খ্রিষ্টপ্রেমিক, এই গোটা বক্তব্যকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে খ্রিষ্টবিশ্বাসের ও তাঁর দিব্য আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত বলে তোমাকে অর্পণ করছি। কিন্তু এই বক্তব্য যা উপস্থাপন করে তুমি যদি সেই সুযোগ গ্রহণ কর ও শাস্ত্রের বাণী পাঠ করে সেই বাণীসকলের উপর তোমার মন সত্যিকারে রত রাখ, তাহলে সেই বাণীগুলো থেকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ও আরও স্পষ্ট ভাবে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা শিখতে পারবে। [২] কেননা শাস্ত্র ঈশ্বর দ্বারা উচ্চারিত ও লিখিত হয়েছিল এমন মানুষদের মাধ্যমে যাঁরা ঐশতত্ত্বে নিপুণ; এবং আমরা যা শিখেছি তা ঐশতত্ত্বের সেই শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখেছি যাঁদের শিক্ষা শাস্ত্রে পাওয়া যায় ও যাঁরা ছিলেন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের সাক্ষী; এবং যে জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি তা তোমার নিজের শেখার আগ্রহের কাছে হস্তান্তর করছি। [৩] তুমি তাঁর সেই দ্বিতীয় গৌরবময় ও সত্যিই দিব্য আবির্ভাবের কথাও শিখতে পারবে যখন তিনি সরল ভাবে আর নয় (ক) কিন্তু তাঁর নিজের গৌরবে আগমন করবেন: সেসময় তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে আর নয়, কিন্তু তাঁর আপন ক্রুশের ফল সকলের উপর বর্ষণ করতে আগমন করবেন—আমি পুনরুত্থান ও অক্ষয়শীলতারই কথা বলছি; আরও, তিনি বিচারাধীন অবস্থায় আর নয়, কিন্তু সকলকে দেহে যে যার কৃত কর্ম অনুযায়ী, সেই কর্ম ভাল বা মন্দ হোক সেই কর্ম অনুযায়ীই বিচার করতে আগমন করবেন, যার ফলে সৎমানুষদের জন্য স্বর্গরাজ্য, কিন্তু যারা অপকর্ম সাধন করেছে তাদের জন্য অনন্ত আগুন ও বাইরের অন্ধকার সংরক্ষিত। [৪] কেননা তেমনটা প্রভু নিজেই বলেন, *আমি আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে ও আকাশের মেঘে করে পিতার গৌরবে আসতে দেখবেন* (খ)। [৫] এবং ঠিক এই কারণেই সেই উক্তি পরিত্রাণদায়ী যা সেদিনের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে ও বলে, *তৈরী হও ও জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না* (গ)। কেননা ধন্য পল অনুসারে *আমাদের সকলকেই*

খ্রিষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায় (ঘ)।

৫৭। জ্ঞান ও জীবন বৃক্ষের ফল ভোগ করা

[১] কিন্তু শাস্ত্র সংক্রান্ত অধ্যয়ন ও প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সৎজীবন, শুদ্ধ প্রাণ ও খ্রিষ্ট অনুযায়ী সদ্‌গুণও প্রয়োজন (ক), যাতে মন যা বাসনা করে, এ পথে চলেই তা অর্জন ও উপলব্ধি করতে পারে; অবশ্যই সেইটুকু যা মানব প্রকৃতি ঈশ্বরের বাণী সম্পর্কে শিখতে সক্ষম। [২] কেননা শুদ্ধ মন ও পবিত্রজনদের জীবনের আদর্শ অনুযায়ী গড়া জীবন না থাকলে কেউই পবিত্রজনদের বাণীর অর্থ ধরতে পারে না। [৩] কেননা যেমন যে কেউ সূর্যের আলো দেখতে ইচ্ছা করে (খ) সে নিজের চোখ মোছে ও পরিষ্কার করে, ও চোখ ততক্ষণ শুদ্ধ করতে থাকে যতক্ষণ সে যা ইচ্ছা করে চোখটা সেটার মত হয় যাতে করে চোখ আলোময় হয়ে উঠে সূর্যের আলো দেখতে পায়; অথবা, যেমন যে কেউ একটা শহর বা দেশ দেখতে ইচ্ছা করে সে সেই দৃষ্টি পাবার জন্য সেখানে যায়, তেমনি যে কেউ ঐশতত্ত্ববিদদের মন উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করে তাকে আগে নিজের আচরণ দ্বারা নিজের আত্মাকে পরিষ্কার ও ধৌত করতে হয় ও পবিত্রজনদের কাজকর্মের অনুকরণে পবিত্রজনদের কাছে এগিয়ে যেতে হয় যাতে করে নিজের জীবনধারণের মধ্য দিয়ে সে তাঁদের সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করতে পারে যা ঈশ্বর দ্বারা তাঁদের প্রকাশিত হল, ও তাঁদের সঙ্গে সংযুক্তই যেন সেসময় থেকে সে যেন সেই বিপদ এড়াতে পারে যা পাপীদের হুমকি দেয় ও সেই আগুনও এড়াতে পারে যা বিচারের দিনে সেই পাপীদের নিঃশেষিত করে, এর ফলে স্বর্গরাজ্যে পবিত্রজনদের জন্য যা সংরক্ষিত রয়েছে সে যেন তা গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ তা-ই গ্রহণ করতে পারে *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি* (গ), হ্যাঁ, সে যেন সেই সমস্ত কিছু পেতে পারে যা তাদেরই জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা সদ্‌গুণ পালনে জীবনযাপন করে ও ঈশ্বরকে ও পিতাকে ভালবাসে, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টে, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পবিত্র আত্মায় স্বয়ং পুত্রের সঙ্গে পিতার কাছে সম্মান ও প্রতাপ ও গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে, আমেন।

১ (ক) 'এই লেখার পূর্ববর্তী অংশে', অর্থাৎ 'গ্রীকদের বিপক্ষে' লেখাটা।

(খ) প্রেরিত ১৭:২৮ দ্রঃ।

(গ) মথি ১৯:২৬ দ্রঃ।

(ঘ) বাক্যটা সাধু আথানাসিউসের মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের বিশেষ একটা দিক তুলে ধরে।

২ (ক) মথি ১৯:৪-৬ দ্রঃ।

(খ) যোহন ১:৩ দ্রঃ।

৩ (ক) আদি ১:১ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাধু আথানাসিউস যে 'পালক' নামক পুস্তককে বাইবেলের একটা পুস্তক বলে মনে করেন এমন নয়; কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকের সঙ্গে 'পালক' পুস্তকও উপকারী মনে করেন।

(গ) পালক ২৬:১ দ্রঃ (প্রৈরিতিক পিতৃগণ দ্রঃ)।

(ঘ) হিব্রু ১১:২ দ্রঃ।

(ঙ) আদি ২:১৬-১৭, সত্তরী পাঠ্য।

৪ (ক) রো ৫:১৪ দ্রঃ।

(খ) প্রজ্ঞা ৬:১৮।

(গ) সাম ৮২:৬-৭, সত্তরী পাঠ্য।

৫ (ক) প্রজ্ঞা ২:২৩-২৪।

(খ) সাধু আথানাসিউস বার বার এধারণা তুলে ধরেন যে, প্রভুর মাংসধারণ এসমস্ত অপকর্ম নিরাময় করল (৩০, ৪৮, ৫২ অধ্যায় দ্রঃ)।

(গ) রো ১:২৬-২৭।

৬ (ক) আদি ২:১৫ দ্রঃ।

৮ (ক) প্রেরিত ১৭:২৭ দ্রঃ।

(খ) রো ৬:৮ দ্রঃ।

৯ (ক) ১ করি ১৫:৫৪ দ্রঃ।

১০ (ক) ২ করি ৫:১৪-১৫ দ্রঃ।

(খ) হিব্রু ২:৯।

(গ) হিব্রু ২:১০।

(ঘ) হিব্রু ২:১৪-১৫।

(ঙ) ১ করি ১৫:২১-২২।

(চ) ১ তি ৬:১৫; তীত ১:৩ দ্রঃ।

১১ (ক) ঈশ্বরজ্ঞান মানুষের প্রাণের শুচিতা অনুযায়ী হয়; এক্ষেত্রে গ্রীকদের বিপক্ষে ২:২ দ্রঃ।

(খ) রো ১:২৫ দ্রঃ।

(গ) গ্রীকদের বিপক্ষে, ৮-৯ অধ্যায় দ্রঃ।

১২ (ক) গ্রীকদের বিপক্ষে ২:১ দ্রঃ।

(খ) 'পবিত্রজন': শব্দটা পুরাতন নিয়মের নবীদের (যেমন গ্রীকদের বিপক্ষে ২:১) ও খ্রিষ্টিয়ান পবিত্রজনদের জন্য (যেমন ৫৭:২) ব্যবহৃত।

১৩ (ক) মথি ২১:৩৩-৪১ দ্রঃ; গ্রীকদের বিপক্ষে ৯:১ দ্রঃ।

(খ) সাধু আথানাসিউস এই ধারণা বার বার উপস্থাপন করেন, গ্রীকদের বিপক্ষে ১:১-২ দ্রঃ।

১৪ (ক) লুক ১৯:১০ দ্রঃ।

(খ) যোহন ৩:৫ দ্রঃ।

১৫ (ক) ১ করি ১:২১।

(খ) গ্রীকদের বিপক্ষে ৮:৪ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৯:১০ দ্রঃ।

১৬ (ক) এফে ৩:১৭-১৯।

(খ) ইশা ১১:৯ দ্রঃ।

(গ) এটাই সাধু আথানাসিউসের মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান দিক দু'টো যা গ্রীকদের বিপক্ষেও (১:১-২) উপস্থাপিত।

১৭ (ক) ৪৩:৭; গ্রীকদের বিপক্ষে ৪৬:১-২ দ্রঃ।

(খ) ৪২–৪৫ অধ্যায় দ্রঃ।

(গ) ১ পি ২:২২; ইশা ৫৩:৯ দ্রঃ।

১৮ (ক) যোহন ১০:৩৭-৩৮।

১৯ (ক) ১ করি ১:২৪।

২০ (ক) ১ করি ১৫:২০ দ্রঃ। এই বচনে সাধু আথানাসিউস মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করছেন (৩২; ৫৪ দ্রঃ; গ্রীকদের বিপক্ষে ১:১-২ দ্রঃ)।

(খ) হিব্রু ২:১৪-১৫।

২১ (ক) হিব্রু ১১:৩৫ দ্রঃ। 'আমরা বিলীন হচ্ছি' বলায় সাধু আথানাসিউস মৃতদেহের দৈহিক অবক্ষয়ের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন।

(খ) ১ করি ১৫:৫৩-৫৫ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ২:৩১; ১৩:৩৫; সাম ১৬:১০, সত্তরী পাঠ্য।

২৩ (ক) প্রেরিত ২৬:২৬ দ্রঃ।

(খ) এই উদাহরণে সাধু আথানাসিউস আইনি ভাষা ব্যবহার করছেন।

২৫ (ক) গা ৩:১৩।

(খ) দ্বিঃবিঃ ২১:২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) এফে ২:১৪।

(ঘ) এফে ২:১৪-১৫ দ্রঃ। তিনি 'উভয়কে নিজেতে মিলিত করেন': অর্থাৎ ক্রুশের দুই বাহু ইহুদীদের ও বিজাতীয়দের মিলিত করে।

(ঙ) যোহন ১২:৩২ দ্রঃ।

(চ) এফে ২:২ দ্রঃ।

(ছ) হিব্রু ১০:২০।

(জ) লুক ১০:১৮।

(ঝ) সাম ২৪:৭ সত্তরী পাঠ্য।

২৭ (ক) খ্রিষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরগণ যে কেমন মনোভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হন, তা ২৯ ও ৪৮ অধ্যায়েও উল্লিখিত।

(খ) প্রেরিত ২:২৪ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১৫:৫৫ দ্রঃ।

২৯ (ক) গ্রীকদের বিপক্ষে ২০:১ দ্রঃ।

৩০ (ক) গ্রীকদের বিপক্ষে ১১:১ দ্রঃ।

(খ) ৫:১; ৪৮; ৫২; গ্রীকদের বিপক্ষে ৫ দ্রঃ।

(গ) গ্রীকদের বিপক্ষে ৪৮; ৫০ দ্রঃ।

৩১ (ক) হিব্রু ৪:১২।

(খ) ১৭:১ দ্রঃ।

৩২ (ক) রো ১:২০।

(খ) মথি ৮:২৯; মার্ক ৫:৭; লুক ৪:৩৪ দ্রঃ।

(গ) সাধু আথানাসিউস বারবার সংক্ষিপ্তভাবে মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের প্রধান প্রধান দিক তুলে ধরেন (২০:১ ও ৫৪:১ দ্রঃ)।

(ঘ) ১ করি ১৫:২০ দ্রঃ।

৩৩ (ক) ইশা ৭:১৪ সত্তরী পাঠ্য; মথি ১:২৩। এই ৩৩ অধ্যায়ের সমস্ত বাইবেল-বচনগুলো সাধু ইউস্তিনুস ও সাধু ইরেনেউসের লেখায়ও উল্লিখিত।

(খ) গণনা ২৪:১৭ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) গণনা ২৪:৫-৭ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) ইশা ৮:৪ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) ইশা ১৯:১ সত্তরী পাঠ্য।

(চ) হোশেয়া ১১:১ সত্তরী পাঠ্য; মথি ২:১৫।

৩৪ (ক) ইশা ৫৩:৩-৫।

(খ) ইশা ৫৩:৬-৮।

(গ) ইশা ৫৩:৮-১০ সত্তরী পাঠ্য।

৩৫ (ক) দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) যেরে ১১:১৯ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) সাম ২২:১৭-১৯ সত্তরী পাঠ্য; যোহন ১৯:২৪।

(ঘ) ইশা ১১:১০ সত্তরী পাঠ্য; রো ১৫:২।

৩৬ (ক) ইশা ৮:৪।

৩৭ (ক) দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৫৩:৮।

৩৮ (ক) ইশা ৬৫:১-২ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ইশা ৩৫:৩-৬ সত্তরী পাঠ্য; হিব্রু ১২:১২ দ্রঃ।

(গ) যোহন ৯:৩২-৩৩।

৩৯ (ক) দা ৯:২৪-২৫।

৪০ (ক) আদি ৪৯:১০ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) মথি ১১:১৩।

(গ) সাম ১১৮:২৭ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) সাম ১০৭:২০।

(ঙ) ইশা ৬৩:৯।

(চ) গ্রীকদের বিপক্ষে ১:১ দ্রঃ।

(ছ) ইশা ১১:৯ দ্রঃ।

৪১ (ক) গ্রীক 'স্তোয়া' মতবাদ অনুসারে 'λόγος' (লোগোস) গ্রীক শব্দটা শুধু একটামাত্র শব্দে অনুবাদ করা যায় না যেহেতু সেই গ্রীক শব্দ 'বাণী' শুধু নয়, সেইসঙ্গে 'যুক্তি'ও বোঝায়। তেমন বাণী-লোগোস যুক্তি হওয়ায় সবিকছু যুক্তিসঙ্গত ও সংযুক্ত করে থাকেন। সাধু আথানাসিউসের অনেক দিন আগে তের্তুল্লিয়ানুসও লিখেছিলেন, 'ঈশ্বরের বাণী ও ঈশ্বরের যুক্তি যিনি, যিনি নিজেই যুক্তির বাণী, বাণীর যুক্তি ও উভয়েরই আত্মা, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্ট…' (প্রার্থনা প্রসঙ্গ ১:১)। সাধু আথানাসিউসের এই ধারণা 'গ্রীকদের বিপক্ষে' লেখায় ও এই লেখায় বারবার প্রতিধ্বনিত।

৪২ (ক) প্রেরিত ১৭:২৮।

(খ) ৮:১ দ্রঃ।

৪৩ (ক) ১৭:৬; গ্রীকদের বিপক্ষে ৪৬:১ দ্রঃ।

(খ) গ্রীকদের বিপক্ষে ৩৬:১ দ্রঃ।

৪৪ (ক) ১৭:১ দ্রঃ।

৪৫ (ক) ইশা ১১:৯।

(খ) কল ২:১৫।

(গ) ৪১:২ দ্রঃ।

৪৬ (ক) ১ করি ১:১৮-২৪ দ্রঃ।

(খ) গ্রীকদের বিপক্ষে ২৩:১ দ্রঃ।

৪৭ (ক) অপদূতদের প্রবঞ্চনা সম্পর্কে ৬:৫, ৬; ১২:৬ দ্রঃ।

(খ) ক্রুশ ও ক্রুশের চিহ্ন যে অপদূতদের প্রবঞ্চনা ও ফন্দি-ফিকির তাড়িয়ে দেয়, সেই সম্পর্কে গ্রীকদের বিপক্ষে ১:৫ দ্রঃ; বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ ২৯:১; ৪৮:৩…দ্রঃ; আন্তনির জীবনী ৭৮ দ্রঃ।

৪৮ (ক) মার্ক ১৬:১৭ দ্রঃ।

(খ) মথি ১২:২৪; মার্ক ৩:২২; লুক ১১:১৫ দ্রঃ।

৫০ (ক) মার্ক ১৬:১৭ দ্রঃ।

৫১ (ক) সাম ২৩:৪।

(খ) প্রবচন ১৪:২৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ২:৩৭ দ্রঃ।

৫২ (ক) ইশা ২:৪।

৫৩ (ক) প্রেরিত ১৯:১৯ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ২:৮।

৫৪ (ক) এটি সাধু আথানাসিউসের মুক্তিকর্ম-তত্ত্বের এমন সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যা 'গ্রীকদের বিপক্ষে' লেখায় (১:১) ও এই লেখায়ও একাধিকবার উপস্থাপিত (২০:১; ৩২:১)।

৫৫ (ক) রো ৯:৫।

(খ) গ্রীকদের বিপক্ষে ১:১ দ্রঃ।

(গ) গ্রীকদের বিপক্ষে ৯:৬ দ্রঃ।

৫৬ (ক) ১:১৩, ২১ দ্রঃ।

(খ) মথি ২৬:২৪।

(গ) মথি ২৪:৪২।

(ঘ) ২ করি ৫:১০।

৫৭ (ক) গ্রীকদের বিপক্ষে ২:২ দ্রঃ।

(খ) গ্রীকদের বিপক্ষে ১:১ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ২:৯।

মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র

[সামসঙ্গীত ব্যাখ্যা বিষয়ে মার্কেল্লিনোসের কাছে আলেক্সান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ আমাদের পবিত্র পিতা আথানাসিউসের পত্র]

সাধু আথানাসিউস যাঁর কাছে এই পত্র পাঠান, সেই মার্কেল্লিনোস সম্ভবত ছিলেন আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর একজন পরিসেবক যিনি অসুস্থাতার সময়ে সামসঙ্গীত-মালা অধ্যয়ন করতে করতে নিজের বিশপ আথানাসিউসের কাছে 'এক একটা সামসঙ্গীতের প্রকৃত অর্থ' (১ অধ্যায়) জানবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। মার্কেল্লিনোসের অনুরোধে সাধু আথানাসিউস এমন উত্তর উপস্থাপন করেন যা সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকের উত্তম ভূমিকা স্বরূপ দাঁড়ায়, ও সেইসঙ্গে আজকালের পাঠক-পাঠিকার কাছে এমনটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, খ্রিষ্টিয়ানদের প্রকৃত প্রার্থনা-পুস্তক বা গীৎপুস্তক পবিত্র বাইবেলেই অন্তর্ভুক্ত: পুস্তকটা হলো সেই সামসঙ্গীত-মালা যা খ্রিষ্টমণ্ডলীর আগেকার শতাব্দীর অনেক ভক্তজন মুখস্থই জানতেন যেহেতু স্বয়ং প্রভুই নিজের বিষয় অনুসন্ধার করার জন্য সামসঙ্গীত-মালাকে চিহ্নিত করেছিলেন (লুক ২৪:৪৪ দ্রঃ)।

সামসঙ্গীত-মালা যে খ্রিষ্টিয়ানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তা পুণ্য পিতা আন্তনীর জীবনীতেও বিশেষভাবে প্রদর্শিত।

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

পটভূমিকা

১। প্রিয় মার্কেল্লিনোস, খ্রিষ্টে তোমার আচরণে আমি বিস্মিত। কেননা তুমি, যদিও এ বর্তমান পরীক্ষায় বহু ক্লেশ ভোগ করে থাক, তবু তা সফলতার সঙ্গে সহ্য করছ; তাছাড়া, তুমি তো কৃচ্ছ্র সাধনা অবহেলা কর না। কেননা যখন আমি তোমার পত্রের বাহকের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তোমার চলতি অসুস্থতায় কেমন আছ, তখন জানতে পারলাম, তুমি সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগী মনোভাব রক্ষা করে থাক,

কিন্তু তাছাড়া তুমি প্রায়ই সামসঙ্গীত-মালা পড় ও এক একটা সামসঙ্গীতের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে আপ্রাণ চেষ্টা কর। তাই এক্ষেত্রে আমি তোমার প্রশংসা করি, কেননা আমি নিজেও এই একই পুস্তককে খুব ভালবাসি, যেইভাবে গোটা শাস্ত্রকেও ভালবাসি। এমনকি, এমনটা দৈবাৎ ঘটল যে, আমি একদিন বিজ্ঞ একজন প্রাচীন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলাম, এবং সামসঙ্গীত-মালার সেই প্রাচীন ধর্মগুরু সেবিষয়ে আমাকে যা বলেছিলেন, আমি তা তোমার কাছে লিখিত আকারে প্রেরণ করব। কেননা যুক্তিসঙ্গত বর্ণনার সাথে বিশিষ্ট একটা চারুতা জড়িত রয়েছে। তিনি এই কথা বলেছিলেন :

২। কেননা, হে সন্তান, *আমাদের গোটা শাস্ত্রবাণী* তথা পুরাতন ও নূতন নিয়ম দু'টোই *ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এবং ধর্মশিক্ষার জন্য তার উপযোগিতা আছে* (ক)। কিন্তু যারা প্রার্থনার মানুষ, তাদের জন্য সামসঙ্গীত-মালা বিশিষ্ট যথার্থতার অধিকারী। প্রতিটি পবিত্র পুস্তক নিজ নিজ অঙ্গীকার প্রদান করে ও ঘোষণা করে। উদাহরণ স্বরূপ, পঞ্চপুস্তক জগতের উৎপত্তি ও পিতৃকুলপতিদের কর্মকান্ড তথা মিশর থেকে ইস্রায়েলের প্রস্থান ও বিধান-জারীকরণ বিষয় দু'টো বর্ণনা করে। ত্রিপুস্তক (খ) [প্রতিশ্রুত] দেশ দখল, বিচারকগণের কর্মকীর্তি, ও সেইসঙ্গে দাউদের বংশধারাও তুলে ধরে। রাজাবলি ও বংশাবলি পুস্তকগুলো রাজাদের বিষয়াদি উপস্থাপন করে। এজরা পুস্তক বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ, [যেরুশালেমে] জনগণের প্রত্যাগমন এবং মন্দির ও নগরী পুনর্নির্মাণের কথা বর্ণনা করে। নবীদের পুস্তকগুলো আমাদের মাঝে ত্রাণকর্তার অবস্থান সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, ঐশআজ্ঞাগুলো সংক্রান্ত ও তিরস্কারমূলক উপদেশ, ও সেইসঙ্গে বিজাতীয়দের সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু সামসঙ্গীত-মালা এমন উদ্যানের মত যা এসমস্ত জাতের ফলাদিতে গঠিত; আরও, পুস্তকটায় সেসমস্ত কিছু গানের জন্য উপস্থাপিত; কিন্তু পুস্তকটা নিজস্বও এমন কিছুর অধিকারী যা সেই বিষয়গুলোর পাশে পাশে সঙ্গীত-আকারে প্রদান করে।

বাইবেলের বিষয়াদি সামসঙ্গীত-মালায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত

৩। পুস্তকটা আদিপুস্তকের ঘটনাদি গান করে ১৯ নং সামতে, *আকাশমণ্ডল বর্ণনা করছে ঈশ্বরের গৌরব, গগনতল ঘোষণা করছে তাঁর হাতের কর্মকীর্তি* ও ২৪ নং সামতে, *প্রভুরই তো পৃথিবী ও তার যত বস্তু, জগৎ ও জগদ্বাসী সকল; তিনি সাগরের জলরাশির উপরে তা স্থাপন করলেন।* যাত্রাপুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণের বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ৭৮ ও ১১৪ নং সামতে গান করা হয় যখন বলে, *ইস্রায়েল যখন মিশর থেকে বেরিয়ে গেল, যাকোবকুল যখন ভিন্নভাষী এক জাতি থেকে বেরিয়ে গেল, যুদা তখন হয়ে উঠল তাঁর পবিত্রধাম, ইস্রায়েল তাঁর রাজ্যভূমি।* পুস্তকটা ১০৫ নং সামতেও একই ঘটনাসমূহের স্তুতিগান করে, *তিনি তাঁর দাস মোশি আর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি আরোনকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের মাঝে তিনি নিজের বাণীসকল, ও হাম দেশে তাঁর নানা বিস্ময়কর কাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি অন্ধকার পাঠিয়ে দিলেন ও সবকিছু অন্ধকার করলেন, তারা কিন্তু তাঁর বাণীর প্রতি বিদ্রোহ করল। তিনি তাদের নদনদী রক্তে পরিণত করলেন, ঘটালেন তাদের সমস্ত মাছের মৃত্যু। তাদের দেশ অতিশয় বেঙ উৎপন্ন করল তাদের রাজাদের কক্ষগুলোতে। তিনি কথা বললেন, তাতে এল ডাঁশ, এল মশা তাদের উপকূলে* (ক)। এমনটাও আবিষ্কার করা সম্ভব যে, সার্বিক দিক দিয়ে উপরোল্লিখিত গোটা সাম ও ১০৬ নং সাম একই ঘটনাদি বিষয়ে লেখা হয়েছিল। এবং যাজকত্ব ও তাঁবু সংক্রান্ত বিষয়কে পুস্তকটা *তাঁবু প্রস্থানের সময়ে* শিরনামে ২৯ নং সামতে ঘোষণা করে, *প্রভুর কাছে আন তোমরা, হে ঈশ্বরের সন্তান, প্রভুর কাছে আন পুংশাবক মেষ, প্রভুর কাছে আন গৌরব ও সম্মান।*

৪। পুস্তকটা যোশুয়া ও বিচারকগণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো একপ্রকারে ১০৭ নং সামতে প্রকাশ করে যখন বলে, *তারা বাস করার মত নানা নগর স্থাপন করল, মাঠে বীজ বুনল ও পুঁতল আঙুরলতা;* কেননা সেই প্রতিশ্রুত দেশ যোশুয়ার জনগণের মধ্যেই বণ্টন করা হয়েছিল। এবং পুস্তকটা যখন একই সামতে বারে বারে বলে, *সেই সঙ্কটে তারা প্রভুকে চিৎকার করে ডাকল, ও সমস্ত ক্লেশ থেকে তিনি তাদের বের করে আনলেন,* তখন পুস্তকটা বিচারকগণ পুস্তকের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। যখন তারা চিৎকার করে, তখন তিনি যথাসময় বিচারকগণকে জাগিয়ে তোলেন ও তাঁর আপন জনগণকে সেই

ক্লেশ থেকে ত্রাণ করেন। পুস্তকটা রাজাদের কর্মকাণ্ড ২০ নং সামতে গান করে একথা ব'লে, *কেউ যুদ্ধরথে, আবার কেউ অশ্বে গর্ব করে, আমরা কিন্তু গর্ব করি আমাদের ঈশ্বর প্রভুর নামে। ওরা ভূপাতিত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, আমরা কিন্তু উত্থিত হই, ও আমাদের সোজা করে দাঁড়ানো হল। রাজাকে ত্রাণ কর, প্রভু! আমরা তোমাকে ডাকলে সেদিন আমাদের সাড়া দাও* (ক)। পুস্তকটা এজরা পুস্তকের ঘটনাসমূহ আরোহণ-সঙ্গীতগুলোর ১২৬ নং সামতে গান করে, *প্রভু যখন সিয়োনের বন্দিদশা উল্টিয়ে দিলেন, আমরা তখন যেন সান্ত্বনাই পেলাম*, ও ১২২ নং সামতেও একই কথা ব্যক্ত করে, *আমি আনন্দ পেলাম ওরা যখন আমাকে বলল, "এসো, চলি প্রভুর গৃহে!" এখন এসে থেমেছে আমাদের চরণ তোমার তোরণদ্বারে, হে যেরুশালেম। যেরুশালেম দৃঢ়সংবদ্ধ নগরীর মতই গড়া, কেননা সেইখান থেকে উঠে গিয়েছিল গোষ্ঠীসকল, প্রভুরই গোষ্ঠীসকল—ইস্রায়েলের সাক্ষ্যস্বরূপ* (খ)।

৫। নবীদের উক্তি প্রায়ই প্রতিটি সামসঙ্গীতে ঘোষিত। ত্রাণকর্তা যে আপন জনগণকে দেখতে আসবেন, সেবিষয়ে, ও তিনি যে ঈশ্বর রূপে এমন একজনেরই মত অবস্থান করবেন, সেবিষয়েও পুস্তকটা এভাবে ৫০ নং সামতে ব্যক্ত করে, *আমাদের ঈশ্বর প্রভু প্রকাশ্যেই আসবেন, তিনি নীরব থাকবেন না*, ও ১১৮ নং সামতে বলে, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি আশিসধন্য; প্রভুর গৃহ থেকে আমরা তোমাদের আশীর্বাদ করেছি। ঈশ্বরই প্রভু, তিনিই আমাদের উপর উদ্ভাসিত হলেন* (ক)। এবং ইনি যে পিতার বাণী, সেবিষয়ে পুস্তকটা ১০৭ নং সামতে গান করে, *তিনি আপন বাণী প্রেরণ করে তাদের নিরাময় করলেন, তাদের বিনাশ থেকে তাদের নিষ্কৃতি দিলেন* (খ)। আসন্ন যিনি, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর ও প্রেরিত যিনি, তিনি সেই বাণী। যেহেতু পুস্তকটা এ জানে যে, এই বাণী হলেন ঈশ্বরের পুত্র, সেজন্য ৪৫ নং সামতে পুস্তকটা পিতার কণ্ঠস্বরের কথা গান করে, *আমার হৃদয় মঙ্গলময় একটা বাণী ফুটিয়ে তুলেছে*। এবং পুস্তকটা ১১০ নং সামতেও একই বিষয়ে বলে, *প্রভাতের আগে আমি গর্ভ থেকে তোমাকে জন্ম দিলাম*। পিতা যাঁকে জন্ম দিলেন, তিনি যে তাঁর বাণী ও প্রজ্ঞা, একথা ছাড়া একজন আর কীবা বলতে পারে? যেহেতু শাস্ত্র জানত যে এই একজনকেই পিতা বলেছিলেন, *আলো হোক, এবং আকাশপরদা ও সবকিছু হোক* (গ), সেজন্য এই পুস্তকে এই উক্তিও অন্তর্ভুক্ত, *প্রভুর*

বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব [ঘ]।

৬। স্বয়ং খ্রিষ্ট যে সেই তিনি যিনি আসছেন, পুস্তকটা তা জানত, ও বিশেষভাবে তাঁর বিষয়ে ৪৫ নং সামতে বলে, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড। তুমি ধর্মময়তা ভালবাসেছ ও অধর্ম ঘৃণা করেছ, এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর, তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন* [ক]। এবং পাছে একজন এমনটা ধরে নেয় যে তিনি কেবল আভাসেই আসেন, সেজন্য পুস্তকটা এটাই স্পষ্ট করে যে তিনি মানুষ হবেন, ও তিনিই হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর দ্বারা সমস্ত হয়েছিল [খ], যেভাবে ৮৭ নং সামতে বলে, *মাতা সিয়োন বলবে, "একটি মানুষ, একটি মানুষ তার মধ্যে জনিত হল; পরাৎপর নিজেই সিয়োনকে গড়লেন"* [গ]। একথা প্রকৃতপক্ষে একথার শামিল, *এবং বাণী ছিলেন ঈশ্বর* ও *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল* এবং *বাণী হলেন মাংস* [ঘ]। এ পরিপ্রেক্ষিতেও পুস্তক যেহেতু জানে যে, তেমনটা একটি কুমারী থেকে হয়েছিল, সেজন্য সামসঙ্গীত-মালা এবিষয়ে নীরব থাকে না, কিন্তু সাথে সাথে ৪৫ নং সামতে সুস্পষ্ট কয়েকটা উক্তি এই বলে উপস্থাপন করে, *শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—তোমার স্বজাতি ও তোমার পিতৃগৃহের কথাও ভুলে যাও; কারণ রাজা তোমার সৌন্দর্যে আসক্ত হবেন*। এবারও একথা সেই কথার মত যা গাব্রিয়েল দ্বারা বলা হয়, *আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন* [ঙ]। কেননা তিনি যে সেই খ্রিষ্ট, একথা ঘোষণা করার পর পরেই পুস্তকটা 'শোন কন্যা' বলায় পুস্তকটা একটি কুমারী থেকে মানব জন্মের কথা জ্ঞাত করল। লক্ষ কর, গাব্রিয়েল মারীয়াকে নাম ধরেই ডাকেন, কেননা উদ্ভবের দিক দিয়ে তিনি মারীয়া থেকে অসদৃশ, কিন্তু সাম-রচয়িতা সেই দাউদ তাঁকে সঠিক ভাবে 'কন্যা' বলে সম্বোধন করেন, কারণ মারীয়া তাঁর বীজ থেকে আগত ছিলেন।

৭। এবং একথা ঘোষণা করার পর যে, তিনি মানুষ হবেন, পুস্তকটা পরবর্তীতে মাংসের যন্ত্রনাসাপেক্ষতার দিকেও অঙ্গুলি নির্দেশ করে। পরে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে যে একটা ষড়যন্ত্র হবে, তেমনটা অনুভব ক'রে পুস্তকটা ২ নং সামতে বলে, *বিজাতিরা কোলাহল*

করল কেন? কেনই বা জাতিসকল অসার কিছু কল্পনা করে? প্রভু ও তাঁর তৈলাভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল পৃথিবীর রাজাসকল, ও নায়কেরা একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হল। ২২ নং সামতে পুস্তকটা ত্রাণকর্তার নিজের ওষ্ঠ থেকেই তাঁর যে কেমন মৃত্যু হবে তা ব্যক্ত করে, *তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়। কেননা অনেক কুকুর আমাকে ঘিরে ফেলেছে, চারদিকে দুরাচারের দল আক্রমণ করেছে আমায়; আমার হাত, আমার পা বিঁধে ফেলেছে ওরা, ওরা আমার সকল হাড় গুনেছে, নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করেছে, আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করেছে* (ক)। যখন পুস্তক হাত ও পায়ের বিদারণের কথা বলে, তখন সেকথা ক্রুশের কথা ছাড়া ছাড়া আর কীবা বোঝাতে চায়? এসমস্ত কিছু শিখিয়ে দেবার পর পুস্তকটা এও বলে যে, প্রভু নিজের খাতিরে নয়, বরং আমাদেরই খাতিরে এসমস্ত কিছু ভোগ করলেন। এবং তাঁর নিজের ওষ্ঠের মধ্য দিয়ে পুস্তকটা ৮৮ নং সামতে বলে, *তোমার রোষ আমার উপর প্রচণ্ড চাপ দিল*; এবং ৬৯ নং সামতে বলে, *আমি যা নিইনি, তা ফিরিয়ে দিলাম*। কেননা যদিও তিনি কোন অপরাধের বিষয়ে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ছিলেন না, তবু তিনি মৃত্যুবরণ করলেন; কিন্তু আমাদের খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করলেন ও [সেই বিধান] লঙ্ঘনের জন্য আমাদের বিরুদ্ধে যে রোষ ধাবিত ছিল, তা তিনি নিজের উপরে আপন করে নিলেন, যেইভাবে তিনি ইশাইয়া পুস্তকে বলেন, *তিনি আমাদের অসুস্থতা তুলে বহন করলেন* (খ)। একথা তখনও সুস্পষ্ট যখন আমরা ১৩৮ নং সামতে বলি, *প্রভু, তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের মজুরি দেবে*, এবং [পবিত্র] আত্মা ৭২ নং সামতে বলেন, *তিনি অভাবীদের সন্তানদের ত্রাণ করবেন ও মিথ্যা অভিযোক্তাকে নমিত করবেন … কারণ তিনি দীনজনকে অত্যাচারীর হাতে থেকে মুক্ত করলেন, ও যে শ্রম করছিল ও যার সাহায্য করার কেউই ছিল না, তিনি তাকেও উদ্ধার করলেন*।

৮। এক্ষেত্রে পুস্তকটা তাঁর স্বর্গারোহণের কথা আগে থেকে ঘোষণা ক'রে ২৪ নং সামতে বলে, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণ উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা*। এবং ৪৭ নং সামতে পুস্তকটা বলে, *ঈশ্বর আরোহণ করেছেন জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রভু তূর্যনিনাদের মধ্যে*। তিনি যে পিতার ডান পাশে আসন নেবেন, তা পূর্বঘোষণা করে পুস্তকটা ১১০ নং সামতে বলে, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার*

ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমাদের শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ। এবং দিয়াবলকে যে ধ্বংস করা হয়েছিল, ৯ ও ১০ নং সামতে পুস্তকটা সেই কথা চিৎকার ক'রে এভাবে শোনায়, *ধর্মময়তার বিচারক হিসাবে তুমি সিংহাসনে আসন নিলে। তুমি দেশগুলোকে ধমক দিলে, ও সেই ভক্তিহীনেরা বিনষ্ট হল*। তিনি যে পিতার কাছ থেকে বিচারের সমস্ত অধিকার পেয়েছিলেন, পুস্তকটা একথাও গোপন রাখেনি, কিন্তু এমনটাও ঘোষণা করে যে, ৭২ নং সামতে তিনি সকলের বিচারকর্তা হিসাবে আসছেন, *হে ঈশ্বর, রাজাকে তোমার বিচার-অধিকার, ও তাঁর পুত্রকে তোমার ধর্মময়তা প্রদান কর, তিনি যেন তোমার জনগণকে ধর্মময়তায়, ও বিচারমতে তোমার দীনজনদের বিচার করেন*। এবং ৫০ নং সামতে পুস্তকটা বলে, *তিনি ঊর্ধ্বকার আকাশকে, ও পৃথিবীকেও আহ্বান করবেন, তিনি যেন তাঁর আপন জনগণকে বিচার করেন। ... স্বর্গলোক তাঁর ধর্মময়তা ঘোষণা করবে, কারণ ঈশ্বরই বিচারকর্তা*। এবং ৮২ নং সামতে আমরা পড়ি, *ঈশ্বর দেবতাদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে আছেন, ও তাদের মধ্যে দেবতাদের বিচার করবেন*। একজন পুস্তকটা থেকে জাতিগুলোর বিচারের কথাও জানতে পারে, তেমনটা বহু সামসঙ্গীতে উল্লিখিত, কিন্তু ৪৭ নং সামতে উত্তমরূপে ব্যক্ত, *সর্বজাতি, করতালি দাও, উল্লাসের কণ্ঠে ঈশ্বরের উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি*। একইপ্রকারে ৭২ নং সামতে লেখা আছে, *ইথিওপীয়রা তাঁর সামনে পতিত হবে, ও তাঁর শত্রুরা ধুলা চেটে খাবে। থার্শিশের রাজারা ও দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে আসবেন অর্ঘ্যদান, আরোব ও সেবার রাজারা উপহার আনবেন। এবং পৃথিবীর সকল রাজা তাঁর উপাসনা করবেন, ও বিজাতীয়রা তাঁর সেবা করবে*। এসব কথা সামসঙ্গীতগুলোতে গানের মাধ্যমে পরিবেশিত ও শাস্ত্রের বাকি প্রতিটি পুস্তকে পূর্বঘোষিত।

৯। এবং অজ্ঞ না হওয়ায় এপর্যায় সেই প্রাচীন ব্যক্তি বলতেন, 'শাস্ত্রের প্রতিটি পুস্তকে একই বিষয় বিশেষভাবে ঘোষিত। এই বিবরণ সেই সবগুলোতে রয়েছে, পবিত্র আত্মার একই সম্মতিও রয়েছে। এমনকি, যেমন এই পুস্তকে এমন বিষয় আবিষ্কার করা যেতে পারে যা অন্যান্য পুস্তকে রয়েছে, তেমনি এপুস্তকে উল্লিখিত বিষয়াদি প্রায়ই অন্যান্য পুস্তকেও পাওয়া যায়। কেননা মোশি একটা স্তুতিগান লেখেন, ও ইশাইয়া স্তুতিগান করেন, ও হাবাকুক একটা স্তুতিগান নিয়ে প্রার্থনা করেন। আর শুধু তা নয়, প্রতিটি

পুস্তকে একজন ভবিষ্যদ্বাণী, বিধান সংক্রান্ত বিষয় ও নানা বর্ণনা পেতে পারে। কেননা একই [পবিত্র] আত্মা সেই সবকিছুর উপরে বিদ্যমান, ও প্রতিটি ক্ষেত্রে পুস্তকের অনুযায়ী পার্থক্য অনুসারে প্রতিটি পুস্তককে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই পুস্তক সেই অনুসারে সেই অনুগ্রহ সেবা করে ও সেটার সিদ্ধি ঘটায়, সেই অনুগ্রহ হোক ভবিষ্যদ্বাণী বা বিধান বা ইতিহাস-বর্ণনা বা সামসঙ্গীতেরই নিজের অনুগ্রহ। যেহেতু সমস্ত পার্থক্য সেই [পবিত্র] আত্মা এক ও একই থেকে আগত, ও সেই পবিত্র আত্মা স্বরূপে অবিভাজ্য, সেজন্য এই ভিত্তিতে অবশ্যই গোটা সেইসব এক একটা পুস্তকে রয়েছে, ও সেবাকর্ম দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত, সেই অনুসারে [পবিত্র] আত্মার প্রকাশিত বাণীসকল ও পার্থক্যগুলো সব পুস্তকের সঙ্গে ও প্রতিটি পুস্তকের সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আরও, যখন [পবিত্র] আত্মা ব্যাপারটা হাতে নেন, তখন সংরক্ষিত প্রয়োজন অনুসারে এক একটা পুস্তক বাণীর সেবা করে। তাই, যেমন আমি আগে বলেছি, মোশি বিধানকর্ম পালন করার সময়ে মাঝে মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী দেন ও মাঝে মাঝে গান করেন; এবং নবীরা ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার সময়ে মাঝে মাঝে আদেশ জারি করেন যেমন *নিজেদের ধৌত কর, শুচি হও। হে যেরুশালেম, শঠতা থেকে নিজের হৃদয় শোধন কর* (ক), ও মাঝে মাঝে ইতিহাসের বিবরণী দেন যেইভাবে দানিয়েল সুসান্নার বেলায় করেন, ইশাইয়া রাবশাকেহ্ ও সেন্নাখেরিবকে লক্ষ ক'রে করেন। এভাবে গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকও, যেমন আগে বলেছি, অন্যান্য পুস্তকে যা যা সূক্ষ্ম বর্ণনার শৈলী অনুসারে বলা হয়েছে, তা সঙ্গতিময় কণ্ঠে গান করে। এবং কমপক্ষে কয়েকবার, পুস্তকটা মাঝে মাঝে আদেশ জারি করে, *ক্রোধ বর্জন কর, রোষ ভুলে যাও* (খ) ও *অপকর্ম থেকে সরে গিয়ে সৎকর্ম কর, শান্তির অন্বেষণ করে কর অনুসরণ* (গ)। এবং মাঝে মাঝে পুস্তকটা ইস্রায়েলের ভ্রমণের কথা বর্ণনা করে ও ত্রাণকর্তা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, যেইভাবে আগে বলেছি।

সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকের স্বীয় বৈশিষ্ট্য

১০। সব পুস্তকে [পবিত্র] আত্মার সাধারণ ও সার্বিক অনুগ্রহ বিরাজ করুক, তা প্রতিটি পুস্তকে উপস্থিত বলে পাওয়া যাক; হ্যাঁ, যখনই প্রয়োজন তেমনটা দাবি করে ও [পবিত্র]

আত্মা তেমনটা বাসনা করেন, তখন সব পুস্তকে সেই একই অনুগ্রহ লভ্য হোক। এক্ষেত্রে ‘বেশি’ ও ‘কম’ শব্দদ্বয় ভিন্ন নয়, কেননা এক একটা সূক্ষ্ম ভাবে নিজ নিজ সেবাকর্ম সম্পাদন করে ও পূর্ণ করে। কিন্তু তাসত্ত্বেও সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকটা নিজস্ব একটা বিশেষ অনুগ্রহ ও ব্যক্ত করার বিশিষ্ট সূক্ষ্মতার অধিকারী। কেননা যে সমস্ত ক্ষেত্রে পুস্তকটা অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সংসর্গ ভোগ করে, সেসমস্ত কিছু বাদে পুস্তকটা নিজস্ব এ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যেরই অধিকারী, তথা, পুস্তকে প্রতিটি প্রাণের অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ও তেমন অনুভূতিসমূহের পরিবর্তন ও সংশোধন নিজের মধ্যে বর্ণিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখে। সেজন্য, যে কেউ নিজেকে গঠন করার লক্ষ্যে এ পুস্তক থেকে সীমাহীনভাবে গ্রহণ করে নিতে ও উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করে, তার জন্য যা যা প্রয়োজন তা এই পুস্তকে লিখিত। কেননা অন্যান্য পুস্তকে একজনের যা করা দরকার ও যা করতে নেই, সে তা-ই মাত্র শোনে। সেই অনুসারে একজন শুধু এই উদ্দেশ্যেই নবীদের কথা শোনে, যাতে সে ত্রাণকর্তার আগমন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আর একজন ইতিহাসের দিকে মনোযোগ দেয়, ও সেই ভিত্তিতে সে রাজাদের ও সাধু ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড জানতে পারে। কিন্তু সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকের বেলায় যে শোনে, সে এসমস্ত কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া প্রাণের আবেগও উপলব্ধি করে ও সেবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে, যার ফলে, নিজের সঙ্গে যা যা সম্পর্কিত সেই ভিত্তিতে ও যা দ্বারা নিজে আবদ্ধ রয়েছে সেই ভিত্তিতেও, সে এই পুস্তক দ্বারা শব্দগুলো থেকে উদ্গত প্রতিমূর্তির অধিকারী হতে সক্ষম হয়ে ওঠে (ক)। সুতরাং, শ্রবণের মধ্য দিয়ে পুস্তক অনিষ্টকর আবেগ অবজ্ঞা করতে শুধু নয়, কিন্তু কেমন করে পাঠক কথা বলার ও কর্ম সম্পাদন করার মধ্য দিয়ে সেই অনিষ্টতম আবেগ নিরাময় করতে পারে, তেমনটাও শেখান। এদিকে একথা স্বীকার্য যে, অন্যান্য পুস্তকেও এমন প্রতিরোধমূলক বচন রয়েছে যা অপকর্ম নিষেধ করে, কিন্তু এই পুস্তকে এমনটাও রয়েছে যে, একজনকে কী ভাবে অনিষ্ট থেকে বিরত থাকতে হবে। মনপরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশ ঠিক এধরনের, কেননা মনপরিবর্তন করা বলতে পাপকর্ম বন্ধ করা বোঝায়। এই পুস্তকে এমনটা নির্দেশ করা হয় কীভাবে মনপরিবর্তন করতে হয় ও মনপরিবর্তনের সময়ে একজনকে কি কি বলতে হয়। তাছাড়া প্রেরিতদূত বলেন, *ক্লেশ প্রাণে নিষ্ঠাকে, আর নিষ্ঠা যাচাইকৃত চরিত্রকে,* ও

যাচাইকৃত চরিত্র প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে, আর সেই প্রত্যাশা তো আশাভ্রষ্ট করে না (খ)। সামগুলোতে লেখা আছে, এমনকি খোদাই করে লেখা আছে কেমন করে একজনকে কষ্ট ভোগ করতে হয়, কষ্টভোগীর কাছে কী বলতে হয়, ক্লেশের পরে কী বলতে হয়, কেমন করে এক একজন পরীক্ষিত হয়, ও যারা ঈশ্বরে প্রত্যাশা রাখে তাদের কথা কি ধরনের। উপরন্তু, সবকিছুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য একটা আজ্ঞা রয়েছে (গ), কিন্তু সামসঙ্গীতগুলো এমনটাও শেখায়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার সময়ে একজনকে কী বলতে হয়। যত মানুষ ভক্তিময় জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তারা যে নির্যাতিত হবে (ঘ), অন্যান্য পুস্তক থেকে তেমনটা শোনার পর আমরা সামসঙ্গীতগুলো থেকে এটা শিখি যে, পালাবার সময়ে একজনকে কেমন করে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে হবে, এবং নির্যাতিত হওয়ার সময়ে ও নির্যাতিত হওয়ার পরে মুক্তিলাভ করার সময়ে কেমন কথা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করতে হবে। আমাদের বলা হয় ঈশ্বরকে ধন্য বলতে ও তাঁকে স্বীকার করতে, কিন্তু সামসঙ্গীতগুলোতে আমাদের শেখানো হয় কেমন করে একজনকে প্রভুর প্রশংসা করতে হবে, ও কোন্ কোন্ কথা বলায় আমরা প্রভুতে আমাদের বিশ্বাস যথার্থভাবে স্বীকার করব। এবং এক এক ব্যক্তি ক্ষেত্রে একজন আমাদের জন্য ও আমাদের অনুভূতি ও সমতার জন্য নির্দিষ্ট দিব্য স্তুতিগান খুঁজে পাবে।

১১। সামসঙ্গীতগুলোতে এ বিস্ময়কর বিষয়ও রয়েছে যে, অন্যান্য পুস্তকে, সেই পবিত্রজন যা বলেন, যারা তা পড়ে, ও কোন না কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তারা যা বলতে পারে, তা এমন বিষয় সংক্রান্ত যা আগেকার সেই ব্যক্তিদের সম্পর্কে লেখা হয়েছিল। একইপ্রকারে, একটা পাঠ্যাংশ যাদের বিষয়ে কথা বলে, যারা শোনে, তারা পাঠ্যাংশের উল্লিখিত সেই ব্যক্তিদের তুলনায় নিজেদের আলাদা গণ্য করে, যার ফলে তাদের যা বলা হয়েছে, তারা যতখানি সেই কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয় ও সেগুলোর অনুকারী হতে বাসনা করে, ততখানিই মাত্র সেই কর্মকাণ্ডের অনুকারী হয়। তথাপি, এর বিপরীতে যে কেউ এই সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকটা হাতে নেয়, অন্যান্য শাস্ত্রের বেলায় যেভাবে রীতিমত ঘটে, সেভাবে সে বিস্ময় ও আরাধনার মনোভাবে ত্রাণকর্তার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, কিন্তু অন্যান্য সামগুলোর কথা সে নিজেরই কথা বলে চিনে নেয়। এবং যে জন

শোনে, সে অভ্যন্তরেই সাড়া পায়, সেইভাবে যেভাবে সে নিজেই সেই কথা উচ্চারণ করত ও যেভাবে সামগুলো তার নিজের লেখা সঙ্গীত হত। এবং ব্যাখ্যার খাতিরে, প্রেরিতদূত যেমনটা বলেন, সামগুলো যা যা বলে, তুমিও তা আবৃত্তি করতে দ্বিধা করো না। বহু কথা পিতৃকুলপতিদের সংক্রান্ত ও তাঁদের নিজেদেরই কথা বলে উচ্চারিত হয়েছিল; মোশিও কথা বলতেন ও ঈশ্বর উত্তর দিতেন; এলিয় ও এলিশা দু'জনেও কার্মেল পর্বতে অবস্থান করার সময়ে প্রভুকে ডেকে প্রায়ই বলতেন, *আমি যাঁর সাক্ষাতে আজ দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি* [ক]। এবং পবিত্র নবীদের যে প্রধান প্রধান বাণী, সেগুলো ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত। এবং বাকি বাণীগুলো প্রায়ই বিজাতীয়দের ও ইস্রায়েল সংক্রান্ত। তাসত্ত্বেও এমন কেউই নেই যে পিতৃকুলপতিদের বাণী নিজেরই বাণী বলে উচ্চারণ করবে, অথবা মোশির উচ্চারিত কথা অনুকরণ ও উচ্চারণ করতে দুঃসাহস দেখাবে; ও নিজের দাস ও ইশ্মায়েল বিষয়ে, ও মহান ইসহাক সম্পর্কে আব্রাহাম যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, সে সেই কথাগুলো একই প্রয়োজনের চাপেও নিজেরই কথা বলে উচ্চারণ করবে। এবং এমন কেউ থাকলে যে কষ্টভোগীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে বা কোন এক সময়ে শ্রেয়তর কিছুর বাসনায় আবদ্ধ হবে, সে মোশির মত কখনও একথা বলবে না, *আমার কাছে নিজেকে দেখাও* [খ], আরও, *আহা! এখন যদি তুমি এদের পাপ ক্ষমা কর, তবে ক্ষমা কর; না করলে, তবে তুমি যে পুস্তক লিখেছ, তোমার সেই পুস্তক থেকে আমাকে মুছে দাও* [গ]। একইপ্রকারে এমন কেউই নেই যে নবীদের পুস্তকগুলো নিজেরই বাণী বলে দখল ক'রে, নবীরা যাদের নিন্দা ও প্রশংসা করেছিলেন, সেও, যারা তেমন কিছু করে, তাদের নিন্দা ও প্রশংসা করবে। একইপ্রকারে এমন কেউই নেই যে নিজের বাণী বলে 'আমি যাঁর সাক্ষাতে আজ দাঁড়িয়ে আছি, সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি' উক্তিটা অনুকরণ করতে দুঃসাহস করবে। আসলে এটা সুস্পষ্ট যে, যে কেউ সেই পুস্তকগুলো পড়ে, সে সেই বাণী নিজের বাণী বলে উচ্চারণ করে না, বরং সেই পবিত্রজনদের বাণী ও সেই বাণী দ্বারা যাদের দিকে অঙুলি নির্দেশ করা হয়, তাদেরই বাণী বলে উচ্চারণ করে। কিন্তু এটা আশ্চর্য যে, এর বিপরীতে ত্রাণকর্তা ও বিজাতীয়দের সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পরে যে কেউ সামগুলো আবৃত্তি করে, সে বাকি কথাগুলো নিজেরই কথা বলে উচ্চারণ করে, এবং এক একজন সেগুলো এমন ভাবে গান

করে ঠিক যেন সেই কথাগুলো তার নিজের বিষয়ে লেখা হয়েছিল, এবং অন্য কেউ কথা বলছে বা অন্য কারও বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, সে সেই অনুসারে সেই কথাগুলো গ্রহণও করে না, সেই অনুসারে আবৃত্তিও করে না। বরং সে সেই কথাগুলো উচ্চারণ করে কেমন যেন সে নিজে নিজের বিষয়ে কথা বলছে। এবং যা বলা হয় তা এমন যে, সে ঈশ্বরের কাছে হাত উত্তোলন করে, কেমন যেন নিজেই তেমনটা করছে ও নিজে থেকেই সেই কথা উচ্চারণ করছে। কেননা পিতৃকুলপতিরা, মোশি ও অন্যান্য নবীদের বেলায় সে যেমন সতর্ক থাকত, তেমনি এখন সে এবিষয়ে সেইভাবে সতর্ক হবে না, বরং যে কেউ এ বচনগুলো গান করে, সে এতেই বিশেষভাবে ভরসা রাখে যে, সে যা উচ্চারণ করে, তা তার নিজেরই ও তার নিজের বিষয়ে লিখিত বাণী। কেননা সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকে সেও রয়েছে যে আজ্ঞাগুলো পালন করে ও সেও রয়েছে যে সেই আজ্ঞাগুলো পালন করে না, ও উভয়ের কাজকর্মও রয়েছে। এবং এক্ষেত্রে এক একজনের পক্ষে সীমাবদ্ধতা রাখা প্রয়োজন, অর্থাৎ এক একজন হয় বিধান পালনকারী ব্যক্তি হিসাবে, না হয় বিধান লঙ্ঘণকারী ব্যক্তি হিসাবে এদের বিষয়ে যা যা লেখা হয়েছে, সে সেই বাণীগুলো উচ্চারণ করবে।

১২। এবং আমার এমনটা মনে হয় যে, যে ব্যক্তি সেই বাণী গান করে, সেই বাণী তার কাছে একটা আয়নাই যেন হয়, যাতে করে সে নিজেকে ও আত্মার যত আবেগ উপলব্ধি করতে পারে ও তেমন মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে সে যেন সেই বাণীগুলো উচ্চারণ করতে পারে। কেননা প্রকৃতপক্ষে যে গান করে, যে কেউ তাকে শোনে, সে, যে সঙ্গীত আবৃত্তি করা হচ্ছে তা এমনভাবে গ্রহণ করে তা যেন তার নিজেরই বিষয়ে কথা বলে, যার ফলে তাকে যখন নিজের বিবেক দ্বারা দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়, তখন বিদ্ধ হয়ে সে মনপরিবর্তন করবে, অথবা সে যখন ঈশ্বরে স্থিত প্রত্যাশার কথা শোনে ও বিশ্বাসীদের জন্য প্রাপ্য সহায়তার কথা শোনে, অর্থাৎ যখন এমনটা শোনে যে তার জন্য তেমন অনুগ্রহ রয়েছে, তখন সে উল্লসিত হয় ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে শুরু করে। অতএব, যখন একজন ৩ নং সামসঙ্গীত গান করে, সে নিজেরই ক্লেশ চিনে নিয়ে সামসঙ্গীতের বাণী তার নিজেরই বাণী বলে গণ্য করে। এবং যখন একজন ১২ ও ১৭ নং সাম গান

করে, তখন সে নিজের বিষয়ে এমনটা ভাবে যে, সে নিজেই নিজের আস্থা ও প্রার্থনা বিষয়ক সংবাদ দিচ্ছে; এবং ৫১ নং সাম সম্পর্কে সে অনুভব করে, সে তার নিজের অনুতাপের উপযুক্ত কথা ব্যক্ত করছে। কেউ যখন ৫৪, ৫৬, ৫৭ ও ১৪২ নং সাম গান করে, সে তখন অন্য একজন যে নির্যাতিত হচ্ছে এমনটা না ভেবে সে বরং নিজে কষ্টভোগী হওয়ায় এমনটা ভাবে সে নিজে তেমনটা ভোগ করছে; এবং সঙ্গীতের কথা নিজেরই কথা বলে প্রভুর উদ্দেশে গান করে। তাই সমষ্টিগত দিক দিয়ে এক একটা সামসঙ্গীত [পবিত্র] আত্মা দ্বারা একাধারে উচ্চারিত ও রচিত, যার ফলে, যেমন আগে বলেছি, একই কথায় আমাদের আত্মার গতি উপলব্ধি করা যেতে পারে; আবার, আমাদের মনের গতি স্মরণ করার জন্য ও আমাদের জীবন সংশোধন করার জন্য সব সামগুলো আমাদের লক্ষ করে ও সেগুলো কেমন যেন আমাদের অন্তর থেকেই উৎসারিত হয়। কেননা যারা সামগুলো গান করে, সেবিষয়ে তারা যা বলেছে, সেই অনুসারে এসমস্ত কিছু আমাদের জন্য উদাহরণ ও আদর্শ হতে পারে।

১৩। আরও, একই অনুগ্রহ ত্রাণকর্তা থেকেই আগত, কেননা তিনি যখন আমাদের জন্য মানুষ হয়েছিলেন, তখন মৃত্যুবরণ করায় তিনি আমাদের খাতিরে নিজের দেহ অর্পণ করেছিলেন যাতে আমাদের সকলকে মৃত্যু থেকে মুক্ত করে দিতে পারেন। এবং তাঁর নিজের স্বর্গীয় ও মঙ্গলময় জীবন দেখাবার জন্য বাসনা ক'রে তিনি নিজেতে সেই জীবনের আদর্শ ব্যক্ত করলেন যাতে করে তাঁর রক্ষার অঙ্গীকারের অধিকারী হওয়ায়, তথা আমাদের খাতিরে দিয়াবলের উপরে তাঁর অর্জিত বিজয়ের অধিকারী হওয়ায় কেউই যেন শত্রু দ্বারা আর তত সহজে প্রবঞ্চিত না হতে পারে। এবং প্রকৃতপক্ষে ঠিক এই কারণে তিনি কেবল শিক্ষা প্রদান করেননি, বরং যা শেখাতেন তা সম্পাদনও করলেন, যাতে তিনি কথা বললে এক একজন শুনতে পায়, ও প্রতিমূর্তিতেই যেন দে'খে এক একজন তাঁর কাছ থেকে কাজ করার একটা আদর্শও পেতে পারে তাঁর একথা শুনে, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়* (ক)। প্রভু যে সদ্‌গুণ বিষয়ক শিক্ষা নিজেতে ব্যক্ত করলেন, সেটার চেয়ে উত্তম শিক্ষা কেউই কোথাও পেতে পারবে না। কেননা বিষয়টা অনিষ্ট-বরণ হোক, অথবা মানব-ভালবাসা, বা মঙ্গলময়তা

বা সৎসাহস বা করুণা বা ন্যায়-অন্বেষণ হোক, তবু একজন সেই সবকিছু তাঁর মধ্যে বর্তমান বলে পাবেই, যার ফলে যে কেউ তাঁর মানবজীবন সূক্ষ্ম ভাবে নিরীক্ষণ করে, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে তার পক্ষে কিছুরই অভাব হয় না। তেমনটা জেনে পল বলেছিলেন, *তোমরা আমার অনুকারী হও, আমিও যেমন খ্রিস্টের* [খ]। গ্রীকদের মধ্যে সেই বিধানকর্তারা কেবল কথন দিক দিয়েই সেই অনুগ্রহের অধিকারী, কিন্তু সবার সত্যকার ঈশ্বর বলে ও সবার জন্য উদ্বিগ্ন ঈশ্বর বলে প্রভু ধর্মময় কর্ম সম্পাদন করলেন, এবং তিনি যে শুধু বিধান জারি করলেন তা নয়, বরং যারা কর্ম সম্পাদন করার প্রভাব জানতে ইচ্ছা করে, তাদের জন্য আদর্শ হিসাবে নিজেকেই অর্পণ করলেন। এবং ঠিক একারণেই আমাদের মাঝে তাঁর অবস্থানের আগে তিনি এসবকিছু সামসঙ্গীতগুলোতে ধ্বনিত করেছিলেন, যাতে করে তিনি যেমন পার্থিব ও স্বর্গীয় মানুষের জন্য নিজেতেই নমুনা ব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি যে কেউ তেমনটা করতে ইচ্ছা করে, সে সামগুলোতে প্রতিটি আবেগের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও সংশোধনও পেয়ে সামসঙ্গীতগুলো থেকেও প্রাণের আবেগ ও মনোভাব শিখতে পারে।

সামসঙ্গীত-মালার শ্রেণিবিভাগ

১৪। এবিষয়ে আরও সুনিশ্চিত হবার জন্য যদি কারও পক্ষে বেশি কথা দরকার হয়, তবে আমরা এটা বলব যে, গোটা পবিত্র শাস্ত্র হলো গুণাবলি বিষয়ে ও বিশ্বাস সংক্রান্ত সত্যগুলো বিষয়ে শিক্ষক, এবং সামসঙ্গীত-মালা হলো প্রাণের জীবনধারণের জন্য প্রকৃত প্রতিমূর্তির অধিকারী। কেননা যেমন যে কেউ রাজার সাক্ষাতে এসে অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনোভাব ধারণ করে পাছে ভিন্নভাবে কথা বললে তাকে রুক্ষ বলে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি যে কেউ সদ্‌গুণ দৌড়-প্রতিযোগিতায় ছুটছে ও দেহে ত্রাণকর্তার জীবনী জানতে ইচ্ছা করে, তার কাছে পবিত্র পুস্তকাদি পাঠের মাধ্যমে আগে প্রাণের আবেগসমূহ স্মরণ করায়, ও এইভাবে পরবর্তী বিষয়গুলো একটার পর একটা উপস্থাপন করে ও সেই শব্দগুলো দ্বারা পাঠককে শিক্ষা প্রদান করে। যাতে একজন সেই পুস্তকে সর্বপ্রথমে এ নিয়ম সঠিক ভাবে পালন করতে পারে, সেজন্য কতগুলো সাম বর্ণনামূলক ভাবে উপস্থাপিত, অন্য সামগুলো নৈতিক উপদেশ হিসাবে,

অন্যগুলো ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে, অন্যগুলো প্রার্থনা হিসাবে ও অন্যগুলো স্বীকারোক্তি হিসাবে উপস্থাপিত। যেগুলো বর্ণনামূলক ভাবে উপস্থাপিত, সেগুলো হলো ১৯, ৪৪, ৪৯, ৫০, ৭৩, ৭৭, ৮৯, ৯০, ১০৭, ১১৪, ১২৭ ও ১৩৭ নং সাম। প্রার্থনা হিসাবে উপস্থাপিত সামগুলো হলো ১৭, ৬৮, ৯০, ১০২, ১৩২ ও ১৪২ নং সাম। যেগুলো যাচনা, প্রার্থনা ও মিনতি সংক্রান্ত, সেগুলো হলো ৫, ৬, ৭, ১২, ১৩, ১৬, ২৫, ২৮, ৩১, ৩৫, ৩৮, ৪৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ১৩৮, ১৪০ ও ১৪৩ নং সাম। এবং যে সাম আবেদন ও ধন্যবাদ-জ্ঞাপন শৈলীতে উপস্থাপিত, সেটা হলো ১৩৯ নং সাম। যেগুলো কেবল যাচনা উপস্থাপন করে, সেগুলো হলো ৩, ২৬, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৪, ৭৯, ৮০, ১০৯, ১২৩, ১৩০ ও ১৩১ নং সাম। ৯-১০, ৭৫, ৯২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১৩৬ ও ১৩৮ নং সাম স্বীকারোক্তিতে চিহ্নিত। যেগুলো স্বীকারোক্তি ও বর্ণনার সমন্বয়ে চিহ্নিত, সেগুলো হলো ৯-১০, ৭৫, ১০৬, ১০৭, ১১৮, ১৩৮ নং সাম। যে সাম প্রশংসা সহ স্বীকারোক্তি ও বর্ণনার সমন্বয়েও চিহ্নিত, তা হলো ১১১ নং সাম। এবং ৩৭ নং সাম উপদেশমূলক বাণী ব্যক্ত করে। যে সামগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো হলো ২১, ২২, ৪৫, ৪৭ ও ৭৬ নং সাম। ১১০ নং সামতে ভবিষ্যদ্বাণী সহ সংবাদ অন্তর্ভুক্ত। যে সামগুলো অনুরোধ করে ও নির্দেশ দেয়, সেগুলো হলো ২৯, ৩৩, ৮১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৪ ও ১১৪-১১৫ নং সাম। ১৪৯ নং সাম উপদেশ ও সেইসঙ্গে প্রশংসাগান ব্যক্ত করে। ৯১, ১১৩, ১১৭, ১৩৫, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭:১-১১, ১৪৮ ও ১৫০ নং সাম প্রশংসা ব্যক্ত করে। ৮, ৯-১০, ১৮, ৩৪, ৪৬, ৬৩, ৭৭, ৮৫, ১১৬, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৯ ও ১৪৪ নং সাম হলো ধন্যবাদজ্ঞাপক সামসঙ্গীত। ১, ৩২, ৪১, ১১৯ ও ১২৮ নং সাম সুখ-অঙ্গীকার প্রচার করে। ১০৮ নং সাম মনের আগ্রহ গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করে। ৮১ নং সাম সৎসাহসের জন্য উপদেশ প্রদান করে। ২, ১৪, ৩৬, ৫২ ও ৫৩ নং সাম ভক্তিহীন ও অপকর্মাদের ভর্ৎসনা করে। ৪ নং সাম আহ্বানে চিহ্নিত সাম। ২০ ও ৬৪ নং সামের মত এমন সামও রয়েছে যেগুলো ঈশ্বরের কাছে মিনতির কথার সংবাদ দেয়। যেগুলো প্রভুতে গৌরবকীর্তন করে, সেগুলো হলো ২৩, ২৭, ৩৯, ৪০, ৪২, ৬২, ৭৬, ৮৪, ৯৭, ৯৯ ও ১৫১ নং সাম [ক]। ৫৮ ও ৮২ নং

সাম লজ্জার মনোভাব জাগায়। এবং ৪৮ ও ৬৫ নং সাম স্তুতিগানের কণ্ঠ ব্যক্ত করে। ৬৬ নং সাম এমন উল্লাসের সাম যা পুনরুত্থান লক্ষ করে। অন্য একটা সাম যা উল্লাসের বাণী ব্যক্ত করে, তা হলো ১০০ নং সাম।

১৫। সুতরাং, যেহেতু সামসঙ্গীতগুলোর অনুক্রম এধরনের, সেজন্য, যেমন আগেও বলেছি, পাঠকের পক্ষে এমনটাও সম্ভব হয় যেন সে এক একটা সামসঙ্গীতে প্রাণের সেই গতি ও সমতা আবিষ্কার করে যা এক একটার জন্য উপযোগী, যেইভাবে পাঠকেরা এক একটা সামসঙ্গীতের সম্পর্কযুক্ত ধরণ ও শিক্ষা আবিষ্কার করতে পারে। একইপ্রকারে এমনটাও শেখা যেতে পারে, প্রভুকে তুষ্ট করার জন্য একজনকে কী বলতে হবে ও কোন্ ধরনের বাক্যের মাধ্যমে একজন নিজেকে সংশোধন করতে পারে ও প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারে। এসবকিছুর উদ্দেশ্যই যাতে যে কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তেমন বাক্যসমূহ অনুযায়ী কথা বলে, তাকে যেন অভক্তিতে পতিত না হবার জন্য প্রতিরোধ করা হয়। কেননা কেবল কর্মের জন্য নয়, অসার কথনের জন্যও সেই বিচারকের কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। উপরন্তু, তুমি যদি একজনকে সুখী বলে ঘোষণা করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তুমি ১, ৩২, ৪১, ১১২, ১১৯ ও ১২৮ নং সামসঙ্গীতে এমনটা শিখতে পার কেমন করে ও কার্ নামে তেমনটা করা উচিত ও কী বলা প্রয়োজন। তুমি যদি ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে ইহুদীদের ছলনা নিন্দা করতে ইচ্ছা কর, তাহলে তোমার জন্য ২ নং সাম রয়েছে। তুমি যখন তোমার আপন জাতির মানুষদের দ্বারা নির্যাতিত ও তোমার বিরুদ্ধে যারা রুখে দাঁড়ায় তারা অনেকে, তখন তুমি ৩ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করবে। এবং সেইভাবে দুঃখক্লিষ্ট হলে তুমি যদি সাহায্যের জন্য প্রভুকে যাচনা করে থাক, ও তিনি তোমার প্রতি মনোযোগ দিলে পর তুমি যদি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা কর, তাহলে ৪ নং সামসঙ্গীত গান কর, ও সেইসঙ্গে ৭৫ ও ১১৬:১-৯ নং সামও গান কর। এবং যারা তোমার জন্য ফাঁদ পাততে ইচ্ছা করে, তুমি সেই অপকর্মাদের লক্ষ করতে করতে যখনই ইচ্ছা কর প্রভু তোমার প্রার্থনায় কান দেবেন, তখন ভোর সকালে উঠে ৫ নং সামসঙ্গীত গান কর। এবং যখন তুমি প্রভুর কাছ থেকে আগত কোন একটা হুমকি অনুভব কর, তখন তুমি এতে বিচলিত বোধ করলে

তবে তোমার পক্ষে ৬ ও ৩৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করা সম্ভব। এবং যদিও কেউ না কেউ তোমার বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি করে যেইভাবে আহিথোফেল দাউদের বিরুদ্ধে করেছিল, ও কেউ না কেউ সেবিষয়ে তোমাকে খবর দেয়, তখন ৭ নং সামসঙ্গীত গান কর ও তোমার রক্ষাকর্তা ঈশ্বরে ভরসা রাখ।

১৬। যখন তুমি ত্রাণকর্তার সর্বত্রই বিস্তৃত অনুগ্রহকে ও বিমুক্ত মানবজাতিকে লক্ষ কর, তখন যদি প্রভুকে সম্বোধন করতে ইচ্ছা কর, তখন ৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, তুমি যদি প্রভুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আঙুর-মাড়াইকুণ্ডের কথা গান করতে ইচ্ছা কর, তাহলে সেই একই ৮ নং সামসঙ্গীত ও সেইসঙ্গে ৮৪ নং সামসঙ্গীত বেছে নাও [ক]। কিন্তু শত্রুর উপরে জয়লাভের সম্মানার্থে ও সৃষ্টি রক্ষার্থে তুমি যদি নিজেতে বড়াই না করে কিন্তু যিনি তেমনটা সাধন করেছেন সেই ঈশ্বরের পুত্রকে জেনে, যে সামসঙ্গীত তাঁকে উদ্দেশ করে কথা বলে, সেই ৯-১০ নং সামসঙ্গীত গান কর। যখনই কেউ তোমাকে প্রচন্ড ভাবে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, তখন প্রভুতে ভরসা রাখ ও ১১ নং সামসঙ্গীত গান কর। এবং যখন তুমি ভিড়ের দম্ভ ও সেই অনিষ্ট লক্ষ কর যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে মানুষদের মধ্যে পবিত্র বলতে আর কিছু থাকে না, তখন প্রভুর কাছে আশ্রয় নাও ও ১২ নং সামসঙ্গীত গান কর। কিন্তু তোমার শত্রু থেকে আগত অনিষ্ট যদি দৈনিকই হয়, তখন ঈশ্বর দ্বারা বিস্মৃত মানুষের মত নিজেকে অবহেলিত বোধ করো না, কিন্তু ১৩ নং সামসঙ্গীত গান করতে করতে প্রভুকে অনুনয় কর। এমনটা হলে যে তুমি ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানের নিন্দুকদের কথা শোন, তবে তাদের অভক্তিতে যোগ দিয়ো না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়ে ১৪ ও ৫৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। তারপর, স্বর্গরাজ্যের নাগরিকেরা যে কেমন ধরনের, যদি তুমি তা জানতে ইচ্ছা কর, তাহলে ১৫ নং সামসঙ্গীত গান কর।

১৭। যারা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ও তোমার প্রাণ ঘিরে ফেলেছে, তাদের কারণে তোমার এমন প্রার্থনা দরকার হলে, তবে ১৭, ৮৬, ৮৮ ও ১৪১ নং সামসঙ্গীত গান কর। অথবা, মোশি কেমন করে প্রার্থনা নিবেদন করতেন, তুমি তেমনটা জানতে ইচ্ছা করলে তবে তোমার জন্য ৯০ নং সামসঙ্গীত রয়েছে। এসো, এমনটা ধরে নিই, তুমি

তোমার শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলে ও তোমার নির্যাতকদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছিলে। তবে ১৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। এসো, এমনটাও ধরে নিই, তুমি সৃষ্টির সুবিন্যস্ততায়, সেই সৃষ্টিতে বিদ্যমান [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞানের অনুগ্রহে, ও বিধানের পবিত্র নিয়ম-বিধিতে বিস্মিত। ১৯ ও ২৪ নং সামসঙ্গীত গান কর। যখন তুমি দুঃখক্লিষ্টদের দেখ, তখন ২০ নং সামসঙ্গীতের বাণী ব্যবহার করে ও প্রার্থনা করে তাদের উৎসাহিত কর। প্রভু যে তোমাকে চরান ও ন্যায়পথে চালনা করেন, তেমনটা উপলব্ধি ক'রে তাতে আনন্দিত মনে ২৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, এমনটা ধরে নিই, তোমার শত্রুরা তোমাকে ঘিরে ফেলেছে; তাসত্ত্বেও তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রাণ উত্তোলন করে ২৫ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর, এবং তিনি এমনটা দেখবেন যাতে তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজেদের অপকর্ম বৃথাই করে। তারা তখনও সেখানে অবস্থান করবে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের রক্তাক্ত হাত ছাড়া তাদের অন্য কিছু নেই যদিও তারা তোমাকে আঘাত করতে ও বিনাশ করতে সচেষ্ট। তাদের বিচারের ভার কোন মানুষের উপর আরোপ করো না (কেননা যা কিছু মানবীয় তা সন্দেহের বিষয়), কিন্তু ঈশ্বরকে বিচার করতে যোগ্য বলে গণ্য ক'রে (কারণ কেবল তিনিই ন্যায়বান) তুমি ২৬, ৩৫, ও ৪৩ নং সামসঙ্গীতের কথা আবৃত্তি কর। এবং তারা তোমাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করলে ও তোমার শত্রুরা তোমার দিকে অবজ্ঞার চোখে দে'খে পদে পদে এগিয়ে এসে ভিড় করলে ও তোমাকে তৈলাভিষিক্ত মনে না করে তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী হলে, তাতে তুমি ভয়ে অভিভূত হয়ো না, বরং ২৭ নং সামসঙ্গীত গান কর। কিন্তু যেহেতু মানব স্বভাব দুর্বল, সেজন্য, যারা ফাঁদ ফেলে তারা লজ্জাকর ভাবে ব্যবহার করলে, তুমি ২৮ নং সামসঙ্গীত গান করতে করতে তাদের অবজ্ঞা করার জন্য ঈশ্বরকে ডাক। এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে তুমি যদি জানতে ইচ্ছা কর প্রভুর কাছে কী নিবেদন করা প্রয়োজন, তাহলে আত্মিক চিন্তা ভাবতে ভাবতে ২৯ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, তোমার নিজের গৃহ উৎসর্গীকৃত করার সময়ে, অর্থাৎ নিজের সেই প্রাণকেই উৎসর্গীকৃত করার সময়ে যে প্রাণ প্রভুর দ্বারা গৃহীত হয়েছে ও সেই ঘরও যেখানে তুমি দৈহিক ভাবে বাস কর, তেমনটাই উৎসর্গীকৃত করার সময়ে তুমি ধন্যবাদ জানাও এবং ৩০ ও আরোহণ-সঙ্গীতগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১২৭ নং সামসঙ্গীত গান কর।

১৮। যখন এমনটা লক্ষ কর যে, সত্যের খাতিরে তোমার সকল বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন দ্বারা তুমি অবজ্ঞাত ও নির্যাতিত, তখন তাদের ও তোমার নিজের ব্যাপারে যত্ন করতে নিরস্ত হয়ো না; এবং যদি এমনটা দেখ যে, তোমার পরিচিতরা তোমার বিরুদ্ধে ফেরে, শঙ্কিত হয়ো না, কিন্তু তাদের কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করে ভবিষ্যতের দিকে মন ফেরাও ও ৩১ নং সামসঙ্গীত গান কর। বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে যারা ও ক্ষয়প্রাপ্ত জন্ম থেকে বিমুক্ত যারা, যখন তুমি তাদের দেখে মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা বিষয়ে বিস্মিত হও, তখন সেই সমস্ত মানুষদের সামনে ৩২ নং সামসঙ্গীতের কথার মধ্য দিয়ে তোমার প্রশংসা গান কর। যখন ন্যায়বান মানুষ ও সৎজীবন যাপন করে এমন লোকদের সমবেত করে তুমি অনেকের সাহচর্যে গান করতে ইচ্ছা কর, তখন ৩৩ নং সামসঙ্গীতও গান কর। যখন তুমি তোমার শত্রুদের সম্মুখীন হয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের কাছ থেকে পালাও ও তাদের ছলনা এড়াও, তখন নম্র মানুষদের সমবেত করে যদি তোমার কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে ইচ্ছা কর, তবে তাদের সাক্ষাতে ৩৪ নং সামসঙ্গীত গান কর। যারা বিধান লঙ্ঘন করে, যখন তাদের মধ্যে অনিষ্টের প্রতি আগ্রহ লক্ষ কর, তখন এমনটা ভেবো না যে অনিষ্ট তাদের স্বভাবে রয়েছে, কেননা তারাই তেমনটা সমর্থন করে যারা ভ্রান্তমতপন্থী; তুমি বরং ৩৭ নং সামসঙ্গীত গান কর ও তখন দেখবে যে, অনিষ্ট ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই দায়ী। যখন তুমি লক্ষ কর, অযোগ্য মানুষেরা বিধান বিরুদ্ধ বহু অপকর্ম সাধন করে ও নম্র মানুষদের বিরুদ্ধে নিজেদের উত্তোলিত করে, কিন্তু তুমি কোন একজনকে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করতে ও তাদের অনুকরণ না করতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা কর যেহেতু তেমন অপকর্মারা শীঘ্রই উবে যায়, তখন নিজের কাছে ও অন্যান্যদেরও কাছে ৩৭ নং সামসঙ্গীত গান কর।

১৯। তাই যখন তুমি নিজের বিষয়ে মনোযোগ দেবে বলে মনস্থ কর, তখন তুমিও যদি এমনটা দেখ যে, সেই শত্রু আক্রমণ চালাচ্ছে (কেননা সে সবসময়েই তেমন মানুষদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়), ও যদি তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের লক্ষ্যে নিজেকে দৃঢ় করতে ইচ্ছা কর, তবে ৩৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং যখন শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেয়, তখন তুমি যদি পরীক্ষার সামনে নিষ্ঠাবান থাক, তবে ৪০ নং

সামসঙ্গীত গান কর। কিন্তু যখন তুমি অভাবগ্রস্ত ও গরিব বহু মানুষকে দেখে তাদের প্রতি দয়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে ইচ্ছা কর, তখন ৪১ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করার মাধ্যমে তুমি তাদেরও সমর্থন করতে সক্ষম হবে যারা ইতিমধ্যে দয়ার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে, ও তেমনটা করতে তুমি অন্যান্যদেরও প্রেরণা দিতে সক্ষম হবে। এবং ঈশ্বরের জন্য অধিক ব্যাকুল হয়ে তুমি যদি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তোমাকে ভর্ৎসনা করতে শোন, তবে এতে বিঘ্নিত হয়ো না, বরং তেমন ব্যাকুলতা থেকে আসন্ন সেই অমর ফলের কথা ভেবে ঈশ্বরে স্থাপিত প্রত্যাশা দ্বারা তোমার প্রাণের উপর সানন্দে জয়ধ্বনি তোল। এবং সেই প্রত্যাশায় প্রাণের জীবনকালীন কষ্ট বহন করতে করতে ও প্রাণকে নরম করতে করতে ৪২ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং পিতৃগণের জন্য ঈশ্বরের সাধিত দয়াকর্মের কথা অবিরতই মনে রাখতে ইচ্ছা ক'রে এবং মিশর থেকে মুক্তিযাত্রার কথা ও মরুপ্রান্তরে অতিবাহিত কালের কথা ভেবে ঈশ্বর যে কেমন মঙ্গলময় কিন্তু মানুষ যে কেমন অকৃতজ্ঞ তেমনটাও মনে রাখতে ইচ্ছা ক'রে তুমি ৪৪, ৭৮, ৮৯, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১৪ ও ১১৫ নং সামসঙ্গীত ব্যবহার করতে পার। এবং ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়ে ও তোমার চারদিকে ঘটতে থাকে এমন ক্লেশ থেকে সুরক্ষিত হয়ে তুমি যদি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ও তোমার কাছে আসা তাঁর মানবপ্রীতির কথা বর্ণনা করতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার জন্য রয়েছে ৪৬ নং সামসঙ্গীত।

২০। কিন্তু এসো, এমনটা ধরে নিই যে তুমি পাপ করেছ, ও সেবিষয়ে লজ্জাবোধ করে অনুতাপ কর ও এমনটা যাচনা কর যেন ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া দেখান; তবে এক্ষেত্রে তুমি ৫১ নং সামসঙ্গীতে পাপস্বীকার ও অনুতাপের বাণী পাবে। এবং যদি খারাপ কোন রাজার কাছ থেকে অপবাদের কারণে যন্ত্রণা ভোগ করছ এবং এমনটা দেখ যে, অপবাদকারী বড়াই করছে, তবে সেই স্থান থেকে সরে যাও ও তখন ৫২ নং সামসঙ্গীতের বাণীও উচ্চারণ কর। এবং যখন তোমাকে ধাওয়া করা হচ্ছে ও কোন না কোন ব্যক্তি নিন্দাজনক কথা বলার জন্য ষড়যন্ত্র করছে এই আশায় যে তারা তোমাকে বিচারালয়ে তুলে দেবে যেইভাবে জিফ মরুপ্রান্তর বাসীরা ও অন্যান্য গোষ্ঠী দাউদের বেলায় করেছিল [ক], তবে শ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ো না, বরং প্রভুতে ভরসা রেখে ও তাঁর

স্তুতিগান করতে করতে ৫৪ ও ৫৬ নং সামসঙ্গীতের বাণী আবৃত্তি কর। এবং তোমাকে যে ধাওয়া করে, সে তোমাকে ধরে ফেললেও ও তুমি যে গুহায় লুকিয়ে রয়েছ সে অজান্তে সেখানে প্রবেশ করলেও (খ) তোমাকে ভয়ে অভিভূত হতে হবে না, কেননা তেমন দুরবস্থায় তোমার জন্য ৫৭ নং সামসঙ্গীতের শিরনামের বাণী ও ১১৬:১-৯ নং সামসঙ্গীতের উৎসাহদায়ী বাণী রয়েছে। তোমার বিরুদ্ধে যে মতলব করছে, [পুলিশ দ্বারা] তোমার ঘরের উপর যেন নজর রাখা হয় সেই মর্মে সে তেমন ব্যবস্থা করলে তুমি যদি পালাতে পার, তাহলে প্রভুর কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, এমনকি সেই কৃতজ্ঞতার কথা একটা স্মৃতিস্তম্ভেই যেন তোমার প্রাণে খোদাই করে লেখ, কেননা তা এমন স্মৃতিচারণ যে তুমি বিনাশ থেকে উদ্ধার পেয়েছ; এবং ৫৯ নং সামসঙ্গীতের বাণী আবৃত্তি কর। তোমাকে কষ্ট দেয় এমন শত্রু যদি তোমাকে অপমান করে ও যাদের বন্ধু মনে হচ্ছিল তারাও যদি উঠে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে যার ফলে তুমি কিছুকালের মত তোমার ধ্যান-চর্চায় বিঘ্নিত হও, তাসত্ত্বেও ৫৫ নং সামসঙ্গীতের বাণী দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তুমিও সান্ত্বনার পাত্র হতে সক্ষম হবেই। যারা ভঙ্গি করে ও একেবারে বড়াই করে, তারা যেন নমিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে তুমি ৫৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। কিন্তু তোমার প্রাণ কেড়ে নেবার লক্ষ্যে যারা হিংস্র ভাবে তোমার বিরুদ্ধে ছোটে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে তোমার বাধ্যতা নিবেদন ক'রে তুমি সাহস ধর। কেননা তারা যত উত্তেজনা দেখায়, তার চেয়ে আরও বেশি করেই তোমাকে প্রভুর কাছে নিজেকে বশীভূত করতে হয়; তেমন অবস্থায় তুমি ৬২ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করবে। এবং নির্যাতিত হওয়ার সময়ে তুমি যদি প্রান্তরে গিয়ে আশ্রয় নাও, তবে তুমি একাই যেন ভীত হয়ো না, কেননা সেখানে ঈশ্বরই তোমার সঙ্গী; এবং সেদিন ভোরের আগে উঠে তুমি ৬৩ নং সামসঙ্গীত গান কর (গ)। যখন শত্রু ওত পেতে থাকতে থাকতে, এমনকি তোমাকে সর্বস্থানে খোঁজ করতে করতে তোমাকে আতঙ্কিত করে, তারা সংখ্যায় বহুজন হলেও তুমি ভেঙে পড়ো না, কেননা যখন তুমি ৬৪, ৬৫, ৭০ ও ৭১ নং সামসঙ্গীতের বাণী গান কর, তখন *তাদের ক্ষত হবে নির্বোধ বালকদের অস্ত্র দ্বারা হানা ক্ষত* (ঘ)।

২১। যখনই তুমি গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে ইচ্ছা কর, তখন ৬৫ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। এবং যদি তুমি পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন না কোন ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে ৬৬ নং সামসঙ্গীত গান কর। তুমি ৬৭ নং সামসঙ্গীত গান করতে করতে, ঈশ্বর যেন তোমার প্রতি দয়া দেখান তুমি তেমনটা যাচনা করতে করতে ঈশ্বরের প্রশংসা কর। যখন তুমি লক্ষ কর, ভক্তিহীনেরা শান্তিতে বিকশিত হয় কিন্তু ন্যায়বানেরা ক্লেশ ভোগ ক'রে সম্পূর্ণ হতাশায় জীবনযাপন করে, তখন ৭৩ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর, পাছে তোমাকে হোঁচট খেতে হয় ও ভিত্তিমূল থেকে কম্পান্বিত হতে হয়। এবং যখনই ঈশ্বরের ক্রোধ জনগণের উপরে আলোড়িত হয়, তখন তেমন অবস্থায় সান্ত্বনা স্বরূপ তোমার জন্য রয়েছে ৭৪ নং সামসঙ্গীত। যখন তোমার পাপস্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তখন ৯-১০, ৭৫, ৯২, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১৩৬ ও ১৩৮ নং সামসঙ্গীত গান কর। যেহেতু ঈশ্বরজ্ঞান গ্রীকদের ও ভ্রান্তমতপন্থীদের একজনেরও মধ্যে নেই, কিন্তু কেবল কাথলিক মণ্ডলীতেই উপস্থিত, সেজন্য তেমনটায় তুমি খুশি হলে তাদের অভিমত লজ্জায় অভিভূত করার জন্য ৭৬ নং সামসঙ্গীতের বাণী আবৃত্তি কর বা গান কর। কিন্তু যখন শত্রুরা তোমার পালাবার পথ বন্ধ করে, এমনকি ভীষণ অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে তুমি যখন উদ্বেগে নিমজ্জিত হও, তখন নিরাশ না হয়ে বরং প্রার্থনা কর। এবং তোমার চিৎকার শোনা হলে তুমি ৭৭ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও। প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছুটে এলে ও আক্রমণ করলে এবং তারা আক্রমণ চালাতে চালাতে ঈশ্বরের গৃহ অপবিত্র করলে, পবিত্রজনদের হত্যা করলে, তাদের দেহ আকাশের পাখিদের খাদ্য রূপে দিলে, তাদের হিংস্রতার সামনে তোমাকে যেন সঙ্কুচিত অবস্থায় ভয়ে অভিভূত না হতে হয়, তবে কষ্টভোগীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাও ও ৭৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করে ঈশ্বরকে ডাক।

২২। কোন পর্বদিনে ঈশ্বরের স্তুতিগান করতে ইচ্ছা করলে যখন তুমি ঈশ্বরের সেবকদের একত্রে সমবেত কর, তখন ৮১ ও ৯৫ নং সামসঙ্গীত গান কর। আরও, যখন শত্রুরা সব দিক থেকে একত্রে সম্মিলিত হয়ে ঈশ্বরের গৃহের বিরুদ্ধে হুমকি ছড়ায় ও সেইসঙ্গে প্রকৃত ভক্তির বিরুদ্ধে সন্ধিবদ্ধ হয়, তখন, ভিড়ের সংখ্যার জন্য ও তাদের প্রতাপের

জন্য পাছে তুমি হতাশ হও, সেসময়ে তোমার আশার নোঙ্গর হিসাবে ৮৩ নং সামসঙ্গীতের বাণী আছে। এবং ঈশ্বরের গৃহ ও তাঁর অনন্তকালীন তাঁবুগুলোকে [ক] দে'খে সেবিষয়ে প্রেরিতদূতের যেমন আগ্রহ ছিল তেমন আগ্রহ তোমার থাকলে, তবে ৮৪ নং সামসঙ্গীতও আবৃত্তি কর। সেই ক্রোধ প্রশমিত হলে ও বন্দিদশা শেষ হলে তুমি যদি ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা কর, তবে আবৃত্তি করার মত তোমার ৮৫ ও ১২৬ নং সামসঙ্গীত রয়েছে। তুমি যদি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভিমত ও কর্মকাণ্ডের তুলনায় কাথলিক মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠতা জানতে ও তাদের যুক্তি খণ্ডন করতে ইচ্ছা কর, তবে ৮৭ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতে পার। যেহেতু প্রভুতে স্থিত আশা কখনও লজ্জা জন্মায় না বরং প্রাণকে নির্ভীক করে তোলে, সেজন্য তুমি যদি ন্যায় উপাসনা ক্ষেত্রে নিজেকে সৎসাহসী ও অন্যান্যদের আস্থাবান করে তুলবে বলে মনস্থ কর, তবে ৯১ নং সামসঙ্গীতের বাণী দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা কর। তুমি কি সাব্বাৎ দিনে একটা স্তুতিগান গাইতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার জন্য ৯২ নং সামসঙ্গীত রয়েছে।

২৩। তুমি কি প্রভুর দিনে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার জন্য ২৪ নং সামসঙ্গীত রয়েছে। তুমি কি সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে তোমার স্তুতিগান ব্যক্ত করতে ইচ্ছা কর? তবে ৪৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর [ক]। তুমি কি প্রস্তুতি দিবসে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার জন্য ৯৩ নং সামসঙ্গীতে লেখা স্তুতিবাদ রয়েছে। কেননা যখন ক্রুশারোপণ হয়েছিল, তখন প্রভুর গৃহ নির্মিত হচ্ছিল যাতে শত্রুরা সেটার আক্রমণ করা থেকে বিঘ্নিত হয়। তেমন জয়লাভের কারণে, ৯৩ নং সামসঙ্গীতে যা বলা হয়, সেই বাণী ব্যবহার করে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান করা উপযোগী; এবং বন্দিদশা তোমার উপর এসে পড়লে সেই গৃহ ধ্বংসিত হওয়ার পর তা পুনরায় নির্মিত হলে, তবে ৯৬ নং সামসঙ্গীতের বাণী গান কর [খ]। যখন দেশ যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত হয় ও সেসময় থেকে শান্তি ভোগ করে ও প্রভু রাজত্ব করেন, তখন তুমি যদি এজন্য তোমার স্তুতিগান নিবেদন করতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার জন্য রয়েছে ৯৭ নং সামসঙ্গীত। তুমি কি সপ্তাহের চতুর্থ দিনে গান করতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার জন্য রয়েছে ৯৪ নং সামসঙ্গীত। কেননা সেসময় প্রভু মৃত্যু পর্যন্ত মৃত্যুশাস্তি অনুশীলন করায়

প্রতিফল দাবি করতে ও সৎসাহসী বচনে নিজের কথা ঘোষণা করতে শুরু করেছিলেন। তাই সুসমাচার পাঠ করার সময়ে যখন তুমি এমনটা দেখ যে ইহুদীরা সপ্তাহের চতুর্থ দিনেই প্রভুর বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ নিতে লাগল, তখন তুমি যখন এমনটা উপলব্ধি কর যে আমাদের খাতিরে তিনি স্পষ্টভাবে দিয়াবলের শাস্তির কথা বলেন, তখন তুমি ৯৪ নং সামসঙ্গীতের বাণী আবৃত্তি কর। এবং তুমি প্রভুর পূর্বজ্ঞান ও সবকিছুর উপরে তাঁর প্রভুত্ব পুনরায় দে'খে ও তাঁর প্রতি আস্থা ও বাধ্যতা বিষয়ে কাউকে উদ্বুদ্ধ করতে ইচ্ছা ক'রে, ও এতেই তাদের মন জয় ক'রে যাতে তারা সর্বপ্রথমে তাঁকে স্বীকার করে, তবে তুমি ১০০ নং সামসঙ্গীত গান কর। এবং বিচার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাবের কথা জানবার পর, এবং প্রভু যে বিচার ও দয়া মিশিয়ে রায় দেন, এমনটাও জানার পর যদি তুমি তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা কর, তাহলে এই লক্ষ্যে ১০১ নং সামসঙ্গীত উপযোগী।

২৪। যেহেতু আমাদের স্বভাব দুর্বল, সেজন্য যখন জীবনের সঙ্কটের ফলে তুমি ভিক্ষুকের মত হও, যদি সময় সময় শ্রান্ত হয়ে উৎসাহিত হতে ইচ্ছা কর, তখন তোমার জন্য ১০২ নং সামসঙ্গীত রয়েছে। এবং যেহেতু এটা অধিক সমীচীন যে, আমরা সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে ও সমস্ত অবস্থার মধ্যেও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব, সেজন্য যখন তুমি তাঁর স্তুতিবাদ করতে ইচ্ছা কর, তখন এই লক্ষ্যে তোমাকে তোমার প্রাণকে সামনের দিকে যেতে প্রেরণা দিতে হয় ও ১০৩ ও ১০৪ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি করতে হয়। তুমি কি ঈশ্বরের প্রশংসা করতে, ও তেমন প্রশংসা যে কেমন করে ও কার্ কাছে ব্যক্ত করা দরকার ও তেমন স্তুতিতে কী কী বলা সমীচীন, সেবিষয়ে কিছু জানতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার জন্য রয়েছে ১০৫, ১০৭, ১৩৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮ ও ১৫০ নং সামসঙ্গীত। প্রভু যেমন করেছিলেন, সেই অনুযায়ী তোমার কি বিশ্বাস আছে? এবং প্রার্থনা কালে যা উচ্চারণ কর, তুমি কি তা বিশ্বাস কর? তবে ১১৬:১০-১৯ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। তুমি কি নিজের বিষয়ে এমনটা উপলব্ধি কর যে, তুমি কর্ম সম্পাদনে এমনভাবে অগ্রসর হচ্ছ যার জন্য *পিছনে যা কিছু আছে আমি তা ভুলে গিয়ে সামনে যা রয়েছে সেইদিকে*

প্রাণপণে ধাবিত হই [ক] বচনটা উচ্চারণ করতে পার? তবে তোমার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে আরোহণ সঙ্গীতগুলোর ১৫টা সামগীতি [খ] আবৃত্তি করতে পার।

২৫। এসো, এমনটা ধরে নিই যে, তুমি অদ্ভুত চিন্তাধারার বন্দি হয়েছ ও নিজের বিষয়ে এমনটা উপলব্ধি কর যে তোমাকে ভোলানো হয়েছে, এবং অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে বিরত থাকবে বলে মনস্থ ক'রে (যদিও তুমি আপাতত তাদেরই মধ্যে রয়েছ যাদের দ্বারা ভ্রান্তিতে থাকাকালে তোমাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল), এখন তোমাকে চুপে চুপে বসে থেকে ১৩৭ নং সামসঙ্গীতের বাণী আবৃত্তি ক'রে তোমার আর্তনাদ সেইভাবে উচ্চারণ করতে হয় যেভাবে ইস্রায়েল জনগণ সেসময় করেছিল। যখন তুমি তোমার প্রলোভন পরীক্ষা বলে গণ্য কর, তখন যদি তুমি পরীক্ষার পরে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা কর, তাহলে তোমার জন্য ১৩৯ নং সামসঙ্গীত রয়েছে। এমনটা হতে পারে যে, তুমি পুনরায় শত্রুদের দ্বারা বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছ; তবে তুমি কি উদ্ধার পেতে ইচ্ছা কর? তবে ১৪০ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর। তুমি কি মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করতে ইচ্ছা কর? তবে ৫ ও ১৪৩ নং সামসঙ্গীত গান কর। দাউদের বিরুদ্ধে সেই গলিয়াথ যেমন, তেমনি জনগণের বিরুদ্ধে ও তোমার নিজের বিরুদ্ধে স্বৈরশাসক সেই শত্রু উত্থিত হলে তুমি ভয়ে অভিভূত হয়ো না; দাউদের মত তোমাকেও বিশ্বাস করতে হবে ও ১৪৪ নং সামসঙ্গীতের বাণী উচ্চারণ করতে হবে। সবকিছুতে বিরাজমান ঈশ্বরের কৃপায় বিস্মিত হয়ে ও তোমাকে ও অবশিষ্ট সমস্ত কিছু স্পর্শ করে তাঁর যে প্রসন্নতা, সেই প্রসন্নতার কথা স্মরণে রেখে, যদি তুমি এসমস্ত কিছুর জন্য ঈশ্বরের স্তুতি করতে ইচ্ছা কর, তবে দাউদ নিজে যা ১৪৫ নং সামসঙ্গীতে উচ্চারণ করেছিলেন, তুমিও সেই বাণী উচ্চারণ কর। তুমি কি তোমার স্তুতিগান প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করতে ইচ্ছা কর? তবে তোমার আবৃত্তির জন্য রয়েছে ৯৩ ও ৯৮ নং সামসঙ্গীত। তুমি তুচ্ছ মানুষ হলেও যদি তোমাকে তোমার ভাইদের উপরে প্রধান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে বড়াই করো না, কিন্তু যিনি তোমাকে বেছে নিয়েছেন, সেই ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ ক'রে সেই ১৫১ নং সামসঙ্গীত গান কর যা স্বয়ং দাউদেরই রচনা। এসো, এমনটা ধরে নিই যে, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনায় যে কেমন সাড়া

দিয়েছেন, তেমনটা নির্দেশ করার লক্ষ্যে তুমি সেই সমস্ত সামসঙ্গীত গান করতে ইচ্ছা কর যেগুলোতে আল্লেলুইয়া অন্তর্ভুক্ত (ক); এক্ষেত্রে তুমি ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৪-১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯ ও ১৫০ নং সামসঙ্গীত ব্যবহার করতে পার।

২৬। যখন তুমি ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত ঘটনাসমূহের গুণকীর্তন করতে ইচ্ছা কর, তখন সেইসব কিছু প্রায়ই সমস্ত সামসঙ্গীতে পেতে পার বটে, কিন্তু তোমার জন্য বিশেষভাবে ৪৫ ও ১১০ নং সামসঙ্গীতদ্বয়ই রয়েছে যেগুলো পিতা থেকে তাঁর প্রজননের কথা ও মাংসে তাঁর উপস্থিতির কথা ব্যক্ত করে। ২২ ও ৬৯ নং সামসঙ্গীতও রয়েছে যেগুলো দিব্য ক্রুশের কথা ও আমাদের খাতিরে তিনি কেমন মহৎ বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে বশীভূত করেছিলেন, সেই কথা, ও তিনি যে কেমন অসংখ্য কষ্ট বহন করেছিলে, সেই কথাও পূর্বঘোষণা করে; সেইসঙ্গে রয়েছে ২ ও ১০৯ নং সামসঙ্গীত: দু'টোই ইহুদীদের মতলব ও দুষ্টতা এবং সেইসঙ্গে যুদা ইস্কারিয়োতের বিশ্বাসঘাতকতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; ২১, ৫০ ও ৭২ নং সামসঙ্গীতও তাঁর রাজ-অধিকার, বিচারকর্তা হিসাবে তাঁর পরাক্রম, পুনরায় আমাদের খাতিরে মাংসে তাঁর উপস্থিতি, ও বিজাতীয়দের আহ্বানের কথা প্রকাশ করে। ১৬ নং সামসঙ্গীত মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান প্রমাণিত করে। ২৪ ও ৪৭ নং সামসঙ্গীত তাঁর স্বর্গারোহণ বিষয়ে সংবাদ দেয়; এবং ৯৩, ৯৬, ৯৮ ও ৯৯ নং সামসঙ্গীত পাঠ করতে করতে তোমার পক্ষে সেই সমস্ত উপকার সন্দর্শন করতে সক্ষম হওয়া উচিত যা ত্রাণকর্তা নিজের যন্ত্রণা দ্বারা আমাদের জন্য জয় করেছেন।

সামসঙ্গীত-মালা ঈশ্বরের বাণী, চিত্তগ্রাহী সঙ্গীত নয়

২৭। তাই তেমনটাই হলো মানবজাতির উপযোগিতার লক্ষ্যে সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকের বৈশিষ্ট্য; পুস্তকটায় রয়েছে এমন সামগুলো যেগুলো নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এবং অন্যান্য সামগুলোও আছে যেগুলোতে প্রায়ই রয়েছে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টের দৈহিক আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, যেমনটা আগে বলেছি। কেনই বা এধরনের বাণী

সুর ও লয় অনুযায়ী গান করা হয়, তেমন প্রশ্ন অবহেলা না করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ আমাদের মধ্যে সরলমনা যারা, যদিও তারা এমনটা বিশ্বাস করে যে, বাক্যগুলো ঐশঅনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত, তবু সুরের মধুরতা বিষয়ে এমনটা কল্পনা করে যে, সামগুলোও কানের তৃপ্তির লক্ষ্যেই গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। কিন্তু ব্যাপারটা সেই রকম নয়। কেননা শাস্ত্র এমনটা অন্বেষণ করেনি যা তৃপ্তিকর ও আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রাণের জন্য যা উপকারী সেই লক্ষ্যে নানা কারণ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে দু'টোই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কারণ হলো এ যে, ঈশ্বরের প্রশংসা যে কেবল আবৃত্তিতেই সঙ্কুচিত থাকবে, তেমনটা ঐশশাস্ত্রে শোভা পায় না, বরং সেই প্রশংসাকে হতে হবে গানের মধুর সঙ্গতিতে অলঙ্কৃত। তাই, যা বলার, তা ঘন ঘন ধারাবাহিকতায় উচ্চারিত; নূতন নিয়মের সঙ্গে তেমনটাই হলো বিধান, নবীগণ ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। অন্যদিকে অন্য বিষয় রয়েছে যেগুলো অতিরিক্ত প্রশস্ততা অনুসারে উপস্থাপিত, এবং ঠিক এধরনেরই হলো সামসঙ্গীতগুলো, কাব্যগুলো ও গীতিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য, কেননা এ দ্বারা এমনটা প্রমাণিত হবে যে, মানুষ সমস্ত শক্তি ও প্রতাপ দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসে। দ্বিতীয় কারণ এ হলো যে, যেভাবে সুরসঙ্গতি নানা বাঁশির সুর মিলিত করে, তেমনি যেহেতু প্রাণে পৃথক পৃথক নানা গতি বিদ্যমান যা অনুসারে রয়েছে যুক্তির প্রভাব, আকুল ক্ষুধা ও তীব্র আবেগ, ও এ গতিগুলো থেকে দেহের নানা অঙ্গের গতিশীলতা উদ্গত হয় যার ফলে যুক্তি এমনটা দাবি করে যেন মানুষ নিজের স্বভাবের বিপরীত বা স্বভাব-বিরুদ্ধ কিছু না করে। আর সেই অনুসারে সবচেয়ে উত্তম বিষয়গুলো যুক্তি থেকে উদ্গত হয়, কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়গুলো কামনা-বাসনা থেকে উদ্গত হয়, ঠিক সেইভাবে যেভাবে পিলাতের বেলায় ঘটে যখন তিনি বলেন, *এই মানুষের মধ্যে কোন অপরাধ আমি খুঁজে পাচ্ছি না* (ক) ও সেইসঙ্গে ইহুদীদের সঙ্কল্পে যোগ দেন। অথবা, একটা ব্যক্তি নিকৃষ্টতম বিষয় কামনা করে কিন্তু তা বাস্তবায়িত করতে অক্ষম হয়, ঠিক সেইভাবে যেভাবে সুসান্নার বর্ণনায় সেই বৃদ্ধজনদের বেলায় ঘটে; অথবা, একটা ব্যক্তি ব্যভিচার করে না কিন্তু চুরি করে; অথবা চুরি করার চেয়ে হত্যা করতে বেশি পছন্দ করে; অথবা নরহত্যা করে না কিন্তু ঈশ্বরনিন্দা করে।

২৮। তাই যাতে তেমন এলোমেলোতা আমাদের অন্তরে না ঘটে, সেজন্য যুক্তি এমনটা দাবি করে যেন প্রাণ খ্রিষ্টের মনের অধিকারী হয়, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেছিলেন (ক), যাতে করে প্রাণ সেই মনকে পরিচালক হিসাবে ব্যবহার করে ও সেটা দ্বারা নিজের আবেগের উপর প্রভুত্ব চালায় ও দেহের অঙ্গগুলো এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে যাতে সবগুলো যুক্তি অনুযায়ী নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করে। তাই, যেমন বাজনা ক্ষেত্রে একটা মেজরাব রয়েছে, তেমনি মানুষ তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র হয়ে ও [পবিত্র] আত্মার প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করায় তার সমস্ত অঙ্গগুলো ও আবেগে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য হতে ও তাঁর ইচ্ছা পালন করতে সক্ষম হয়। সামগুলোর সঙ্গতিপূর্ণ পাঠ এমনটা দেখায় যে, আমাদের চিন্তা-ভাবনা শান্ত ও সুস্থির সমতার অধিকারী। কেননা যেমন আমরা প্রাণের কল্পনাগুলো আবিষ্কার করে সেগুলোকে কথার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করি, তেমনি প্রভু এমনটা ইচ্ছা ক'রে যাতে কথাগুলোর সুর-সঙ্গতি হয়ে ওঠে প্রাণের আত্মিক সঙ্গতির চিহ্ন, সেই লক্ষ্যে তিনি এমনটা নির্ধারণ করলেন যেন কাব্যগুলো সঠিক সুর অনুযায়ী গান করা হয় ও সামসঙ্গীতগুলো যেন গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাণের বাসনাই যেন সেই প্রাণ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *তোমাদের মধ্যে যে প্রফুল্ল মনে আছে, সে সামগান করুক* (খ)। এইভাবে প্রাণে যা কিছু বিরক্তিকর, রুক্ষ ও এলোমেলো, তা মসৃণ অবস্থায় আনা হয়, ও যা দুঃখ ঘটায়, আমরা সামসঙ্গীত গান করলে তা নিরাময় হয়। *প্রাণ আমার, কেনই অবসন্ন তুমি? কেন আমার মধ্যে আমাকে কষ্ট দাও?* (গ)। যা কিছু হোঁচট খাওয়ায়, তা আবিষ্কার করা হবে, যেমনটা লেখা রয়েছে, *আমার পা প্রায়ই উল্টে যাচ্ছিল* (ঘ)। সে যাতে ভয় পায়, সেসম্পর্কে সে আশা থেকে শক্তি অর্জন করে তেমনটা ব'লে, *প্রভুই আমার সহায়ক, আমি ভয় করব না, মানুষ আমাকে কীবা করতে পারবে?* (ঙ)

২৯। যারা এইভাবে দিব্য সঙ্গীতগুলো পরিবেশন করে না, তারা সেগুলো সঠিক ভাবে গান করে না। তারা নিজেদেরই তৃপ্তি যোগায়, কিন্তু তারা নিন্দার বস্তু হয়, কারণ *প্রশংসাবাদ পাপীর মুখে শোভা পায় না* (ক)। কিন্তু যখন তারা উপরে উল্লিখিত কায়দা অনুসারে গান করে যার জন্য বাক্যগুলোর সুরসঙ্গতি প্রাণের সুবিন্যস্ততা ও [পবিত্র]

আত্মার সঙ্গে সঙ্গতি থেকে উদ্গত হয়, তখন তারা জিহ্বা দিয়ে গান করে বটে, কিন্তু মন দ্বারাও গান করে বিধায় শুধু নিজেদের উপকারার্থে নয়, কিন্তু তাদের গান শুনতে আগ্রহী যারা, তাদেরও উপকারার্থে গান করে। সেজন্য ধন্য দাউদ সৌলের জন্য এভাবে সুর শুনিয়ে ঈশ্বরের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিলেন ও সৌলের প্রাণ শান্তশিষ্ট ক'রে তাঁর কাছ থেকে সেই কষ্টকর ও উন্মাদ মনোভাব দূর করে দিলেন। যে যাজকেরা এইভাবে গান করত, তারা জনগণের প্রাণ শান্তশিষ্টতায় সম্মিলিত করত ও স্বর্গীয় গায়কদলের গায়কদের সঙ্গে তাদের একাত্মতায় আহ্বান করত। সুতরাং, সামসঙ্গীতগুলো যে মধুর সুর শুনবার বাসনায় গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, তা নয়। বরং গানের মাধ্যমে গান করাটা হলো প্রাণের ভাবনার সঙ্গতির সুনিশ্চিত চিহ্ন। বাস্তবিকই সুর-বিশিষ্ট পরিবেশন হলো মনের সুবিন্যস্ত ও নির্বিঘ্ন অবস্থার লক্ষণ। উপরন্তু, সঙ্গতিময় করতাল, সেতার ও দশতন্ত্রী বীণার সুরে পরিবেশিত ঈশ্বরের প্রশংসাগান দেহের সেই নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিচ্ছবি ও চিহ্ন যেগুলো সেতারের তারগুলোর মত সুসঙ্গতিপূর্ণ, ও প্রাণের সেই চিন্তা-ভাবনারও প্রতিচ্ছবি ও চিহ্ন যেগুলো করতালের মত হচ্ছিল, এবং এটারও চিহ্ন যে, এসমস্ত কিছু সেই [পবিত্র] আত্মার মহৎ ধ্বনি ও আদেশ ক্রমে গতিশীল ও জীবনময়, যার ফলে, যেইভাবে লেখা রয়েছে, মানুষ [পবিত্র] আত্মায় জীবিত আছে ও দৈহিক আচরণের মৃত্যু ঘটায় (খ)। কেননা তেমন সুন্দর প্রশংসা গান করতে করতে মানুষ নিজের প্রাণে ছন্দ এনে, বলতে গেলে, প্রাণকে অনুপাতহীন অবস্থা থেকে সমানুপাতে চালনা করে, ও তেমনটার ফলে, প্রাণের স্থিতমূল স্বভাবের গুণে প্রাণ আর কোন কিছুতে ভীত হয় না বরং ইতিবাচক বিষয় কল্পনা করে, এমনকি প্রাণ ভাবী মঙ্গলদানগুলোর পূর্ণ বাসনার অধিকারী হয়ে ওঠে। এবং বাক্যগুলোকে গানের মাধ্যমে স্থৈর্য অর্জন ক'রে প্রাণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগ ভুলে যায়, ও আনন্দ করতে করতে খ্রিষ্টের মন অনুসারে সবকিছু দেখে ও উত্তম ভাবনা সৃষ্টি করে।

৩০। হে আমার সন্তান, সেই পুস্তকের প্রতিটি পাঠকের পক্ষে এখন সেটা আগাগোড়াই পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন, কেননা সেই পুস্তকে যা কিছু রয়েছে তা সবই সত্যি ঐশঅনুপ্রাণিত বিষয়, কিন্তু তেমন বিষয়গুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া চাই যেইভাবে একটা

মানুষ কোন একটা উদ্যানের ফলগুলোর দিকে চোখ তুলে সময়মত সেই ফলগুলো দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, গোটা মানব জীবন, তথা প্রাণের মনোভাব ও সেইসঙ্গে চিন্তা-ভাবনার গতি, দু'টোই সামসঙ্গীত-মালা পুস্তকের প্রতিটি বাণীতে পরিমাপ করা হয়েছে ও পরিবেষ্টিত হয়েছে; এবং এটা এমন কিছু যা মানুষদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা যখন মনপরিবর্তন বা পাপস্বীকারের প্রয়োজন ছিল, বা ক্লেশ ও পরীক্ষা অকস্মাৎ আমাদের উপর পড়ল, অথবা কোন একজন নির্যাতিত ছিল বা মতলবের মধ্যে সহায়তা পেল, এমনকি, কেউ না কেউ যখন গভীরেই দুঃখার্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোতে বর্ণনা করা বিষয়ের সদৃশ কোন কিছু দ্বারা কষ্টভোগ করে, ও সে হয় অগ্রসর মানুষের মত তার শত্রু থেকে মুক্তিলাভ ক'রে নিজের প্রতি মনোযোগ দেয়, না হয় সে প্রভুর প্রশংসা গান করতে ও তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে, তখন সে যেকোনো পরিস্থিতিতেই দিব্য সামসঙ্গীতগুলো থেকে উপযোগী শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং, প্রতিটি অবস্থা-পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগুলোতে যা কিছু বলা আছে, সে তা থেকে যেটা উপযোগী সেটা বেছে নিক, ও কেমন যেন তার নিজের বিষয়েই যা লেখা হয়েছে, তা আবৃত্তি করতে করতে ও তেমন লেখা দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে সেই বিষয়গুলো ঈশ্বরের কাছে উত্তোলন করুক।

৩১। কেউই সামসমঙ্গীত-মালার বচনগুলো চিত্তগ্রাহী অপবিত্র বাক্য দ্বারা বর্ধিত না করুক, ও কেউই সেই বাক্যগুলো সংস্কৃত করতে বা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে চেষ্টা না করুক। বরং যা কিছু লেখা রয়েছে, সে সমস্ত কৃত্রিমতা বর্জন ক'রে তা সেইভাবে আবৃত্তি করুক যেভাবে তা উচ্চারিত হয়েছিল, যাতে করে, যে পবিত্র ব্যক্তিগণ তেমনটা যোগাড় করেছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের যা নিজস্ব তা চিনে নিয়ে তোমার প্রার্থনায় যোগদান করতে পারেন, এমনকি, পবিত্রজনদের মধ্যে কথা বলেন যিনি, যাতে সেই [পবিত্র] আত্মাই সেগুলোতে নিজের দ্বারা অনুপ্রাণিত বাক্য দেখে আমাদের সহায়তা করেন। কেননা যেমন পবিত্রজনদের জীবন অন্যান্য মানুষদের জীবনের চেয়ে যত গুণে উত্তম, তেমনি তাঁদের বাক্যও আমাদের গঠিত বাক্যের চেয়ে তত গুণে উচ্চতম, এমনকি সত্যকথা বললে, সেই বাক্যগুলো তত গুণে প্রভাবশালী। কেননা সেই পবিত্রজনেরা সেই

বাক্যগুলোতে ঈশ্বরকে তুষ্ট করেছিলেন, এবং তেমন কথা বলায় তাঁরা, প্রেরিতদূত যেইভাবে বললেন, সেইভাবে *তাঁরা বিশ্বাসগুণে নানা রাজ্য জয় করলেন, ধর্মময়তা অনুশীলন করলেন, সমস্ত প্রতিশ্রুতির ফল পেলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করলেন, আগুনের তেজ প্রশমিত করলেন, খড়্গের মুখ এড়ালেন, নিজেদের দুর্বলতা থেকে পরাক্রম বের করলেন, যুদ্ধে বলবান হলেন, বিদেশী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। কোন কোন নারী তাঁদের মৃত প্রিয়জনকে পুনরুত্থান গুণে ফিরে পেলেন* (ক)।

৩২। সেজন্য একই বাক্যগুলো এখনও আবৃত্তি ক'রে প্রত্যেকেই আস্থাবান হোক, কেননা যারা সেগুলো দিয়ে মিনতি জানায়, ঈশ্বর শীঘ্রই করে তাদের দিকে মনোযোগ দেবেন। তেমন বাক্যগুলো আবৃত্তি ক'রে একজন দুঃখার্ত হলে সে সেই বাক্যগুলোতে নিহিত উৎসাহদানকে মহৎ বোধ করবে; তেমনটা গান ক'রে সে পরীক্ষিত বা নির্যাতিত হলে, সে আরও যোগ্য বলে প্রদর্শিত হবে ও সেই প্রভু দ্বারা রক্ষা পাবে যিনি তাঁর উপর নজর রাখছিলেন যিনি প্রথমত সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। তেমন বাক্যগুলো দ্বারা সে দিয়াবলকে ভূপাতিত করবে ও অপদূতদের তাড়াবে। সে যদি পাপ করে থাকে, তবে সেই বাক্যগুলো উচ্চারণ করায় নিজেকে ভর্ৎসনা করবে ও পাপ থেকে বিরত থাকবে; কিন্তু সে যদি পাপ না করে থাকে, তবে সে নিজেকে আনন্দিত মানুষের মত দেখবে। এবং সে *সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত* থাকে (ক), ও পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করতে করতে, সে যখন এইভাবে গান করে, তখন শক্তি যোগাবে ও চিরকাল ধরে সত্য থেকে কোন ঝাঁকুনি বোধ করবে না, সে বরং তাদেরই লজ্জায় অভিভূত করবে যারা প্রতারণা করে ও যারা তোমাকে ধরে রাখে এই আশায় যে, তারা তোমাকে ভ্রান্তিতে চালনা করবে। এবং এসব কিছু ক্ষেত্রে মানুষ তো নয়, পবিত্র শাস্ত্রই জামিনদার। কেননা ঈশ্বর মোশিকে সেই মহা গীতিকা লিখতে ও জনগণকে তা শেখাতে আজ্ঞা করেছিলেন (খ), এবং যিনি জনপ্রধান পদে নিযুক্ত, তাঁকে তিনি দ্বিতীয় বিবরণ লিখতে, তা নিজের হাতে ধরে রাখতে, ও যত্ন সহকারে সেটার লেখার প্রতি চিরকাল ধরে বাধ্য হতে আদেশ করেন (গ), কারণ সদ্‌গুণ মনে করিয়ে দেবার জন্য ও সেইসঙ্গে যারা সরল মনে সেই বাক্যগুলো পালন করে, তাদেরও সাহায্য দেবার জন্য সেই পুস্তকের বাক্যগুলো যথেষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ, যখন যোশুয়া [প্রতিশ্রুত] দেশে প্রবেশ

করলেন, তখন তিনি শত্রুদলের বিন্যস্ত বাহিনীকে ও যুদ্ধের জন্য সমবেত আমোরীয়দের রাজাদের দেখতে পেলেন (ঘ)। এবং সেই সমস্ত শিবির ও খড়্গের সম্মুখীন হয়ে তিনি বিধানের বাক্যগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে ও সেই বাক্যগুলো দিয়ে জনগণকে অস্ত্রসজ্জিত করে সকলের কানে দ্বিতীয় বিবরণ পাঠ করলেন; তাতে তিনি শত্রুদের উপর জয়ী হলেন। এবং যখন পুস্তকটা আবিষ্কার করা হয়েছিল ও সকলের কর্ণগোচরে পাঠ করা হয়েছিল, তখন যোশিয়া রাজা শত্রুর ব্যাপারে আর ভীত হলেন না (ঙ)। এবং সময় সময় দেশেই যুদ্ধ হলে, তবে সেই যে মঞ্জুষায় বিধানের ফলক দু'টো ছিল, তা সকলের আগে আগে চলত ও যেকোনো সেনাদলের সম্মুখীন হয়ে জনগণকে রক্ষা করত যদি না তার পাশে পাশে কেউ চলত ও পুরাকালে যা প্রচলিত ছিল সেই পাপ ও ভণ্ডামি জনগণের মধ্যে বিরাজ না করত (চ)। কেননা প্রার্থনার মাধ্যমে যা যাচনা করা হয়, বিধান যেন সেই সমস্ত বিষয়ে কার্যকর হয়, তার জন্য মানুষদের মধ্যে বিশ্বাস ও সরলতার মনোভাব থাকা চাই।

৩৩। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বললেন, 'প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞাবান মানুষদের কাছ থেকে আমি শুনেছি, কেমন করে বহুদিন আগে ইস্রায়েলে তারা অপদূতদের তাড়াত ও এমনি শাস্ত্র পাঠ করলেই তাদের বিরুদ্ধে ধাবিত ফন্দি-ফিকির দূরে সরিয়ে দিত।' সেজন্য আমি বলেছি, পৌত্তলিক শৈলী অনুসারে চিত্তগ্রাহী করার জন্য বাক্যগুলো তৈরি ক'রে ও নিজেদের অপদূত বিতাড়ক বলে অভিহিত ক'রে যারা সেই বাক্যগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তারা বিচারের যোগ্য। তারা খেলায়ই যেন নিজেদের চরিতার্থ করে ও সেই অপদূত দ্বারা বিদ্রূপের বস্তু হতে নিজেদের প্রভাবাধীন করে। স্কেভার সন্তান সেই ইহুদীরা যখন এইভাবে অপদূত তাড়াতে চেষ্টা করেছিল, তখন তারা কেমন কষ্ট না পেয়েছিল (ক)। তেমন মানুষদের কাছ থেকে আসা আদেশ শুনে অপদূতেরা তাদের নিয়ে ফুর্তি করতে লাগল, কিন্তু পবিত্রজনদের বাণীতে ভয় পেত ও সেই বাণী সহ্য করতে পারত না। কেননা প্রভু শাস্ত্রের বাক্যে রয়েছেন, ও যেহেতু তারা তাঁকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম, সেজন্য চিৎকার করে বলে, *মিনতি করি, সেই সময়ের আগে আমাকে জ্বালাযন্ত্রণা দেবেন না* (খ)। কেননা প্রভুকে উপস্থিত দেখে তারা নিঃশেষিত হত। এইভাবে পল অশুচি

আত্মাদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন (গ) ও একইপ্রকারে অপদূতজাতীয় সব কিছু শিষ্যদের বশীভূত ছিল (ঘ)। এবং প্রভুর হাত নবী এলিশেয়ের উপরে এসেছিল ও যে গান করছিল সে যখন প্রভুর আজ্ঞা অনুযায়ী গান করছিল, তখন তিনি সেই তিন রাজার জল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দিতে লাগলেন (ঙ)। তাই আজও, কষ্টভোগীদের জন্য চিন্তিত হয়ে যে কেউ নিজেই এসমস্ত কিছু গান করে, সে সেই কষ্টভোগীকে আরও বেশি উপকৃত করবে ও নিজের বিশ্বাস প্রকৃত ও স্থিতমূল বলে দেখাবে, যার ফলে ঈশ্বর তেমনটা দে'খে, যাদের প্রয়োজন তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করবেন। একথা জেনেই সেই পবিত্রজন বললেন, *আমি তোমার আদেশগুলো ধ্যান করতে থাকব, তোমার বাণী কখনও ভুলব না* (চ)। আরও, *আমার এ নির্বাসনের দেশে তোমার বিধিমালা আমার কাছে সঙ্গীত যেন* (ছ); কেননা সেগুলোতে ভরসা রেখে তারা *তোমার বিধান যদি না হত আমার সুখ, তবে আমার এ দুর্দশায় হত আমার পরিণাম* (জ) বচনটা গান করে পরিত্রাণ পেত। এই কারণে পলও নিজের শিষ্যকে এবিষয়ে বলবান করতে গিয়ে বললেন, *এই সমস্ত বিষয়ে যত্নবান হও, তাতে নিষ্ঠাবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়* (ঝ)। তুমিও এবিষয়ে যত্নবান হলে ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সামসঙ্গীতগুলো এইভাবে আবৃত্তি করলে তবে [পবিত্র] আত্মা দ্বারা চালিত বিধায় তুমিও এক একটার অর্থ উপলব্ধি করবে। এবং যাঁরা এসমস্ত কিছু উচ্চারণ করেছিলেন, ঈশ্বরভীরু সেই পবিত্র মানুষেরা যে ধরনের জীবনের অধিকারী ছিলেন, তেমন জীবন তুমিও অনুকরণ করবে।

---

২ (ক) ২ তি ৩:১৬ দ্রঃ।

(খ) 'ত্রিপুস্তক' অর্থাৎ যোশুয়া, বিচারকগণ ও রুথ।

৩ (ক) সাম ১০৫:২৬-৩১ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪ (ক) সাম ২০:৮-১০ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ১২২: ২-৪ সত্তরী পাঠ্য।

৫ (ক) সাম ১১৮:২৬-২৭ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ১০৭:২০ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) আদি ১:৩…।

(ঘ) সাম ১০৩:৬।

৬ (ক) সাম ৪৫:৭-৮ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) এখানে জ্ঞানমার্গ-ভ্রান্তমতের দু'টো দিক খণ্ডন করা হচ্ছে: ১) সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এমন ধারণা সমর্থন করত যা অনুসারে ত্রাণকর্তা মাংসময় মানবস্বরূপের ছদ্মবেশেই আগমন করেছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অতি-মানবীয় অবস্থায় রয়েছিলেন; ২) সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা এও সমর্থন করত যে, বিশ্বস্রষ্টা ঐশবাণী নিম্ন স্তরের ঈশ্বর ছিলেন। এক্ষেত্রে সাধু আথানাসিউস ঘোষণা করেন যে, ত্রাণকর্তা সত্যিকারে মাংস হলেন, ও স্রষ্টা ঐশবাণী ছিলেন প্রকৃত ঈশ্বর।

(গ) সাম ৮৭:৫-৬ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) যোহন ১:১, ৩, ১৬।

(ঙ) লুক ১:২৮।

৭ (ক) সাম ২২:১৬-১৯ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) মথি ৮:১৭।

৯ (ক) ইশা ১:১৬; যেরে ৪:১৪ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) সাম ৩৭:৮।

(গ) সাম ৩৪:১৪।

১০ (ক) সাধু আথানাসিউস এমনটা বলেন যে, সামসঙ্গীত শ্রবণ ত্রিবিধ ফল ফলায়: ১) শ্রোতা এমন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ও ভাববাণী বিষয়ে অবগত হয় যা বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকে বর্ণিত; ২) গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা সামসঙ্গীত শুনে শ্রোতার অনুভূতি উন্নীত হয়; ৩) এসমস্ত কিছুর ফলে, সামসঙ্গীত সম্পর্কে প্রাথমিক উপলব্ধির চেয়ে, শ্রোতা সেই সামসঙ্গীত বিষয়ে গভীরতর উপলব্ধি অর্জন করে, কেননা শ্রোতা কেমন যেন নিজেই সেই সামসঙ্গীত রচনা করছে ও সেই সামসঙ্গীতের ব্যক্তিত্বে একীভূত হয় (এই শেষ বিষয় পরবর্তী ১১ ও ১২ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত)।

(খ) রো ৫:৪-৫।

(গ) ১ থে ৫:১৮।

(ঘ) ২ তি ৩:১২।

১১ (ক) ১ রাজা ১৭:১; ২ রাজা ৩:৪ দ্রঃ।

(খ) যাত্রা ৩৩:১২।

(গ) যাত্রা ৩২:৩২ সত্তরী পাঠ্য।

১৩ (ক) মথি ১১:২৯।

(খ) ১ করি ১১:১।

১৪ (ক) ১৫১ নং সামসঙ্গীত বাইবেলের গ্রীক সত্তরী পাঠ্যেই মাত্র উপস্থিত।

১৬ (ক) সত্তরী পাঠ্যে ৮ ও ৮৪ নং সামসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'মাড়াইকুণ্ডের জন্য'।

২০ (ক) ১ শামু ২৩:১৩ … দ্রঃ।

(খ) ১ শামু ২৪:৩ দ্রঃ।

(গ) 'ভোর' এর কথা এই সামসঙ্গীতের প্রথম পদে উল্লিখিত।

(ঘ) সাম ৬৪:৮ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২২ (ক) সাধু আথানাসিউসের মতে, ঈশ্বরের 'অনন্তকালীন তাঁবুগুলো' হলো খ্রিষ্টিয়ান গির্জাগুলো।

২৩ (ক) '… সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে … ৪৮ নং সামসঙ্গীত আবৃত্তি কর': বাস্তবিকই সত্তরী পাঠ্যের ৪৮ নং সমসঙ্গীতের শিরনাম হলো 'সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে'।

(খ) গৃহ 'পুনরায় নির্মিত হলে, তবে ৯৬ নং সামসঙ্গীতের বাণী গান কর', কারণ সত্তরী পাঠ্যের ৯৬ নং সমসঙ্গীতের শিরনাম হলো, 'যখন গৃহটা বন্দিদশার পরে নির্মিত হয়েছিল…'।

২৪ (ক) ফিলি ৩:১৩ দ্রঃ।

(খ) সাম ১২০—১৩৪।

২৫ (ক) 'আল্লেলুইয়া অন্তর্ভুক্ত' : অর্থাৎ, এ সামগুলো 'আল্লেলুইয়া' দিয়ে শুরু করে।

২৭ (ক) যোহন ১৮:৩৮।

২৮ (ক) ১ করি ২:১৬ দ্রঃ।

(খ) যাকোব ৫:১৩।

(গ) সাম ৪২:৬, ১১ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) সাম ৭৩:২ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) সাম ১১৮:৬ সত্তরী পাঠ্য।

২৯ (ক) সিরা ১৫:৯।

(খ) রো ৮:১৩ দ্রঃ।

৩১ (ক) হিব্রু ১১:৩৩-৩৫।

৩২ (ক) ফিলি ৩:১৩ দ্রঃ।

(খ) দ্বিঃবিঃ ৩১:১৯ দ্রঃ।

(গ) দ্বিঃবিঃ ১৭:১৮-১৯ দ্রঃ।

(ঘ) যোশুয়া ৮:৯ … ।

(ঙ) ২ রাজা ২২:১৩ … ।

(চ) যোশুয়া ৩:২; ১ শামু ২—৪ অধ্যায় দ্রঃ।

৩৩ (ক) প্রেরিত ১৯:১৪ দ্রঃ।

(খ) লুক ৮:২৮; মথি ৮:২৯ দ্রঃ।

(গ) প্রেরিত ১৬:১৮ দ্রঃ।

(ঘ) লুক ১০:১৭ দ্রঃ।

(ঙ) ২ রাজা ৩:১৫ দ্রঃ।

(চ) সাম ১১৯:১৬ সত্তরী পাঠ্য।

(ছ) সাম ১১৯:৫৪।

(জ) সাম ১১৯:৯২।

(ঝ) ১ তি ৪:১৫।

পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী

[আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ আমাদের পবিত্র পিতা আথানাসিউস লিখিত, ও দূরবর্তী নানা অঞ্চলে নিবাসী সন্ন্যাসীদের কাছে প্রেরিত 'আমাদের পুণ্য পিতা আন্তনির জীবনী ও কর্মকাণ্ড']

যখন সাধু আন্তনি ৩৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, তখন, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরে কোন না কোন সন্ন্যাসী সাধু আথানাসিউসকে সাধুজির যৌনবকাল, সাধনায় তাঁর সূত্রপাত ও তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কিছুটা লিখতে অনুরোধ করেন। সাধু আথানাসিউস অবিলম্বে তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে সাধুজির এমন জীবনী রচনা করেন যা এখনও খ্রিষ্টীয় সমস্ত লেখার মধ্যে অধিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন লেখা বলে স্বীকৃত। এমনকি, লেখাটা শুধু সন্ন্যাস জগতের মধ্যে নয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বস্তরের খ্রিষ্টিয়ান ও খ্রিষ্টিয়ান নয় এমন মানুষদের মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লেখাটার তেমন সার্বিক জনপ্রিয়তার কারণ এটাই হতে পারে যে, প্রতিটি পাঠক-পাঠিকা ও শ্রোতা সাধু আন্তনির জীবনে এমন কিছু পায় যা তাদের নিজেদের জীবনেও রেখাপাত করে।

এদিকে একথাও স্বীকার্য যে, সাধু আথানাসিউস নিজের লেখায় কেবল সাধুজির জীবনের বাহ্যিক ঘটনাবলি উপস্থাপন করেন না, বরং ঐশতাত্ত্বিক কতগুলো দিকের উপরেও জোর দেন যা সাধুজির জীবনকে শুধু নয়, কিন্তু প্রতিটি মানুষকেও স্পর্শ করে। ফলত পাঠক-পাঠিকা ও শ্রোতা সকল সাধুজির জীবনের কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহে নিজেদের জীবনের কষ্ট ও পরীক্ষাসমূহ চিনে নেয় এবং তেমন কড়া পরিস্থিতিতে সাধুজীর প্রতিক্রিয়া ও তাঁর দেওয়া উপদেশ নিজেদের জন্যও উপকারী বোধ করে।

বাস্তবিকই সাধু আন্তনির জীবনে আদর্শমূলক যদি কিছু থাকে, তা প্রথমত হলো ঈশ্বরের বাণীর প্রতি এমন বাধ্যতা যা সর্বকালের খ্রিষ্টিয়ানদের জন্যও পালন করা জরুরী ও অত্যাবশ্যক (২-৩ অধ্যায়)। এই পর্যায়ে (১-৪ অধ্যায়) আজকালের পাঠক-পাঠিকার স্মরণ করা উচিত যে, সেকালের লেখকেরা কোন ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাঁর এমন গুণাবলি তুলে ধরতেন যা সেই ব্যক্তিত্বকে জন্মকাল থেকেই চিহ্নিত করত যেমন জাগতিক সমস্ত কিছুর প্রতি উদাসিনতা ইত্যাদি গুণাবলি; এক্ষেত্রে সাধু আথানাসিউসও সেকালের প্রথা অনুসরণ করেন।

ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বাধ্যতা-পালন সাধু আন্তনিতে ঐশবাণীকে অধ্যয়ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প ও ঐশবাণীর প্রতি আসক্তি ও মনোযোগও সৃষ্টি করে। তেমন অধ্যয়ন ও মনোযোগের ফলে সাধু আন্তনির স্মরণশক্তিই পুস্তকের স্থান নেয় (৩ অধ্যায়); এবং পরবর্তীকালে তেমন মনোযোগ-ই দিয়াবলকে মনোযোগ না দেওয়ার জন্য আবশ্যক উপায় বলে প্রমাণিত।

কেননা দিয়াবল যখন এমন মানুষকে দেখে যে সুসমাচার অনুযায়ী জীবনে অগ্রসর হয়, তখনই বাধা সৃষ্টি করার জন্য অবিলম্বে তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে; তেমন যুদ্ধ-সংগ্রামে আন্তনি প্রার্থনা দ্বারা দিয়াবলকে পরাভূত করলেন, কেননা 'আন্তনির সঙ্গে প্রভু সক্রিয় ছিলেন' (৫ অধ্যায়)। কিন্তু সাধু আন্তনির প্রার্থনা কী ধরনের প্রার্থনা ছিল? তাঁর প্রার্থনা ছিল সামসঙ্গীত আবৃত্তি করা, যেহেতু ঈশ্বরের বাণী হওয়ায় সামসঙ্গীতের প্রতিটি বচন-ই সেই প্রকৃত অস্ত্র যা দিয়াবলকে শক্তিহীন করে (এক্ষেত্রে উপরে উপস্থাপিত 'মার্কেল্লিনোসের কাছে পত্র' দ্রঃ)। তেমন অস্ত্র নিক্ষেপ করেই মানুষ দিয়াবলের উপর বিজয়ী হয় যেইভাবে দিয়াবলকে ঠিক সেই অস্ত্রের মাধ্যমে তথা ঐশবাণীর মাধ্যমে প্রভু দ্বারা প্রান্তরে নিরুত্তর করা হয়েছিল (মথি ৪:১-১১)।

দিয়াবলের উপর এই প্রথম জয়লাভের পর ও তার উপরে ঐশবাণীর ও ক্রুশ-চিহ্নের প্রভাব উপলব্ধি করার পর আন্তনি দিয়াবলের আর অপেক্ষায় না থেকে বরং নিজেই দিয়াবলের এলাকা সেই মরুপ্রান্তরে গিয়ে তাকে বিচ্যুত ক'রে সেই প্রান্তরকে সন্ন্যাসীদের এমন আবাসে পরিণত করেন যেখানে খ্রিষ্টিয়ান ও খ্রিষ্টিয়ান নয় বহু মানুষ সান্ত্বনা ও প্রেরণা পাবার জন্য যাওয়া-আসা করে। এটাও সাধু আথানাসিউসের শিক্ষা, যা অনুসারে আন্তনি লোকালয় থেকে যত দূরে প্রত্যাহার করতেন না কেন মানুষ তাঁকে খুঁজে বের করত, কেননা প্রভুতে রূপান্তরিত মানুষ পর্বতের উপরে স্থিত এমন আলোর মত যা গুপ্ত থাকতে পারে না বরং সকলকে আকর্ষণ করে (মথি ৫:১৪ দ্রঃ)।

প্রাচীন মিশরের মানচিত্র

আলেক্সান্দ্রিয়া, (সাধু পাখোমিওসের মঠ) তাবেন্নেসিস, থেবেস, নিত্রিয়া, বুসিরিস

সূচীপত্র

অধ্যায়ঃ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪

ভূমিকা

সদ্‌গুণ সাধনায় মিশরের সন্ন্যাসীদের সমকক্ষ হতে এমনকি তাদের ছাড়িয়ে যেতে তোমাদের এই সঙ্কল্পে তোমরা তাদের সঙ্গে সুযোগ্য একটা প্রতিযোগিতায় পদার্পণ করেছ। কেননা বর্তমানকালে তোমাদের মধ্যে যথেষ্ট মঠ রয়েছে, ও সন্ন্যাসী-নামটা প্রকাশ্য স্বীকৃতির পাত্র হয়েছে। সেজন্য সবাই তোমাদের এ সঙ্কল্প যুক্তিসঙ্গত ভাবেই প্রশংসা করুক, ও তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ঈশ্বর তোমাদের আবেদন পূরণ করুন।

যেহেতু তোমরা আমার কাছে ধন্য আন্তনির জীবনধারণের একটা বিবরণী যাচনা করেছে ও তিনি যে কেমন করে সাধনার জীবন শুরু করেছিলেন, সেই সাধনা-জীবনের আগে তিনি যে কেমন মানুষ ছিলেন, ও কেমন করে নিজের জীবন সমাপ্ত করেছিলেন, ও তাঁর বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তা যে সত্য কিনা, যেহেতু এসমস্ত বিষয়ে কিছুটা শিখতে প্রত্যাশা কর যাতে করে তোমরাও তাঁর অনুকরণে নিজেদের চালনা করতে পার, সেজন্য আমি তোমাদের নির্দেশ অধিক আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কেননা আন্তনির কথা কেবল স্মরণ করা-ই আমার নিজেরও জন্য মহৎ লাভ ও সাহায্যের বিষয়। আমি জানি, শুধুমাত্র শ্রবণেও তোমরা সেই মানুষের প্রতি বিস্মিত হওয়া ছাড়া তাঁর সঙ্কল্প ক্ষেত্রেও তাঁর সমকক্ষ হতে ইচ্ছা করবে, কেননা সাধনা অনুশীলন ক্ষেত্রে আন্তনির জীবনধারণ সন্ন্যাসীদের জন্য যথেষ্ট আদর্শ যুগিয়ে দেয়। যারা তাঁর বিষয়ে বিবরণ দেয়, তাদের কাছ থেকে তোমরা যা শোন সেবিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ো না, বরং এমনটা বিবেচনা কর যে, তাদের কাছ থেকে তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকটা কিছুই মাত্র শেখা

হয়েছে, কেননা তেমন কর্মকাণ্ডের বাহুল্যের সামনে তারা সূক্ষ্ম ও পূর্ণ বিবরণ দিতে অক্ষম ছিল বৈকি। এবং যদিও তোমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি তাঁর বিষয়ে কিছুটা খবর স্মরণ করে পত্রের মাধ্যমে যা প্রেরণ করা যেতে পারে তা আমার সাধ্যমত প্রেরণ করে থাকি, তবু যারা এখান থেকে জলযাত্রা করে, তাদের কাছে জিজ্ঞাস্য বিষয় তুলে ধরতে অবহেলা করো না। কেননা হয় তো এমনটাও হতে পারে যে, এক একজন যা জানে তা বলার পরেও তাঁর বিষয়ে সমষ্টিগত বিবরণটা তাঁর গুণাবলির অনুপাত হবে না।

তোমাদের পত্র পেয়ে আশা রাখছিলাম, আমি এমন ব্যবস্থা করব যাতে, যারা প্রায়ই তাঁর কাছে থাকত, তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে তোমাদের কাছে পাঠাই, যাতে করে তোমরা আরও বেশি কিছু শেখার পর আমি পূর্ণতর বিবরণ পাঠাতে পারি। কিন্তু জলযাত্রার কাল শেষ হয়ে যাচ্ছিল বিধায় ও তোমাদের পত্রের বাহক যেতে ব্যস্ত ছিল বিধায়, সেজন্য আমি নিজে সেবিষয়ে যা জানি (হ্যাঁ, আমি তাঁকে বারংবার দেখেছিলাম), ও যখন কয়েকবার মাত্র নয় বরং বহুবার তাঁর পিছনে চলেছিলাম ও তাঁর হাতের উপরে জল ঢেলেছিলাম, তখন তাঁর কাছ থেকে আমি যা শিখতে পেরেছিলাম, সেই সমস্ত কিছু ভক্তপ্রাণ এই তোমাদের কাছে লিখতে ত্বরা করেছি। প্রতিটি বিষয়ে আমি যা সত্যাশ্রয়ী, তাতেই মন নিবদ্ধ রেখেছি পাছে কেউ না কেউ বেশি শুনেছে বিধায় অবিশ্বাসী হয়, অথবা, এর বিপরীতে, নিজের প্রত্যাশার চেয়ে কম শিখেছে বিধায় সেই মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

সাধু আন্তনির জন্ম ও তাঁর সাধনার সূচনা

১। আন্তনি জাতিতে ছিলেন মিশরীয়। তাঁর পিতামাতা সম্ভ্রান্ত বংশের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন; এবং যেহেতু তাঁরা খ্রিষ্টিয়ান ছিলেন, সেজন্য তাঁকেও খ্রিষ্টীয় আদর্শ অনুসারে মানুষ করা হয়েছিল। শিশুকালে তিনি পিতামাতার সঙ্গে এমন জীবন কাটালেন যে, তাঁদের সম্পর্কে ও নিজের বাড়ি সম্পর্কে ছাড়া অন্য বেশি কিছুই জানতেন না বলা চলে। বয়সে বড় হতে হতে ও বাল্যকালে এসে পৌঁছে ও বয়সে আরও বেশি বড় হতে হতে তিনি লেখাপড়া শিখতে সহ্য করছিলেন না, এমনকি অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা

থেকেও দূরে থাকতে ইচ্ছা করছিলেন। যাকোবের বেলায় যেমনটা লেখা হয়েছে (ক), সেই অনুসারে তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি সাধারণ মানুষের মত নিজের বাড়িতে দিন কাটাবেন। অবশ্যই, তিনি পিতামাতার সঙ্গে রীতিমতই প্রভুর গৃহে যেতেন, কিন্তু বাল্যকালে যেমন অলসতা প্রবণ ছিলেন না, তেমনি যৌবনকালেও অবজ্ঞাসূচক ভাবে ব্যবহার করতেন না, বরং পিতামাতার প্রতি বাধ্য ছিলেন, ও বাইবেল পাঠে মনোযোগী থেকে সেই পাঠে যা গঠনমূলক, যত্ন সহকারে তা হৃদয়ে গেঁথে রাখতেন। আর যদিও বাল্যকালে যথেষ্ট সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন কাটালেন, তবু নানা ধরনের ও দামী খাবারের ব্যাপারে পিতামাতাকে জ্বালাতন করতেন না, খাবার জনিত বাসনাও খোঁজ করতেন না, কিন্তু সামনে যা যা পেতেন তাতেই মাত্র তুষ্ট হয়ে অন্য কিছুর অন্বেষণ করতেন না।

২। পিতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁর তখনও খুব ছোট বোনের সঙ্গে একা হয়ে পড়ে আঠারো বা কুড়ি বছর বয়সী আন্তনি বাড়ি ও বোনের যত্ন নিতে লাগলেন। পিতামাতার মৃত্যুর ছয় মাস তখনও কাটেনি এমন সময় একদিন রীতিমত প্রভুর গৃহে যেতে যেতে তিনি চিন্তা করছিলেন কোন্ কারণেই বা প্রেরিতদূতেরা সবকিছু ত্যাগ করে ত্রাণকর্তার অনুসরণ করেছিলেন (ক); সেই লোকদেরও কথা ভাবছিলেন যাদের বিষয়ে প্রেরিতদের কার্যবিবরণী বলে যে, সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে যা পেত, তারা তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে দিত যাতে তা গরিবদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে বিতরণ করা হয় (খ)। তিনি এ কথাও ভাবছিলেন, সেই লোকেরা স্বর্গে কতই না মহৎ ও বড় মঙ্গলদান পাবে বলে প্রত্যাশা পোষণ করছিল। মনে মনে তেমন কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এমন সময়েই গির্জায় প্রবেশ করলেন যখন সুসমাচার পাঠ করা হচ্ছিল। তখন তিনি শুনলেন যে প্রভু সেই ধনীকে বলেছিলেন, *তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তবেই স্বর্গে ধন পাবে* (গ)।

পবিত্রজনদের স্মৃতিচারণ ঐশ্বরিক ভাবেই যেন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে, ও সেই সমস্ত বাণী তাঁর নিজের জন্যই যেন উচ্চারিত হয়েছিল, একথা মনে করে আন্তনি তখনই প্রভুর গৃহ থেকে বের হয়ে গ্রামের লোকদের কাছে তাঁর পিতৃসম্পত্তি দান করে দিলেন—তাঁর তিনশটা উর্বর ও খুবই সুন্দর 'আরৌরা' (ঘ) জমি ছিল,—যাতে সেই

সমস্ত বিষয় তাঁর ও বোনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। বোনের জন্য অল্প কিছু রেখে তিনি বাকি যা কিছু বহন করা যেতে পারত তা সবই বিক্রি করে যে প্রচুর টাকা পেলেন, তা গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

৩। আর এক দিন প্রভুর গৃহে প্রবেশ করার সময়ে তিনি সেই বাণী শুনলেন যা প্রভু সুসমাচারে উচ্চারণ করেন: *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না* (ক)। বেশিক্ষণ নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি আবার বের হয়ে তাঁর যা কিছু তখনও বাকি ছিল, তাও দান করে দিলেন। বোনকে সুযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য চিরকুমারীদের হাতে সঁপে দিয়ে ও মানুষ হবার জন্য তাকে মঠে তুলে দিয়ে তিনি তখন নিজ বাড়ির কাছাকাছি স্থানে কৃচ্ছ্র সাধনার জীবনে পদার্পণ করলেন; তিনি নিজের প্রতি মনোযোগ দিতেন ও ধৈর্যের সঙ্গে কঠোর জীবন যাপন করতেন। কেননা তখনও মিশরে বহু মঠ ছিল না, ও কোন সন্ন্যাসী সেই মহা মরুপ্রান্তরের কথা আদৌ জানত না, কিন্তু যারা নিজেদের জীবনে মনোযোগ দিতে ইচ্ছা করত, তারা এক একজন নিজ নিজ গ্রাম থেকে দূরে নয় এমন নিভৃত স্থানেই কৃচ্ছ্র সাধনা পালন করত। এদিকে, সেসময়ে আন্তনির নিকটবর্তী গ্রামে প্রাচীন একজন লোক ছিলেন যিনি যৌবনকাল থেকে নির্জনবাসী সন্ন্যাস জীবন পালন করে আসছিলেন। তাঁকে দেখে আন্তনি যা মঙ্গলকর, তাতে তাঁর অনুকরণ করতে লাগলেন (খ)। শুরুতে তিনিও নিজের গ্রামের নিকটবর্তী নানা স্থানে থাকতে লাগলেন; পরে অন্য অন্য স্থানের কোন ধর্মাগ্রহী মানুষের কথা শুনলে তিনি নিজের স্থান ছেড়ে প্রজ্ঞাবান মৌমাছির মত সেই মানুষের অনুসন্ধান করতেন; এবং তাঁর সন্ধান পেয়ে তাঁকে না দেখা পর্যন্ত নিজের স্থানে ফিরতেন না; হ্যাঁ, সেই মানুষের কাছ থেকে সদ্‌গুণের পথে নিজ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহই যেন মঙ্গলকর এমন কিছু পাবার পরেই তিনি ফিরে যেতেন। তেমন কৃচ্ছ্র সাধনার প্রথম ধাপগুলো সেই স্থানে কাটানোর পর তিনি মনে মনে বিচার-বিবেচনা করতে লাগলেন কেমন করে নিজের পিতামাতার বিষয়ের দিকেও আর ফিরে তাকাবেন না ও নিজের আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতিও রক্ষা করবেন না, বরং নিজের সাধনা সিদ্ধতর করে তোলার লক্ষ্যে কেমন করে নিজের যত আকাঙ্ক্ষা ও যত শক্তিই রক্ষা করবেন।

তথাপি তিনি নিজ হাতেই কাজ করতেন, কারণ এ বাণী শুনেছিলেন, *যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না* (গ)। যে টাকা সংগ্রহ করতেন, তিনি তার এক ভাগ দিয়ে নিজের জন্য রুটি কিনতেন, বাকি টাকাটা গরিবদেরই দান করে দিতেন।

তিনি প্রায়ই প্রার্থনায় রত থাকতেন, কেননা শিখেছিলেন যে, নির্জন স্থানে একা গিয়ে *অবিরতই প্রার্থনা করা প্রয়োজন* (ঘ)। কেননা বাণীপাঠে এতই মনোযোগী ছিলেন যে, যা যা লেখা ছিল, তার কিছুই এমনিই মাটিতে পড়ে যেত না, বরং তিনি সবকিছুই গেঁথে রাখতেন; তাতে তাঁর স্মরণশক্তিই পুস্তকের স্থান নিল।

৪। এভাবে জীবনযাপন করায় আন্তনি সবার ভালবাসার পাত্র হয়েছিলেন। যাঁদের তিনি দেখতে যেতেন, সেই ধর্মাগ্রহী মানুষদের প্রতি আন্তরিকতার সঙ্গে বাধ্য থাকতেন, এবং ধর্মাগ্রহ ও সাধনা ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁর তুলনায় কোথায় কোথায় তাঁকে ছাড়িয়ে যেতেন, সেবিষয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন। তিনি একজনের অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ, ও প্রার্থনার প্রতি আর একজনের আগ্রহ লক্ষ করতেন; একজনের ক্রোধসংবরণ ও আর একজনের মানব-যত্ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন; একজন জাগরণী পালন করলে ও আর একজন অধ্যয়ন করলে তিনি উভয়ের প্রতি মনোযোগ দিতেন; একজনকে তাঁর ধৈর্যের জন্য ও আর একজনকে তাঁর উপবাস ও মাটিতে শুয়ে পড়ার জন্য শ্রদ্ধা করতেন; যত্ন সহকারে একজনের নম্রতা ও আর একজনের সহিষ্ণুতা লক্ষ করতেন; ও সেইসঙ্গে যে খ্রিষ্টভক্তি ও পারস্পরিক ভালবাসা তাঁদের সকলকে অনুপ্রাণিত করত, সেইদিকেও তিনি সূক্ষ্ম নজর রাখতেন। সেইভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তিনি নিজের সাধনার স্থানে ফিরে যেতেন ও সেসময় থেকে এক একজনের গুণ নিজেতে সমন্বয় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন ও সেই সকলের গুণাবলি নিজেতেও প্রকাশ করার জন্য আগ্রহী ছিলেন। নিজের সমবয়সীদের সঙ্গেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন না, কেবল এ বিষয়ে ছাড়া যে, সদ্‌গুণ-উন্নতি ক্ষেত্রে তিনি তাদের কারও দ্বিতীয় হবেন না। এবং তেমনটাও তিনি এমনভাবে করতেন যাতে কেউই মনে কষ্ট না পায়, এমনকি তারা যেন তাঁকে নিয়ে আনন্দিত হতে পারে। ফলত তাঁর গ্রামবাসী যারা ও যে ধর্মপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে তিনি যোগ দিতেন,

তারা সবাই তাঁর মধ্যে তেমন ধরনের মানুষকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ঈশ্বরের স্নেহভাজন বলত, এবং কেউ কেউ তাঁকে ‘সন্তান’, কেউ কেউ ভাই বলে আপন করে নিত।

দিয়াবলের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম

৫। সেই যে দিয়াবল মঙ্গলময় সব কিছু অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, সে একটি যুবকে তেমন সঙ্কল্প দেখে তা সহ্য করতে পারল না, বরং পুরাকালে যা কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত করেছিল, তা করায় এই ব্যক্তির বিরুদ্ধেও কাজে লেগে গেল। শুরুতে সে তাঁর সম্পত্তি, তাঁর বোনের দেখাশোনা, আত্মীয়তার বন্ধন, অর্থ ও গৌরব পিপাসা, খাবারের নানাবিধ আসক্তি, জীবনের বিনোদন ও অবশেষে সদ্‌গুণের কঠোরতা ও তা অর্জন করার কষ্ট, এসবকিছুর স্মৃতি জাগিয়ে তাঁকে সাধনা থেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করল; তাছাড়া দেহের দুর্বলতা ও সময়কালের দৈর্ঘ্যের চিন্তাও উত্থাপন করল। এভাবে দিয়াবল তাঁর মনের মধ্যে যত চিন্তার ধুলা জাগাল, কেননা সে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বাধা দিতে চাইত। কিন্তু আন্তনির সঙ্কল্পের সম্মুখীন হয়ে সে নিজের দুর্বলতা দেখতে পেল; ও যখন এও দেখল যে, তাঁর মহৎ বিশ্বাস দ্বারা পরাভূত হয়ে ও তাঁর অবিচল প্রার্থনা দ্বারা পতিত হয়ে সে নিজেই বরং এই প্রতিযোগীর দৃঢ়তা দ্বারা পরাজিত হতে যাচ্ছিল, তখন *নিজের পেটের নাভিতে* (ক) অবস্থিত অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভরসা রাখল ও সেগুলোতে বড়াই ক’রে (কেননা ঠিক তা-ই হলো যুবকদের বিরুদ্ধে তার প্রথম ফাঁদ) সে যুবক আন্তনিকে রাত্রিবেলায় আলোড়িত ক’রে ও দিনমানে কষ্ট দিয়ে এমনভাবে তাঁকে আক্রমণ করল যে, এসবকিছু লক্ষ করছিল যারা, তারাও সেই যুদ্ধ-সংগ্রাম অনুভব করছিল যা সেই দু’জনের মধ্যে চলছিল। [তারা দেখছিল] একজন খারাপ চিন্তা নিক্ষেপ করছিল, কিন্তু অপরজন সেসমস্ত চিন্তাধারাকে প্রার্থনা দ্বারা উল্টিয়ে দিচ্ছিল; একজন কামুকতায় হাত দিচ্ছিল, কিন্তু অপরজন এমন একজনের মত যে লজ্জায় লাল হচ্ছে নিজের দেহকে বিশ্বাস, প্রার্থনা ও উপবাসে বলবান করছিল। এবং বিপর্যস্ত হয়ে দিয়াবল এক রাতে একটা মেয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করতে ও মেয়ের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে মনস্থ করল; ও তেমনটা করল শুধু আন্তনিকে প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু কেবল খ্রিষ্টের কথা ভেবে ও তাঁর দ্বারা জয় করা যোগ্যতা ও প্রাণের যুক্তিক্ষমতার কথা বিবেচনা

ক'রে [খ] আন্তনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চালাকির আগুন নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু শত্রু পুনরায় তাঁর সামনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আরামদায়ী বাসনা নিক্ষেপ করল, কিন্তু আন্তনি ক্রোধান্বিত ও বিষণ্ন একটা মানুষই যেন সেই আগুন ও সেই ক্ষয়কারী কীটের হুমকির দিকে নিজের চিন্তা ফেরালেন ও তেমন চিন্তাধারা সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিন্যস্ত করে অক্ষত অবস্থায় এসমস্ত পরীক্ষা পার হলেন। এসমস্ত এমন কিছু যা সেই শত্রুর জন্য লজ্জাবোধ করার কারণ হয়ে উঠল। কেননা যে নিজেকে ঈশ্বরের মত মনে করছিল, সে এখন সামান্য একটি যুবক দ্বারা ঠকছিল, এবং রক্তমাংসের বিরুদ্ধে যে বড়াই করছিল, সে মাংসধারী একটি মানুষ দ্বারা ভূপাতিত হচ্ছিল। কেননা আন্তনির সঙ্গে সেই প্রভু সক্রিয় ছিলেন যিনি আমাদের খাতিরে মাংসধারণ করলেন ও মানবদেহকে দিয়াবলের উপরে বিজয় দান করলেন, যাতে করে যারা সত্যিকারে সংগ্রাম করে তারা এক একজন যেন বলতে পারে, *আমি নয়, বরং ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহই [সংগ্রাম করছে] যা আমার সঙ্গে আছে* [গ]।

৬। অবশেষে, যখন সেই নাগদানব এভাবেও আন্তনিকে ভূপাতিত করতে পারল না, বরং এমনটা দেখল যে তাকেই আন্তনির হৃদয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, ঠিক সেইভাবে দাঁতে দাঁত ঘষে সে নিজের মন অনুযায়ী রূপ ধারণ করে নিজেকে রূপান্তরিত করায় পরবর্তীকালে একটা কালো ছেলের আকারে নিজেকে প্রকাশ করল; এবং কেমন যেন পরাজিত হয়ে সে চিন্তাধারার মাধ্যমে আক্রমণ না চালিয়ে (যেহেতু প্রবঞ্চক হিসাবে তাকে ইতিমধ্যে তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছিল) কিন্তু মানবীয় কণ্ঠ ব্যবহার করে বলল, 'আমি অনেককে প্রবঞ্চিত করেছি, বহুজনকে ভূপাতিত করেছি, কিন্তু অন্যান্য অনেকজনের বিরুদ্ধে যেমন করেছি তেমনি এখন তোমার বিরুদ্ধে ও তোমার পরিশ্রমের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে আমি দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছি।' যখন আন্তনি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যে আমাকে তেমন কথা বলছ, সেই তুমি কে?' তখন সে সাথে সাথে করুণ ফিসফিস করে বলল, 'আমি ব্যভিচারের বন্ধু। আমি ব্যভিচারের ফাঁদ পেতেছি ও যুবকদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের ভ্রান্তি লাগিয়েছি; এমনকি আমি ব্যভিচারের আত্মা বলেও অভিহিত। যারা শালীন জীবন যাপন করছিল, তাদের কতজনকেই না আমি প্রতারণা করেছি। যারা আত্মসংযম অনুশীলন করছিল, তাদের আলোড়িত

করামাত্রই কতজনেরই মন না আমি জয় করে ফেলেছি। আমিই সে-ই যার বিষয়ে নবী পতিত সেই সকলকে ভর্ৎসনা করে বলেন, *ব্যভিচারের এক আত্মা তাদের পথভ্রান্ত করেছে* [ক], কেননা আমারই দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। হ্যাঁ, আমিই সে-ই যে প্রায়ই তোমাকে উৎপীড়ন করেছি ও বহুবার তোমার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছি।’ তাতে আন্তনি প্রভুকে ধন্যবাদ জানানোর পর ও শত্রুর বিরুদ্ধে সৎসাহস যুগিয়ে তাকে বললেন, ‘তবে তুমি একেবারে অবজ্ঞার বস্তু, কেননা তুমি মনে কালো ও ছেলের মত দুর্বল। এখন থেকে তোমার বিষয়ে আমার আর কোন চিন্তা নেই, কারণ *প্রভু আমার সহায়ক, আর আমি শত্রুদের উপর তাকাব*’ [খ]। তেমন কথা শোনামাত্র সেই কালোজন তেমন বাণীতে কম্পিত হতে হতে ও তেমন মানুষের কাছে যেতেও ভয়ে অভিভূত হয়ে সাথে সাথে পালিয়ে গেল।

৭। এটিই হলো দিয়াবলের বিরুদ্ধে আন্তনির প্রথম বিজয়, এমনকি এটিই বরং হলো আন্তনিতে সেই ত্রাণকর্তার বিজয় যিনি *মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করেছেন যেন বিধানের লক্ষ্য সেই যে ধর্মময়তা, তা আমাদেরই মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে, যারা মাংসের বশে নয়, বরং আত্মারই বশে চলি* [ক]। কিন্তু দিয়াবল ভূপাতিত হওয়া সত্ত্বেও আন্তনিও শিথিল বা দাম্ভিক হননি; সেই শত্রুও পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ফাঁদ বসাতে বন্ধ করেনি। কেননা সে পুনরায় চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এমন সিংহের মত যা আক্রমণের জন্য কোন না কোন সুযোগ সন্ধান করছে। যেহেতু আন্তনি শাস্ত্র থেকে এ শিখেছিলেন যে, শত্রুর ছলচাতুরি বহুবিধ, সেজন্য তিনি তীব্রতার সঙ্গে কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন করে চললেন এবিষয়ে সচেতন হয়ে যে, তাঁর শত্রু যদিও দৈহিক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির মাধ্যমে তাঁকে প্রবঞ্চিত করার জন্য যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়নি, তবু সে অন্য কোন না কোন উপায়ের মাধ্যমে তাঁকে ফাঁদে ফেলবার জন্য অবশ্যই সচেষ্ট থাকবে, কেননা দিয়াবল পাপকে পছন্দ করে। তাই তিনি নিজের দেহকে আরও বেশি শাসন করলেন ও নিয়ন্ত্রণে রাখলেন [খ] পাছে এমনটা ঘটে যে, কোন না কোন দিকে জয়ী হওয়ার পর অন্য কোন দিকে পরাজিত হন। সেজন্য তিনি আরও বেশি কঠোর সাধনায় নিজেকে অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা করলেন। তাতে অনেকে বিস্মিত হল, কিন্তু তিনি সেই শ্রম সহজে বহন করলেন, কেননা তাঁর প্রাণে যে আগ্রহ তত দিন ধরে বসবাস করছিল, সেই আগ্রহ তাঁর অন্তরে শ্রেয়তর

এমন একটা স্বভাব যুগিয়ে দিচ্ছিল যার জন্য তিনি অন্যান্যদের কাছ থেকে ক্ষুদ্রতম পরামর্শও পেয়ে তাতে মহৎ উদ্দীপনা দেখাচ্ছিলেন। তাঁর সতর্কতা এমন ছিল যে, তিনি প্রায়ই সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটাতেন, এবং যেহেতু তিনি তেমনটা একবার নয়, প্রায়ই করতেন, সেজন্য তাঁর বিষয়ে অন্যান্যরা বিস্মিত হত। তিনি দিনে একবার, সূর্যাস্তের পরেই খেতেন, কিন্তু এমন এমন সময় ছিল যখন তিনি দু' দিন পর পর ও বহুবার চার দিন পর পর খেতেন; তাঁর খাদ্য ছিল রুটি ও লবণ, ও তাঁর পানীয় হিসাবে তিনি শুধু জল খেতেন। মাংস ও আঙুররসের কথা উল্লেখ করারও কোন যুক্তি আসে না, কেননা সদাগ্রহী অন্যান্য মানুষদের মধ্যে তেমন কিছু পাওয়া যেত না। ঘুমাবার জন্য তাঁর পক্ষে একটা শক্ত মাদুর যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তিনি খালি মাটিতে শুয়ে পড়তেন। গা তৈলসিক্ত করার ব্যাপারে তাঁর অমত ছিল, কেননা তিনি বলতেন যে, তীব্রতার সঙ্গে কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন করা ও দেহকে যা আরাম দেয় তেমন কিছু সন্ধান না করা বরং দেহকে শ্রমে অভ্যস্ত করা-ই যুবকদের পক্ষে বেশি শোভা পেত, প্রেরিতদূতের এই উক্তি স্মরণ ক'রে যে, *যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী* (গ)। কেননা তিনি বলতেন, আত্মার তীব্রতা তখনই পরাক্রমী যখন দৈহিক আত্মতৃপ্তি দুর্বল। এবং তাঁর এ ধারণাও সত্যিকারে আশ্চর্য ছিল যা অনুসারে সদ্‌গুণের পথে অগ্রগতি ও জগতের খাতিরেই জগৎকে প্রত্যাহার, দু'টোও অতিবাহিত সময় দ্বারা নয়, কিন্তু সাধকের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ও তার সঙ্কল্পের স্থিরতা দ্বারাই পরিমাপ করা উচিত। বস্তুতপক্ষে তিনি নিজেই অতীতের কথায় মন দিতেন না, কিন্তু কৃচ্ছ্র সাধনার প্রাথমিক পদক্ষেপেই যেন তিনি দিনের পর দিন অগ্রগতির লক্ষ্যে নিজের শ্রম বৃদ্ধি করতেন, নিজের কাছে পলের একথা অবিরত ব'লে যে, *পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে* (ঘ) এগোতে থাকি; তিনি নবী এলিয়ের উচ্চারিত এ বাণীও স্মরণ করতেন, *সেই জীবনময় প্রভু যাঁর সাক্ষাতে আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি* (ঙ)। এক্ষেত্রে তিনি এ মন্তব্য রাখতেন যে, 'আজ' বলায় নবী অতীত কাল গণনা করছিলেন না কিন্তু এমন একজনের মত ব্যবহার করছিলেন যে সবসময় শুরু করছিল, তারই মত তিনিও আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন যাতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হতে পারতেন, তথা শুদ্ধ হৃদয়ে ও অন্য কারও ইচ্ছায় নয়, কেবল তাঁরই ইচ্ছায় বাধ্য হয়ে

প্রস্তুত হতে পারতেন। তিনি নিজের কাছে প্রায়ই এও বলতেন যে, সেই মহান এলিয়ের জীবনধারণ থেকে একজন সাধকের পক্ষেও একটা আয়না থেকেই যেন নিজের জীবন সম্পর্কে সবসময়ই জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

কবরগুলোতে প্রত্যাহার

৮। এভাবে কোমর বেঁধে আন্তনি সেই কবরগুলোর দিকে রওনা হলেন যেগুলো গ্রাম থেকে একটু দূরে ছিল। এবং নিজের বন্ধুদের একজনকে নির্দিষ্ট সময়কালে তাঁর জন্য রুটি আনতে দায়িত্ব দিয়ে তিনি সেই কবরগুলোর একটায় ঢুকলেন ও তাঁর সেই বন্ধু তাঁর পিছনে দরজাটা বন্ধ করলে তিনি সেই কবরের ভিতরে একা হয়ে রইলেন। এবং যখন সেই শত্রু ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারল না (কেননা তার এ ভয় ছিল যে, আন্তনি অল্পকালের মধ্যে মরুপ্রান্তরকে কৃচ্ছ্র সাধনায় পূর্ণ করবেন), তখন এক রাতে অপদূতদের এক ভিড়ের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে এমনভাবে কশা দিল যে আন্তনি তেমন পীড়নের ফলে নির্বাক্ অবস্থায় মাটিতে শুয়ে পড়লেন। কেননা এব্যাপারে তিনি একথা সমর্থন করলেন যে, তাঁর ব্যথা এমন কড়া ছিল যে, মানুষ দ্বারা হানা কোন আঘাত তত পীড়নের কারণ হতে পারত না। কিন্তু প্রভুর পূর্বজ্ঞান অনুসারে (কেননা যারা তাঁর উপর ভরসা রাখে প্রভু তাদের অবহেলা করেন না) সেই বন্ধু রুটি আনবার জন্য পরদিন এল ও দরজা খুলে ও আন্তনিকে মৃতই যেন মাটিতে সেই শোয়া অবস্থায় দেখে তাঁকে তুলে গ্রামে প্রভুর গৃহে নিয়ে গিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে অনেকে ও গ্রামবাসীরা আন্তনির চারদিকে একটা লাশেরই চারদিকে যেন বসল। কিন্তু মধ্যরাতের দিকে আন্তনি চেতনা ফিরে পেয়ে ও জেগে উঠে যখন দেখলেন সবাই ঘুমোচ্ছে ও কেবল তাঁর সেই বন্ধুই প্রহরা দিচ্ছে, তখন ইশারা দিয়ে তাঁকে বললেন সে যেন কাউকে ঘুম থেকে না জাগিয়ে তাঁকে পুনরায় তুলে সেই কবরগুলোতে নিয়ে যায়।

৯। তাই তাঁকে সেই লোক দ্বারা সেখানে আবার নেওয়া হল ও আগের মত দরজা বন্ধ করা হলে তিনি ভিতরে একা হয়ে রইলেন। সেই আঘাতের ফলে পায়ে দাঁড়াবার মত

তাঁর যথেষ্ট শক্তি ছিল না, কিন্তু শুয়ে শুয়ে প্রার্থনা করলেন। এবং প্রার্থনা করার পর তিনি চিৎকার করে বললেন, 'এই যে আমি, সেই আন্তনি, এখানে উপস্থিত। আমি তোমার আঘাত থেকে দূরে পালাচ্ছি না, কেননা তুমি আরও বেশি আঘাত করলেও খ্রিস্টের ভালবাসা থেকে কিছুই আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে না' (ক)। তারপর তিনি গান করলেন *আমার বিরুদ্ধে যদিও সেনাদল শিবির বসায়, আমার হৃদয় ভয় করবে না* (খ)। এটাই ছিল সেই সাধকের চিন্তা ও কথা, কিন্তু যা ভালো তা যে অবজ্ঞা করে, সেই শত্রু এতেই বিস্মিত যে, তত আঘাত পাবার পরেও আন্তনি ফিরে আসবার সাহস দেখাচ্ছিলেন, তখন তার কুকুরদের ডেকে একেবারে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, 'তোমরা তো দেখতে পেয়েছ, আমরা ব্যভিচারের আত্মা দিয়ে ও কশাঘাত দিয়েও এই মানুষকে থামাতে ব্যর্থ হলাম; এমনকি, দূরের কথা, সে এখন আমাদের অপমানও করছে। সুতরাং এসো, একে অন্য ভাবে আক্রমণ করি।' এদিকে, অপকর্ম করার অন্য ধরনের ষড়যন্ত্র কল্পনা করা দিয়াবলের পক্ষে সহজ ব্যাপার, তাই রাতের বেলায় তারা এমন কোলাহল করল যে মনে হচ্ছিল, গোটা স্থান ভূমিকম্পেই যেন কাঁপছে। মনে হচ্ছিল, সেই অপদূতেরা ঘরের চার দেওয়াল ভেঙে দিয়ে সেই দেওয়ালের ভিতর দিয়েই যেন ঢুকে বন্য জন্তু ও সরিসৃপের আকারে এসে উপস্থিত হল। জায়গাটা সাথে সাথে সিংহ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, ষাঁড়, সাপ, চন্দ্রবোড়া, বিছে ও নেকড়ের রূপগুলোতে ভরে গেল, ও এক একটা নিজ নিজ রূপ অনুযায়ী চলাচল করছিল; আন্তনির গায়ে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছুক সিংহটা গর্জন দিল; মনে হচ্ছিল ষাঁড় গোঁতাতে ব্যস্ত ছিল; সাপ বুকে চলছিল বটে কিন্তু মনে হচ্ছিল তত এগোতে পারছিল না; ছুটতে ছুটতে নেকড়েও বাধা পাচ্ছিল; এককথায়, সেই সমস্ত বস্তুগুলোর শব্দ এমন ছিল যা ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল, ও সেগুলোর গর্জনও ভয়ানক ছিল। সেসমস্ত জন্তু দ্বারা আক্রান্ত ও বিক্ষত হয়ে আন্তনির দেহ আরও বেশি ব্যথায় বশীভূত হল। কিন্তু আন্তনি অবিচল থেকে এমনকি আত্মায় আরও বেশি করে জাগ্রত থেকে সেখানে শুয়ে, নিজের দেহে যে ব্যথা অনুভব করছিলেন তার জন্য আর্তনাদ করছিলেন, কিন্তু নিজের চিন্তার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন বিধায় তিনি কেমন যেন সেই অপদূতদের বিদ্রূপ করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কোন প্রভাব থাকত, তাহলে কেবল একজনমাত্রই যে আসবে তা যথেষ্ট হত। কিন্তু, যেহেতু প্রভু তোমাদের শক্তি ভেঙে দিয়েছেন, সেজন্য তোমরা ভিড়

করেই নানা উপায়ে আমাকে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করছ; এবং তোমরা যে যুক্তিক্ষমতাবিহীন জন্তুদের রূপ নকল করছ, সেটাই তোমাদের দুর্বলতার প্রমাণ।' এবং তিনি পুনরায় সাহসের সঙ্গে বললেন, 'তোমরা সক্ষম হলে ও আমার উপরে অধিকার পেয়ে থাকলে তবে ক্ষান্ত না হয়ে বরং আক্রমণ চালাও। কিন্তু তোমরা অক্ষম হলে তবে কেন আমাকে বৃথাই বিরক্ত করছ? কেননা আমাদের প্রভুতে বিশ্বাস আমাদের পক্ষে সীল ও রক্ষাফলক স্বরূপ।' তাই বহু প্রচেষ্টার পর সেই অপদূতেরা তাঁর কারণে দাঁতে দাঁত ঘষছিল, কেননা তারা তাঁকে নয়, নিজেদেরই বিদ্রূপের বস্তু করছিল।

১০। তেমন অবস্থায় প্রভুও আন্তনির সংগ্রাম ভুলে না গিয়ে বরং তাঁর সহায়তায় এলেন। কেননা যখন আন্তনি চোখ উত্তোলন করলেন, তখন দেখলেন, ছাদ কেমন যেন উন্মুক্ত ও আলোর এক রশ্মি তাঁর নিজের দিকে নেমে আসছে। অপদূতেরা হঠাৎ করে মিলিয়ে গিয়ে উদাহ হয়ে গেল, তাঁর দেহের ব্যথা সাথে সাথে বন্ধ হল, ও ঘরটা পুনরায় অক্ষত অবস্থায় দাঁড়াল। সহায়তা বিষয়ে সচেতন হয়ে ও ব্যথা থেকে স্বস্তি পেয়ে অনায়াসে নিশ্বাস নেওয়ার পর আন্তনি, যে দর্শন দেখা দিয়েছিল তাতে অনুনয় করে বললেন, 'তুমি কোথায় ছিলে? আমার কষ্ট বন্ধ করার জন্য তুমি কেন শুরুতেই দেখা দাওনি?' এবং একটা কণ্ঠ তাঁর কাছে এসে বলল, 'আন্তনি, আমি তো এইখানে ছিলাম, কিন্তু তোমার সংগ্রাম দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবং যেহেতু তুমি নিষ্ঠাবান থাকলে ও পরাভূত হওনি, সেজন্য এখন আমি সর্বকাল ধরে তোমার সহায়ক হব ও তোমাকে সর্বস্থানে সুবিখ্যাত করব।' তেমন কথা শুনে আন্তনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, এবং এমন শক্তি অর্জন করলেন যে তিনি অনুভব করলেন, তাঁর দেহ আগের চেয়ে আরও বেশি পরাক্রমের অধিকারী হল। সেসময় তাঁর বয়স আনুমানিক ছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

১১। পরদিন কবর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি ঈশ্বরভক্তিতে আরও বেশি আগ্রহী ছিলেন, ও আগেকার উল্লিখিত সেই বৃদ্ধজনের সঙ্গে দেখা পেয়ে তাঁর সঙ্গে মরুপ্রান্তরে জীবন কাটাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নিজের বার্ধক্যের কারণে এবং এই কারণেও যে, তেমন মরুপ্রান্তরে সাধনা তখনও প্রচলিত ছিল না, যখন সেই বৃদ্ধ সম্মত

হলেন না, তখন আন্তনি অবিলম্বে পর্বতের দিকে রওনা হলেন। আর সেই শত্রু এবারও তাঁর ধর্মাগ্রহ লক্ষ ক'রে ও সেই ধর্মাগ্রহে বাধা দিতে প্রত্যাশা ক'রে তাঁর পথে এমন কিছু নিক্ষেপ করল যা দেখতে ছিল মহৎ একটা সোনার থালার মত। কিন্তু সেই ধূর্তজনের ছলনা দেখে আন্তনি সেই থালার দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও সেটার মধ্যে ধরে পড়া দিয়াবলকে বললেন, 'বাহ্, কোথা থেকেই বা একটা থালা মরুপ্রান্তরে এল? এই পথ তত ব্যবহৃত নয়, এখানে কোন পথিকের চিহ্নমাত্রও নেই। থালাটা এতই বড় যে, পড়ে গেলে তা যে হারিয়ে গেছে তা লক্ষ না করে পারা যেত না; এবং তা যে হারিয়ে ফেলেছিল সে অবশ্যই তা খুঁজবার জন্য ফিরে এলে খুঁজে পেত, যেহেতু জায়গাটা নির্জন। এটা অবশ্যই দিয়াবলের চালাকি। ওহে দিয়াবল, এতে তুমি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করবে না। তোমার নিজের সর্বনাশে এটা নাও।' এবং তিনি তেমনটা বললেই থালাটা আগুনের সম্মুখ থেকে ধূমাই যেন মিলিয়ে গেল।

কেল্লায় প্রত্যাহার

১২। পথ চলতে চলতে তিনি এমন কিছু দেখতে পেলেন যা এবার মোহময় নয়, বরং ছিল নিজের পথে ফেলানো বাস্তব সোনা। শত্রু নিজেই যে তা দেখিয়ে দিল বা তার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ পরাক্রমই যে সাধককে পরীক্ষা করছিল ও দিয়াবলকে দেখাচ্ছিল যে আন্তনি প্রকৃতপক্ষে অর্থ বিষয়ে আদৌ ব্যস্ত ছিলেন না, সেবিষয়ে তিনিও কিছু বলেননি, আমরাও কিছুই জানি না; কিন্তু এ নিশ্চিত যে, যা দেখা দিয়েছিল তা ছিল সোনা। তাই আন্তনি সেই সোনার পরিমাণে বিস্মিত হলেন, কিন্তু তিনি সেদিকে মুখ না ফিরিয়ে এগিয়ে গেলেন যেইভাবে একজন আগুনের উপর দিয়ে চলে যায়; এমনকি তিনি এতই দ্রুত বেগে ছুটে চললেন যে, অল্পক্ষণের মধ্যে জায়গাটা আর তাঁর দৃষ্টিগোচর হল না ও অদৃশ্যই হল। নিজের সঙ্কল্প আরও বেশি উদ্দীপিত ক'রে তিনি পর্বতের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। যখন তিনি নদীর ওপারে নির্জন একটা কেল্লা দেখলেন যা এমন বহুদিন ধরে খালি হয়ে রয়েছিল যে তা সরিসৃপে ভরা ছিল, তখন তিনি সেখানে গিয়ে সেইখানে বসবাস করতে লাগলেন। আর তখনই সেই সরিসৃপগুলো সাথে সাথে চলে গেল কেমন যেন কেউ না কেউ সেগুলোকে ধাওয়া করছিল, এবং আন্তনি প্রবেশপথে

আর একবার প্রতিবন্ধক বসিয়ে, ছ' মাসের জন্য যথেষ্ট রুটি গচ্ছিত রেখে (কেননা থেবেস-বাসীরা তেমনটা করে ও রুটি প্রায়ই পুরা এক বছর ধরেও তাজা থাকে) ও ভিতরে জল পেয়ে সেই মন্দিরের অভ্যন্তরে নিজেকে লুকোলেন। তিনি নিজে কখনও বাইরে না গিয়ে ও যারা তাঁকে দেখতে আসত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না করে সেই স্থানে একা হয়ে রইলেন। তিনি তেমন সাধনার জীবন বহুদিন ধরে করে চললেন; তিনি বছরে দু' বার উপর থেকে অর্থাৎ ছাদ থেকে রুটি গ্রহণ করে নিতেন।

১৩। তাঁর পরিচিতজনদের মধ্যে যারা তাঁকে দেখতে আসত, যেহেতু তিনি তাদের ভিতরে আসতে দিতেন না, সেজন্য তারা প্রায়ই বাইরে দিন-রাত কাটাত, তারা এমনটা শুনতে পাচ্ছিল কেমন যেন ভিতরে এক ভিড় শব্দ তুলে ও করুণ ফিসফিসানি ধ্বনিত করে কোলাহল করছে ও চিৎকার করে বলছে, 'যা আমাদের অধিকার, তা ছেড়ে চলে যাও। মরুপ্রান্তরের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তুমি আমাদের আক্রমণে দাঁড়াতে পারবে না।' যারা বাইরে ছিল, তারা প্রথমে মনে করছিল, কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে লড়াই করছে ও মই দিয়ে ঢুকতে পেরেছিল, কিন্তু যখন তারা নত হয়ে একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়ে তাকাল, তখন কাউকে দেখতে না পেয়ে এ বুঝতে পারল যে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিল অপদূত। তাতে তারা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে আন্তনিকে ডাকল ও তিনি তাদের ডাক স্পষ্টই শুনতে পেলেন বটে, কিন্তু অপদূতদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন; এবং দরজার কাছে এসে সেই লোকদের বাড়ি ফিরে যেতে ও ভয় না করতে বলতেন। তিনি বলতেন, 'অপদূতেরা এইভাবেই বিভ্রম সৃষ্টি করে ও তেমন বিভ্রমজনিত ভূত কাপুরুষদের উপর ছেড়ে দেয়; কেননা (তিনি বলতেন) কাপুরুষদের বিরুদ্ধেই অপদূতেরা এইভাবে বিভ্রমজনিত ভূত সৃষ্টি করে। অতএব তোমরা ক্রুশের চিহ্ন দিয়ে নিজেদের সীলমোহরযুক্ত করে ভরসা ভরে বাড়ি গিয়ে সেই অপদূতদের নিজেদেরকে বিদ্রূপের বস্তু করতে দাও।' তাই ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে তারা বাড়ি ফিরে যেত, কিন্তু তিনি থেকে যেতেন, অপদূতদের হাত থেকেও কোন ক্ষতি না পেয়ে, সংগ্রামের কারণেও ক্লান্তিভোগ না ক'রে। তিনি ঊর্ধ্ব থেকে আগত দর্শন দ্বারা যে সহায়তা পেতেন, সেই সহায়তা ও সেইসঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিজেদের দুর্বলতাই একদিকে তাঁর কষ্টে

যথেষ্ট নিষ্কৃতি দিত ও অন্যদিকে আরও বেশি আগ্রহ দেখাবার জন্য তাঁকে সজ্জিত করত। তাঁর বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময়মত আসত, এ ভেবে যে, তারা তাঁকে মৃত অবস্থায় পাবে, কিন্তু শুনতে পেত তিনি গান করছেন, *উত্থিত হোন ঈশ্বর, তাঁর শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তাঁর বিদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক। ধোঁয়া যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনি তারা মিলিয়ে যাক; মোম যেমন গলে আগুনের মুখে, তেমনি ঈশ্বরের সম্মুখে পাপীরা লুপ্ত হোক* [ক]; তিনি এও গাইতেন, *সকল দেশ ঘিরে ফেলেছিল আমায়, কিন্তু প্রভুর নামেই আমি তাদের তাড়িয়ে দিলাম* [খ]।

১৪। তিনি এইভাবে একা হয়ে থেকে কৃচ্ছ্র সাধনা অনুশীলন করতে করতে প্রায় বিশ বছর কাটালেন: কখনও বাইরে যাননি ও কেবল মাঝে মাঝেই হয় তো কয়েকজন তাঁকে দেখতে পেল। তারপর, যখন অনেকেই তাঁর কৃচ্ছ্র সাধনা অনুকরণ করতে আকাঙ্ক্ষী ও ইচ্ছুক হল ও তাঁর বন্ধুদের কয়েকজন এসে কেল্লার দরজা ভেঙে ফেলে তা জোর করে সরিয়ে দিল, সেসময়ই আন্তনি ঐশরহস্যগুলোর অভ্যন্তরে চালিত হওয়ার পর ও ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কেমন যেন একটা মন্দির থেকে এগিয়ে এলেন। এটা হলো সেই প্রথমবার যখন তিনি কেল্লা থেকে তাদের জন্য দেখা দিলেন যারা তাঁর অনুসন্ধানে এসেছিল। এবং যখন তারা তাঁর দিকে তাকাল, তখন তারা তাঁর দেহ যে আগেকার অবস্থা বজায় রেখেছিল, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হল; বাস্তবিকই তাঁর দেহ চর্চার অভাবেও মোটা হয়নি ও উপবাস ও অপদূতদের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলেও রুগ্ন হয়নি, কিন্তু দেহটা ঠিক সেই রকম ছিল যেভাবে তারা তাঁর প্রত্যাহারের আগে তাঁকে চিনেছিল। তাঁর আত্মা ছিল কালিমামুক্ত, কেননা দুঃখ দ্বারাও সঙ্কুচিত ছিল না, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারাও শিথিল ছিল না, হাসাহাসি ও হতাশা দ্বারাও প্রভাবিত ছিল না। লোকের ভিড় দেখেও তিনি বিরক্তি বোধ করলেন না, আবার তত মানুষের আলিঙ্গনেও অতি উৎফুল্লতা প্রকাশ করলেন না। তিনি একেবারে সাম্য বজায় রাখছিলেন এমন একজনের মত যে যুক্তিক্ষমতা দ্বারা চালিত ও প্রকৃতিগত অবস্থায় অবস্থিত। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যারা শারীরিক পীড়ায় আক্রান্ত ছিল, তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভু তাদের অনেককে নিরাময় করলেন, অন্যান্যদের অপদূত থেকে শুচীকৃত করলেন, ও আন্তনিকে কথনে অনুগ্রহ দান করলেন; ফলত তিনি দুঃখার্ত অনেককে সান্ত্বনা দিলেন, ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের বন্ধুত্বে ফিরিয়ে আনলেন, সকলকে এমন

উপদেশ দিয়ে যেন জগতে খ্রিষ্টপ্রেমের ঊর্ধ্বে কিছুই পছন্দ না করে। এবং যখন তিনি এমন উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন যেন তারা আসন্ন মঙ্গলদানগুলোর কথা স্মরণ করে ও আমাদের প্রতি সেই ঈশ্বরের কৃপারও কথা স্মরণ করে *যিনি নিজের পুত্রকে রেহাই দেননি, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে সঁপে দিলেন* (ক), তখন তিনি বিজনাশ্রমী জীবন বেছে নেবার জন্য তাদের অনেকের মন জয় করলেন। এভাবে, সেসময় থেকে পর্বতে পর্বতে মঠের উদ্ভব হল ও মরুপ্রান্তর হয়ে উঠল সন্ন্যাসীদের নগরী যারা নিজেদের আপনজনদের ছেড়ে স্বর্গীয় নাগরিকত্বের লক্ষ্যে নিজেদের তালিকাভুক্ত করল।

১৫। একদিন তাঁর পক্ষে আর্সিনোএ-র খাল পার হওয়া দরকার ছিল (উপলক্ষটা ছিল ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা), ও খালটা কুমিরে পূর্ণ ছিল (ক)। এবং তিনি এমনি প্রার্থনা করলে পর তিনি নিজে ও তাঁর সঙ্গীরা খালে নামলেন ও অক্ষত অবস্থায় পার হলেন। নিজের মঠে ফিরে এসে তিনি তাঁর সাধারণ সুযোগ্য কর্মে প্রাণপণে যোগ দিলেন। নিয়মিত কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি তাদের মনোবল সুস্থির করলেন যারা ইতিমধ্যে সন্ন্যাসী হয়েছিল ও বেশির ভাগ অন্যান্যদের মনে কৃচ্ছ্র সাধনার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করলেন; ও তাঁর কথার প্রতি আকর্ষণের মাধ্যমে অল্পকালের মধ্যে বহু বহু মঠের উদ্ভব হল ও তিনি নিজে পিতাই যেন তাদের সকলকে পরিচালনা করলেন।

সন্ন্যাসীদের কাছে উপদেশ

১৬। একদিন তিনি বাইরে গেলে সকল সন্ন্যাসী একটা উপদেশ শুনবার জন্য তাঁর কাছে এল। তিনি মিশরীয় ভাষায় তাদের একথা বললেন, 'শিক্ষালাভের জন্য শাস্ত্রই যথেষ্ট, কিন্তু একে অন্যকে বিশ্বাসে উৎসাহিত করা উত্তম কর্ম। ফলত তোমরা যা জান, তা বলায় সন্তানদের মত তা তোমাদের পিতার কাছে আন, এবং তোমাদের প্রবীণ বলে আমি যা জানি ও আমার অভিজ্ঞতার যে ফল, সেবিষয়ে তোমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করব। প্রথম কথা, আমরা যা শুরু করেছি, এসো, তা ফেলে না দেওয়ার একই আগ্রহ সবার মধ্যে ধরে রাখি; সেই ফেলে দেওয়ার প্রলোভন তখনই হয় যখন আমরা শ্রমে ভীরুমনা হই বা বলি, "কৃচ্ছ্র সাধনায় আমরা অনেক সময় কাটিয়েছি।" বরং আমরা

কেমন যেন দিনে দিনে শুরু করছি, এসো, আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করি। কেননা ভাবীকালের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, মানুষের গোটা আয়ুষ্কাল অধিক ক্ষণিক, ফলত অনন্ত জীবনের তুলনায় আমাদের গোটা জীবনকাল কিছুই নয়। জগতে যা কিছু বিক্রির মত তা তার মূল্য অনুযায়ী বিক্রি হয়, ও কেউ কেউ একটা বস্তু সেটার সমতুল্য বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করে। কিন্তু অনন্ত জীবনের অঙ্গীকার অল্প কিছুর মূল্যে কেনা হয়, কেননা লেখা আছে, *আমাদের জীবনের দিনগুলো সত্তর বছর ধারণ করে, কিন্তু বলিষ্ঠদের জন্য তা আশি বছর হতে পারে; ও যা কিছু সেই বর্ষকালের বেশি, তা দুঃখ ও কষ্ট হবে* (ক)। সুতরাং, আমরা যখন এই সাধনায় সেই গোটা আশি বছর এমনকি একশ’ বছরও জীবনযাপন করি, তখন যে বর্ষগুলো ধরে আমরা রাজত্ব করব, এই একশ’ বছর সেই বর্ষগুলোর সমান নয়, কেননা একশ’ বছরের চেয়ে আমরা যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করব। এবং যদিও আমরা পৃথিবীতে প্রতিযোগীর মত জীবনযাপন করে থাকি, তবু আমাদের উত্তরাধিকার আমরা এই পৃথিবীতে পাই না, কিন্তু স্বর্গে সেই সমস্ত অঙ্গীকারের ফলের অধিকারী হই। তাই ক্ষয়শীল এ দেহ ছেড়ে আমরা তা অক্ষয়শীল অবস্থায় ফিরে পাই (খ)।’

১৭। ‘সুতরাং, হে আমার সন্তানেরা, এসো, আমরা যেন নিরাশ না হই। আমরা যেন এমনটা না ভাবি যে, আমাদের সাধনার কাল বেশি দীর্ঘ হচ্ছে, বা আমরা যা করে এসেছি তা মহৎ, কেননা *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (ক)। এবং জগতের দিকে তাকিয়ে আমরা যেন এমনটা না ভাবি যে, আমরা মহৎ মহৎ কিছু ত্যাগ করেছি, কেননা গোটা পৃথিবীও স্বর্গে যা কিছু রয়েছে সেই সমস্ত কিছুর তুলনায় আসলে ক্ষুদ্র। এদিকে, যদিও এমনটা হত যে, আমরা গোটা পৃথিবীর প্রভু হতাম ও সেই গোটা পৃথিবী ত্যাগ করতাম, তবু সেই সমস্ত কিছু স্বর্গরাজ্যের তুলনায় কিছুই নয় বলে গণ্য হত। কেননা যেমন একজন একশ’টা সোনার দ্রাক্ষা অর্জন করার জন্য যদি একটা তামার দ্রাক্ষা অবজ্ঞা করতে পারত, তেমনি যে কেউ গোটা পৃথিবীর শাসনকর্তা হয়ে সেই পৃথিবী ত্যাগ করে, সে অল্প কিছু হারায় ও তার একশ’ গুণ বেশি গ্রহণ করে। কিন্তু যখন মূল্যে গোটা পৃথিবী স্বর্গের সমান নয়, তখন যে অল্প কয়েকটা খণ্ড জমি ত্যাগ করেছে, সে আসলে

কিছুই বিসর্জন দেয় না, এবং যদিও সে অতি মূল্যবান একটা বাড়ি ত্যাগ করে, তার পক্ষে বড়াই করার বা সাধনায় শিথিল হওয়ার কোন যুক্তি নেই। আমাদের এবিষয়েও সচেতন হওয়া উচিত যে, আমরা যদি সদ্‌গুণের খাতিরেও এসমস্ত কিছু ত্যাগ না করি, তাহলে পরে, যখন আমরা মরব, তখন সেসমস্ত কিছু পিছনে ফেলে রেখে চলে যাব, এমনকি, উপদেশক যেইভাবে আমাদের স্মরণ করান (খ), তা তাদেরই হাতে রেখে যাব যাদের দিতে আমরা ইচ্ছুক নই। ব্যাপারটা তেমন হলে তবে কেন আমরা সদ্‌গুণের খাতিরে সেই সমস্ত ত্যাগ করব না যাতে একটা রাজ্য পর্যন্তই উত্তরাধিকার হিসাবে পাই? অতএব, ধন-সম্পত্তির বাসনা যেন আমাদের কাউকে ধরে না ফেলে। কেননা যা কিছু আমরা সঙ্গে করে নিতে পারি না, সেই সমস্ত কিছুর অধিকারী হওয়ায় আমাদের কি লাভ? বরং যা সঙ্গে করে নিতে পারি, যেমন বিচক্ষণতা, ন্যায়, আত্মসংযম, সাহস, সুবুদ্ধি, ভালবাসা, গরিবদের প্রতি যত্নশীলতা, খ্রিষ্টে বিশ্বাস, ক্রোধ থেকে মুক্তি, আতিথেয়তা, কেন আমরা এসব কিছুরই অধিকারী হব না? আমরা এগুলোরই অধিকারী হলে তবে এমনটা আবিষ্কার করব যে, এগুলো আমাদের আগে আগে ছুটে সেখানে, সেই নম্রহৃদয়দের দেশে, আমাদের জন্য আতিথেয়তা প্রস্তুত করবে।'

১৮। 'এধরনের চিন্তা নিয়ে মানুষ যেন এতে নিশ্চিত হয় যে, এসমস্ত চিন্তা অবহেলার ব্যাপার নয়, বিশেষভাবে তখনই যখন সে নিজেকে প্রভুর দাস বলে গণ্য করে, ও দাস হিসাবে নিজের মনিবের ইচ্ছা পালন করতে বাধ্য। "যেহেতু কাল কাজ করেছি, সেজন্য আজ কাজ করব না", যেমন একটা দাস এধরনের কথা বলতে দুঃসাহস করবে না; কত সময় অতিবাহিত হয়েছে, তা গুনতে গুনতেও যেমন সে সামনের দিনগুলোতে শিথিল হবে না; বরং যেইভাবে সুসমাচারে লেখা রয়েছে সেই অনুসারে (ক) সে প্রত্যেক দিন নিজের মনিবকে খুশি করার জন্য ও বিপদ এড়াবার জন্য একই আগ্রহ দেখাবে, তেমনি এসো, আমরাও প্রতিদিন কৃচ্ছ্র সাধনা পালনে নিষ্ঠাবান থাকি, একথা জেনে যে, আমরা একদিনমাত্রও শিথিলতা দেখালে প্রভু আমাদের আগেকার সেবার খাতিরে আমাদের ক্ষমা করবেন না, বরং আমাদের অবহেলার কারণে নিজের ক্রোধ আমাদের উপর বর্ষণ করবেন। তেমন কথা আমরা এজেকিয়েলে শুনেছি (খ), ও একই

প্রকারে সেই যুদার বেলায়ও শুনেছি যিনি আগের শ্রমের ফল এক রাতে ধ্বংস করেছিলেন।’

১৯। ‘সুতরাং, হে আমার সন্তানেরা, এসো, সাধনায় নিষ্ঠাবান থাকি ও যেন শিথিল না হয়ে যাই। কেননা এই সাধনায় সহকর্মী হিসাবে প্রভু নিজেই আমাদের আছেন, যেইভাবে লেখা রয়েছে, যারা মঙ্গল বেছে নেয়, ঈশ্বর তাদের সঙ্গে *মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হন* (ক)। আর যাতে আমরা শিথিলতায় না পড়ি, সেজন্য প্রেরিতদূতের এই বচন বিচার-বিবেচনা করা উত্তম, তথা, *আমি প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করি* (খ)। কেননা আমরা যদি এমন মানুষের মত জীবনযাপন করি যে প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আমরা পাপ করব না। এবং সেই বচনের অর্থ এ, আমরা যেমন প্রতিদিন জেগে উঠি, তেমনি এসো, এমনটা ধরে নিই যে আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকব না; এবং একই প্রকারে, আমরা যখন শুয়ে পড়ার জন্য ব্যবস্থা করি, তখনও এসো, এমনটা ধরে নিই যে জেগে উঠব না। আমাদের জীবন স্বভাবেই অনিশ্চয়তা দ্বারা চিহ্নিত, ও [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান এক একটা দিনের ভিত্তিতেই সেই জীবন আমাদের বণ্টন করে। তাই আমরা এইভাবে ভাবলে ও এইভাবে জীবনযাপন করলে তথা “প্রতিদিন”, তবে আমরা পাপ করব না, অন্য কিছুও কামনা করব না, কারও বিরুদ্ধ ক্রোধও অন্তরে রাখব না, পৃথিবীতেও ধন জমাব না, বরং প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতিক্ষায় রয়েছে এমন মানুষের মত আমরাও সেইমত ধন-সম্পত্তি থেকে মুক্ত থাকব ও সকলের কাছে সবকিছু ক্ষমা করব। আমরা নারীর প্রতি কামনা বা অন্য কোন জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কামনা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করব শুধু নয়, আমরা বরং সবসময় সংগ্রামে রত থেকে ও বিচারের দিনের প্রতীক্ষা করতে করতে সেই কামনা থেকে মুখ ফেরাব কেমন যেন সেই কামনা এমন বাহ্যিক জিনিস যা অতীতের জিনিস বলে গত হয়েছে। কেননা পীড়নের বিষয়ে মহত্তর ভয় ও বিপদ সবসময় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আরাম ধ্বংস করে, ও পতিত প্রায় আত্মাকে জাগিয়ে তোলে।’

২০। ‘সুতরাং, যেহেতু আমরা শুরু করেছি ও সদ্‌গুণের পথে ইতিমধ্যে পদার্পণ করেছি, সেজন্য এসো, সামনে যা রয়েছে সেদিকে ধাবিত থাকি (ক)। কেউই যেন পিছনে না ফেরে যেইভাবে সেই লোটের স্ত্রী করেছিল, বিশেষভাবে এই কারণে যে, প্রভু বলেছিলেন, *যে কেউ লাঙলে হাত দিয়ে পিছনে ফেরে, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী*

নয় [খ]। আচ্ছা, "পিছনে ফেরা" এর অর্থ শুধু এ, দুঃখ অনুভব করা ও পুনরায় জাগতিক বিষয় ভাবা। কিন্তু তোমরা সদ্‌গুণ কথাটা শুনতে ভয় পেয়ো না, ও সদ্‌গুণ শব্দতে বিস্মিত হয়ো না, কেননা সদ্‌গুণ আমাদের কাছ থেকে দূরে নয়, আমাদের বাইরেও অবস্থিত নয়, বরং তার সিদ্ধি আমাদের অভ্যন্তরে রয়েছে, ও আমরা ইচ্ছুক হলে তবে কর্মটাও সহজ। এদিকে গ্রীকেরা উচ্চশিক্ষা লাভের খাতিরে দেশ ছেড়ে সাগর পার হয়, কিন্তু স্বর্গরাজ্যের খাতিরে আমাদের পক্ষে বিদেশে যাওয়া কোন দরকার হয় না, সদ্‌গুণ পাবার জন্য কোন সাগর পার হওয়াও প্রয়োজন নেই; কেননা প্রভু আগেই আমাদের বললেন, *স্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে রয়েছে* [গ]। তাই সদ্‌গুণের জন্য যা যা দরকার তা হলো আমাদের ইচ্ছা, যেহেতু সেই সদ্‌গুণ আমাদের অন্তরে রয়েছে ও আমাদের অন্তর থেকে উদ্গত হয়। কেননা তখনই সদ্‌গুণ আছে যখন প্রাণ তার নিজের আত্মিক অংশটা প্রকৃতিগত অবস্থায় রক্ষা করে; এবং তখনই প্রাণ সেই প্রকৃতিগত অবস্থায় রয়েছে, যখন প্রাণ যেইভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল সেইভাবে থাকে, কেননা প্রাণ সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে সৎ বলে নির্মিত হয়েছিল। এজন্যই নূনের সন্তান যোশুয়া লোকদের উৎসাহিত করার সময়ে বলেছিলেন, *ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভুর দিকে তোমাদের হৃদয় সোজা কর* [ঘ]। এবং [বাপ্তিস্মদাতা] যোহন বলেছিলেন, *তোমাদের পথ সোজা কর* [ঙ]। প্রাণের কথা বললে তবে "সোজা হওয়া" এর অর্থ হলো প্রাণের আত্মিক অংশটা প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে ওঠা, সেইভাবে যেইভাবে তা সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু প্রাণ যখন নিজ কক্ষপথ থেকে সরে যায় ও তার যা প্রকৃতিগত তা থেকে বাঁকা পথে চলে যায়, তখন আমরা প্রাণের রিপুরই কথা বলি। তাই কর্মটা কঠিন নয়, কেননা আমরা যদি সেইভাবে থাকি যেইভাবে নির্মিত হয়েছিলাম, তাহলে আমরা সদ্‌গুণে রয়েছি, কিন্তু যদি আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে অযোগ্য বস্তুর দিকে ফেরাই, তখন আমরা দুষ্ট বলে নিন্দিত হই। কাজটা যদি এমন কিছুর উপর নির্ভর করত যা বাইরে থেকে আনা দরকার হত, তাহলে কাজটা সত্যিই কঠিন হত; কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা আমাদের নিয়েই কেন্দ্র করে, সেজন্য এসো, জঘন্য চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেদের রক্ষা করি, এবং যেহেতু এই প্রাণকে আমরা গচ্ছিত সম্পদ যেনই গ্রহণ করেছি, সেজন্য এসো, প্রভুর জন্যই তা সংরক্ষণ করি, যাতে তিনি নিজের কর্মকে সেইভাবে চিনে নিতে পারেন যেইভাবে তা নির্মাণ করেছিলেন।'

২১। ‘প্রতিযোগিতা আমাদেরই হোক, যাতে ক্রোধ আমাদের উপর শাসন না চালায় ও কামনা-বাসনা আমাদের ভূপাতিত না করে, কেননা লেখা আছে, *মানুষের ক্রোধের ফলে ঈশ্বরের ধর্মময়তা অনুযায়ী কোন কাজ হতে পারে না ও কামনা-বাসনা গর্ভস্থ হয়ে পাপ প্রসব করে, এবং পাপ, একবার সাধিত হলে, মৃত্যুকে জন্মায়* (ক)। এইভাবে জীবনধারণ ক’রে, এসো, আমরা সযত্নে জাগ্রত থাকি ও শাস্ত্রে যেভাবে বলে সেই অনুসারে, এসো, আমাদের *হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত রাখি* (খ)। কেননা আমাদের সেই ভয়ঙ্কর ও চালাক শত্রু আছে তথা সেই অপদূতেরা, এবং আমাদের সংগ্রাম এদেরই বিরুদ্ধে, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এই অন্ধকারময় জগতের অধিপতিদের বিরুদ্ধে, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগুলোর বিরুদ্ধে* (গ)। আকাশে-বাতাসে আমাদের চারদিকে তাদের ভিড় মহৎ, ও আমাদের কাছ থেকে তত দূরে নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য মহৎ। তাদের প্রকৃতি ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য সংক্রান্ত আলোচনা অতিরিক্ত দীর্ঘ হত; তাছাড়া সেবিষয়ে আলোচনা করা তাদেরই মানায় যারা আমাদের চেয়ে মহান। কিন্তু আপাতত আমাদের জন্য যা জরুরী ও অত্যাবশ্যক, তা হলো আমাদের বিরুদ্ধে তাদের চালাকি সম্পর্কে অবগত হওয়া।’

২২। ‘প্রথমত আমাদের এ বোঝা উচিত যে, যা যা আমরা “অপদূত” বলে চিহ্নিত করি, সেই অপদূতেরা যে সেই আকার অনুসারে সৃষ্ট হয়েছিল এমন নয়, কেননা ঈশ্বর অনিষ্টকর কোন কিছু গড়েননি। সেগুলোকে মঙ্গলময় বলেই গড়া হয়েছিল, কিন্তু স্বর্গীয় প্রজ্ঞা থেকে পতিত হলে ও তারপরে পৃথিবী জুড়ে ঘুরতে ঘুরকে সেগুলো নানা আত্মপ্রদর্শনী দিয়ে গ্রীকদের প্রবঞ্চিত করল, এবং খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের ঈর্ষা করায় সেগুলো স্বর্গের দিকে আমাদের যাত্রা ব্যর্থ করার জন্য নিজেদের কামনা-বাসনায় সবকিছুতে হস্তক্ষেপ করে যাতে করে, যে স্থান থেকে নিজেরা পতিত হয়েছিল, আমরা যেন সেখানে আরোহণ করতে না পারি। সেজন্য যথেষ্ট প্রার্থনা ও সাধনা দরকার, যাতে করে, যে কেউ পবিত্র আত্মা দ্বারা আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার অনুগ্রহদান পায় (ক), সে যেন সেগুলোর বৈশিষ্ট্য চিনে নিতে পারে, যেমন, সেগুলোর মধ্যে কোন্‌টা কোন্‌টা কম ও কোন্‌টা কোন্‌টা বেশি খারাপ; অথবা সেগুলোর এক একটা কোন্‌ ধরনের বিশিষ্ট

কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে, ও কেমন করে সেগুলোর এক একটাকে ভূপাতিত ও বিতাড়িত করা যেতে পারে। কেননা সেগুলোর যে চালাকি ও সেগুলোর মতলবে যে পদ্ধতি, তা বহু ধরনের। ধন্য প্রেরিতদূত ও তাঁর সঙ্গীরা এসমস্ত জানতেন যখন বলেছিলেন, *তার মতলব আমাদের অজানা নয়* (খ), এবং আমরা সেগুলোর হাতে যে যে পরীক্ষা সহ্য করেছি, সেই ভিত্তিতে আমাদের এক একজনকে সেগুলো থেকে দূরে, সৎপথেই থেকে সংশোধন করা উচিত। অতএব, সেগুলো বিষয়ে প্রমাণ পেয়েছি বলেই আমি আমার নিজের সন্তানই যেন তোমাদের উদ্দেশ করে কথা বলছি।’

২৩। ‘অপদূতেরা যখন খ্রিষ্টিয়ান একজনকে দেখতে পায়, বিশেষভাবে এমন সন্ন্যাসীকে দেখতে পায় যে খুশি মনে শ্রম করে ও অগ্রসর হয়, তখন তারা তাদের পথে হোঁচট খাওয়ানোর মত বাধা বসিয়ে তাদের আক্রমণ করে ও প্রলোভন দেখায়। তাদের ব্যবহৃত হোঁচট খাওয়ানোর বাধা হলো কুচিন্তা। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাদের বিভ্রমে ভয় পেতে দরকার হয় না, কেননা প্রার্থনা, উপবাস ও প্রভুতে বিশ্বাস দ্বারা তারা সাথে সাথেই ভূপাতিত হয়; কিন্তু পতিত হওয়ার পরেও তারা নিজেদের প্রচেষ্টা বন্ধ করে না, বরং শঠতা ও চাতুরির মধ্য দিয়ে আবার এগিয়ে আসে। যখন তারা জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি দ্বারা সরাসরি একজনের আত্মাকে প্রবঞ্চিত করতে পারে না, তখন তারা পুনরায় অন্য প্রকারে আক্রমণ চালায় ও সেই অনুসারে নিজেদের আত্মপ্রদর্শনী পরিবর্তন ক’রে তারা ভয় ছড়াতে, নিজেদের গঠন পাল্টিয়ে, নারী, বন্যজন্তু, সরিসৃপ, বিরাট দেহ ও সহস্র সহস্র সৈন্যদের আকার ধারণ ক’রে নিজেদের প্রচেষ্টা চালায়। তথাপি আমাদের পক্ষে তাদের প্রবঞ্চনাময় আত্মপ্রদর্শনীতে ভয় পাওয়া দরকার হয় না, কেননা সেই সবকিছু কিছুই না ও শীঘ্রই মিলিয়ে যায়, বিশেষভাবে তখনই যখন একজন বিশ্বাস ও ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা নিজেকে বলবান করে। অবশ্যই, তারা সাহসী ও একেবারে নির্লজ্জ, কেননা যখন তারা সেইভাবে পরাভূত হয়, তখন এমনিই অন্যভাবে পুনরায় আক্রমণ চালায়। তারা এমনটা ভান করে যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণী দিতে ও আসন্ন বিষয় আগে থেকে ঘোষণা করতে পারে; আবার তারা নিজেদের এমনভাবে বড় দেখায় কেমন যেন ছাদের মত উচ্চ ও একেবারে প্রশস্ত, যাতে করে যাদের তারা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা পথভ্রষ্ট করতে অক্ষম হয়েছিল, তাদের যেন চালাকি ক’রে বিভ্রমের মাধ্যমে কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু তারা

যখন এমনটা দেখে যে, এক্ষেত্রেও প্রাণ বিশ্বাসে ও প্রত্যাশাপূর্ণ সঙ্কল্পে সংরক্ষিত, তখন সাহায্যের জন্য নিজেদের দলপতিকে আনে।’

২৪। ‘তারা প্রায়ই সেই দিয়াবলের মত আবির্ভূত হয় যাকে প্রভু যোবকে দেখিয়ে বলেছিলেন, *তার চোখ প্রভাতী তারার মত। তার মুখ থেকে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-ঝলক নির্গত হয় ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তার নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গারের আগুনে ফুটন্ত চুল্লির ধোঁয়া নির্গত হয়। তার শ্বাস অঙ্গার স্বরূপ ও তার মুখ থেকে বের হয় আগুনের শিখা* (ক)। যখন অপদূতদের প্রধান এই আকারে আবির্ভূত হয়, তখন, আমি যেমন আগে বলেছিলাম, সেই অনুসারে সেই ধূর্তজন বড় বড় ঘোষণা দিয়ে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করে, যেইভাবে প্রভু যোবকে তার বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, *কেননা সে লোহাকে তুষের মত ও ব্রোঞ্জকে পচা কাঠের মত গণ্য করে, … সমুদ্রকেও মলমের পাত্রের মত ও অতল গহ্বরকে একটা বন্দির মত দেখে, তার কাছে সেই গহ্বর হেঁটে বেড়াবার স্থানের মত* (খ); এবং নবীর মুখ দিয়ে প্রভু বলেছিলেন, *শত্রু বলছিল: ধাওয়া করে তাদের ধরব, তাদের লুট করে নেব* (গ), এবং আরেকজন দ্বারা বলেছিলেন, *আমি আমার হাতে গোটা জগৎকে পাখির নীড়ের মত কেড়ে নেব, ফেলানো ডিমের মতই তাদের ধরব* (ঘ)। এক কথায়, তারা এ ধরনের দাবি দিয়ে নিজেদের বড়াই রটায়, ও ভক্তপ্রাণদের প্রবঞ্চিত করার জন্যই তেমনটা ঘোষণা করে। কিন্তু এবারও, বিশ্বস্ত এই আমাদের জন্য দিয়াবলের এই আবির্ভাব ভয় করা ও তার কথায় আতঙ্কিত হওয়া দরকার হয় না, কেননা সে মিথ্যা বলে; হ্যাঁ, সে সত্যকথা আদৌ বলে না; কিন্তু সে তেমন ও ততখানি কথা বললেও ও অধিক সাহসী হলেও তোমরা কিছুই মনে করো না; একটা সাপের মত তাকে ত্রাণকর্তা দ্বারা বড়শি দিয়ে টানা হয়েছে, ভারবাহী পশুর মত তার নাসারন্ধ্রে দড়ি দেওয়া হয়েছে, পলাতকের মত তার নাসারন্ধ্রে নথ লাগানো হয়েছে, ও তার ঠোঁট দু’টো লোহার কীলকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে; চড়ুই পাখির মত তাকে ত্রাণকর্তা দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যাতে সে আমাদের বিদ্রূপের বস্তু হতে পারে। এবং বিছে ও সাপের মত তাকে ও তার সঙ্গী অপদূতদের এমন অবস্থায় রাখা হয়েছে যাতে খ্রিষ্টিয়ান আমরা তাদের পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারি। এবং এর প্রমাণ এটা হলো যে, আমরা এখন তার বিপরীতেই জীবনধারণ করছি; কেননা যে সমুদ্রকে শুষ্ক করে দেবে ব’লে ও জগৎকে

ছিনিয়ে নেবে ব'লে হুমকি দিচ্ছিল, দেখ সে কেমন করে তোমাদের সাধনায় বাধা দিতে, এমনকি তার বিরুদ্ধে আমার এই কথা বন্ধ করতে অক্ষম। সুতরাং সে যাই বলুক না কেন আমরা যেন তাতে মনোযোগ না দিই, কেননা সে মিথ্যা বলে, তার নানা আবির্ভাবেও যেন আতঙ্কিত না হই, কেননা সেগুলোও প্রতারণা মাত্র। সেগুলোতে যা দেখা দেয়, তা প্রকৃত আলো নয়, বরং তাদের জন্য প্রস্তুত করা যে আগুন, সেই আবির্ভাবে সেই আগুনের প্রথম লক্ষণ ও সাদৃশ্য (ঙ) রয়েছে, ও যে পদার্থে তারা অল্পকালের মধ্যে ক্ষয় হয়ে যাবে, সেই পদার্থেই তারা মানবজাতিকে আতঙ্কিত করতে সচেষ্ট। তারা যে আবির্ভূত হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশ্বস্তদের একজনমাত্রকেও বিক্ষত না করেই তারা সাথে সাথে মিলিয়ে যায় ও সঙ্গে করে সেই আগুনের সাদৃশ্য নিয়ে যায় যা তাদের গ্রহণ করে নিতে উদ্যত। তাই এখানে তাদের ভয় করা দরকার হয় না, কেননা খ্রিষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।'

২৫। 'কিন্তু তবুও তারা বিশ্বাসঘাতক, ও সমস্ত আকারে নিজেদের পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করতে প্রস্তুত। অদৃশ্যমান অবস্থায়ও তারা প্রায়ই পবিত্র সঙ্গীত গাইতে ভান করে ও শাস্ত্র থেকে নেওয়া বচনগুলো আবৃত্তি করে। এবং পাঠ করতে থাকাকালেও আমরা যা পাঠ করে থাকি, তারা সাথে সাথে সেই সমস্ত কিছু প্রতিধ্বনিতেই যেন বারে বারে আবৃত্তি করে। আমরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতেই তারা প্রার্থনার জন্য আমাদের জাগিয়ে তোলে, এবং তেমনটা অবিরতই করতে করতে আমাদের ঘুমাবার সুযোগ পর্যন্তও দেয় না। এমনটা সম্ভব হয় যে, তারা সন্ন্যাসীদের রূপ অনুযায়ী বেশ ধারণ করে ও ভক্তপ্রাণদের মত কথা বলার ভান করে যাতে করে রূপের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে প্রতারণা ক'রে তাদের যেখানে ইচ্ছে সেই সকলকে আকর্ষণ করতে পারে যাদের বিভ্রান্ত করেছে। তাসত্ত্বেও তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার হয় না যদিও তারা প্রার্থনার জন্য তোমাদের ঘুম থেকে জাগায়, অথবা আদৌ কিছুই না খেতে পরামর্শ দেয়, বা যদিও এমনটা মনে হয় তারা আমাদের এমন বিষয়ে অভিযুক্ত করে বা ভর্ৎসনা করে যা সম্পর্কে অন্য সময় আমাদের সায় দিয়েছিল। তারা যে ভক্তি বা সত্যের খাতিরে এসব কিছু করে এমন নয়, বরং তাদের লক্ষ্যই যেন সরলমনাকে হতাশায় ফেলতে পারে, সাধনাকে অনুপযোগী বলে ঘোষণা করতে পারে, বিজনাশ্রমী জীবনকে কষ্ট ও বোঝা বলে

উপস্থাপন ক'রে মানুষকে সেই জীবন ঘৃণা করাতে পারে, ও তাদেরই পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে যারা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সেই পথে চলে।'

২৬। 'প্রভুর প্রেরিত সেই নবী তেমন প্রাণীদের হতভাগা বলে অভিহিত করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *ধিক্ তাকে যে নিজের প্রতিবেশীকে উত্তেজক পানীয় পান করায়* (ক)। কেননা তেমন ব্যবহার ও চিন্তা সদ্‌গুণ অভিমুখে পথে বিঘ্ন ঘটায়। এক্ষেত্রে, যদিও অপদূতেরা সত্য বলত (কেননা *আপনি ঈশ্বরের পুত্র* (খ) বলায় তারা তো সত্য বলেছিল), তবু প্রভু নিজেই তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাদের কথা বলতে বাধা দিতেন পাছে তারা সত্যের সঙ্গে নিজেদের অনিষ্ট বোনে; তাছাড়া তিনি আমাদের এব্যাপারে অভ্যস্ত করতে চাচ্ছিলেন যেন আমরা তাদের কথায় তখনও মনোযোগ না দিই যখন এমনটা মনে হয় যে, তারা সত্য বলে। কেননা শাস্ত্রের অধিকারী ও ত্রাণকর্তার মুক্তিরও অধিকারী এই আমরা, সেই আমাদের পক্ষে দিয়াবল দ্বারা শিক্ষা পাওয়া মানায় না, সেই যে দিয়াবল নিজের পদশ্রেণি রক্ষা করেনি (গ) বরং নিজের মন একদিক থেকে অন্যদিকে অবিরতই পাল্টায়। সেই কারণে, যখন সে শাস্ত্রের কোন বচন উচ্চারণ করে, তখনও প্রভু এ বলে তাকে বারণ করে, *কিন্তু পাপীকে ঈশ্বর বলেন, তুমি কেন আমার বিধিনিয়ম আবৃত্তি কর ও আমার সন্ধির কথা মুখে তুলে আন?* (ঘ)। কেননা অপদূতেরা সবই করে, হ্যাঁ, তারা বাজে কথা বলে, মানুষের মন বিভ্রান্ত করে, এমন ভান করে তারা যা, তা থেকে তারা অন্য কিছু, ও গোলমাল সৃষ্টি করে, এবং এসব কিছু তারা করে সরলমনাদের প্রতারিত করার লক্ষ্যে। তাছাড়া তারা তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ ধ্বনিত করে, পাগলের মত হাসাহাসি করে ও ফিসফিস করে। কিন্তু একজন তাদের মনোযোগ না দিলে তবে তারা চিৎকার করে ও পরাস্তই যেন কান্নাকাটি করে।'

২৭। 'সেজন্য ঈশ্বর হওয়ায় প্রভু তাদের মুখ বন্ধ করতেন। কিন্তু, যেহেতু আমরা পবিত্রজনদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি, সেজন্য তাঁরা যেমন ব্যবহার করতেন, আমাদের পক্ষেও সেইমত ব্যবহার করা ও তাঁদের সাহস অনুকরণ করা সমীচীন। কেননা তেমন কিছু দেখলে তাঁরা বলতেন, *যখন পাপী আমার সামনে দাঁড়াল, তখন আমি নির্বাক্ ছিলাম, নিজেকে অবনমিত করলাম, ও মঙ্গলময় কথা বলা থেকে মৌন থাকলাম* (ক); আরও, *বধিরের মত আমি শুনিনি, আমি এমন বোবারই মত যে খোলে না মুখ, আমি*

তেমন মানুষের মত ছিলাম যে কিছুই শোনে না [খ]। সুতরাং সেই অপদূতদের সঙ্গে অচেনা লোকদের মত ব্যবহার ক'রে আমরাও যেন তাদের মনোযোগ না দিই, ও যখন তারা প্রার্থনার জন্য আমাদের ঘুম থেকে জাগায় বা উপবাস সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কথা বলে, তখনও যেন আমরা তাদের প্রতি বাধ্য না হই। বরং যদিও ওরা সবকিছুতে চাতুরির সঙ্গে ব্যবহার করে, তবু এসো, সাধনায় আমাদের নিজেদের সঙ্কল্পে ব্যস্ত থাকি পাছে তাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হই। এবং যখন এমনটা মনে হয়, ওরা আমাদের আক্রমণ করছে ও মৃত্যুর হুমকি দ্বারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, তখনও আমরা তাদের বিষয়ে আতঙ্কিত হব না, কেননা ওরা দুর্বল, ও হুমকি ছড়ানো ছাড়া অন্য কিছু করার ওদের কোন ক্ষমতা নেই।'

২৮। 'এতক্ষণ ধরে আমি এবিষয়ে কোন রকমে কথা বলে এসেছি, কিন্তু এখন তাদের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণী দেওয়ায় আমার আর দ্বিধা করতে নেই, কেননা আমার এই স্মারক কথা তোমাদের রক্ষায় কার্যকর হবে।

প্রভু আমাদের মধ্যে বসবাস করার সময় থেকেই শত্রু ভূপাতিত ও তার পরাক্রম কমে গেছে। সেজন্য, যদিও সে কিছুই করতে অক্ষম, তবু পতিত একটা স্বৈরশাসকের মত সে চুপচাপ থাকে না, কিন্তু হুমকি ছড়ায়, যদিও সেই সমস্ত হুমকি কথামাত্র। তোমরা এক একজন একথা মনে রেখ, তবে অপদূতদের সঙ্গে অবজ্ঞা ভরে ব্যবহার করার শক্তি পাবে। এদিকে, ওরা যদি আমাদের দেহের সদৃশ একটা দেহে গণ্ডিবদ্ধ থাকত, তাহলে একথা বলতে পারত, "যারা নিজেদের লুকোয় আমরা তাদের খুঁজে পেতে পারি না, কিন্তু যখন তাদের খুঁজে বের করি তখন তাদের ক্ষতি করি", ফলত, ওদের বিরুদ্ধে সমস্ত দরজায় তালা মেরে নিজেদের লুকিয়ে আমরা ওদের এড়াতে পারতাম। তথাপি ওরা এরকম [আমাদের মত] না হলেও তবু তালা-মারা দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকবার ক্ষমতা রাখে ও আকাশে-বাতাসে ওদের সঙ্গে তথা ওদের ও ওদের দলনেতার অর্থাৎ দিয়াবলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়, ও যদিও ওরা দুষ্টতা সাধনে ব্যগ্র ও ক্ষতি করার জন্য তৈরী, ও ত্রাণকর্তা যেমন বলেছেন, *অনিষ্টের পিতা সেই দিয়াবল আদি থেকেই নরঘাতক* [ক], তবু আমরা এখন জীবিত, এমনকি ওকে প্রতিরোধ করায়ই জীবনযাপন করছি। এতে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, ওরা কোন শক্তি রাখে না। কেননা মতলব সাধন করার ব্যাপারে একটা স্থান

ওদের প্রতিরোধ করতে পারে না, আমাদের প্রতি দয়া দেখাবার জন্য যে ওরা আমাদের বন্ধু বলে দেখে তাও নয়, ও এমন মঙ্গলপ্রেমিকও নয় যে সংশোধিত হবার জন্য অভিপ্রেত। বরং ওরা খারাপ ও যারা সদ্‌গুণ ভালবাসে ও ঈশ্বরকে সম্মান করে, তাদের ক্ষতি করার বাসনার মত ওদের আর কোন বাসনা নেই। কিন্তু যেহেতু ওরা কার্যকর হবার ক্ষমতা রাখে না, সেজন্য হুমকি ছড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে না। যদি সেই ক্ষমতা রাখত, তাহলে ওরা বিলম্ব না করেই বরং যে অনিষ্টের দিকে ওরা অনুরক্ত সাথে সাথেই সেই অনিষ্ট সাধন করত, বিশেষভাবে সেই অনিষ্ট যা আমাদেরই বিরুদ্ধে লক্ষ করে। লক্ষ কর, এখানে সমবেত এই আমরা এখন ওদের বিরুদ্ধে কথা বলছি, ও ওরা জানে যে আমরা যতখানি অগ্রসর হই ওরা ততখানি বেশি দুর্বল হয়। এমনকি, ওদের যদি সেই ক্ষমতা থাকত তাহলে খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের একজনকেও জীবিত থাকতে দিত না, কেননা *পাপীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরভক্তি ঘৃণ্য বস্তু* (খ)। কিন্তু যেহেতু ওরা কিছুই করতে পারে না, সেজন্য ওরা নিজেদেরই ক্ষতি ঘটায়, কেননা ওরা যা বিষয়ে হুমকি দেয়, তা সম্পাদন করতে অক্ষম।

ওদের বিষয়ে আমাদের ভয়-আতঙ্ক শেষ করার জন্য আমাদের একথা ভাবা উচিত: তেমন অধিকার ওদের থাকলে, তবে ওরা ভিড় করে আসত না, নিজেদের রূপ পাল্টিয়েও নিজেদের ফন্দি-ফিকির খাটাত না, বরং ওদের কেবল একজনেরই পক্ষে আসা ও নিজের সাধ্যমত ও পছন্দমত যা করার তা করা যথেষ্ট হত, বিশেষভাবে একারণে যে, যে কেউ তেমন ক্ষমতার অধিকারী হলে, তবে সে নানা আত্মপ্রদর্শনী দ্বারা ধ্বংস করত না, বড় বড় ভিড়ের মাধ্যমেও ভয় ছড়াত না, বরং নিজের পছন্দমত নিজের অধিকার সরাসরিই অনুশীলন করত। তথাপি অপদূতেরা কোন কিছুই সাধন করতে অক্ষম হওয়ায় নিজ নিজ রূপ পাল্টিয়ে ও ভয়ঙ্কর আবির্ভাব ও নানা রূপ অবলম্বন ক'রে বালকদের সন্ত্রাসিত ক'রে মঞ্চেই যেন নানা পাঠ অভিনয় করে। তেমন ব্যবহারের জন্য ওদের বরং ভীরু বলে অবজ্ঞাত হওয়া উচিত। বাস্তবিকই যিনি আশুরীয়দের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, কমপক্ষে প্রভুর সেই সত্যকার দূতের পক্ষে সঙ্গী কোন ভিড়, বা দৃষ্টিগোচর আত্মপ্রদর্শনী, বা তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ বা হট্টগোলও দরকার ছিল না, কিন্তু নিজের অধিকার শান্ত ভাবে অনুশীলন করলেন ও সাথে সাথেই এক লক্ষ পঁচাশি হাজার

শত্রুকে বিনাশ করলেন (গ)। কিন্তু এই যে অপদূতেরা কোন কিছুই করার অধিকার রাখে না, এরা কমপক্ষে বিভ্রম দ্বারাই ভয় দেখাতে বাধ্য।’

২৯। ‘এদিকে, যে কেউ যোবের জীবনের ঘটনাসমূহ বিষয়ে ভাবে ও সেই সম্পর্কে বলে, “তবে কেনই বা দিয়াবল এগিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সেই সবকিছু সাধন করল? সে কি তাঁকে সমস্ত ধন-সম্পদ বঞ্চিত করেনি, তাঁর ছেলেমেয়েদের কি বিনাশ করেনি, ও কষ্টকর ফোড়ার আঘাতে কি তাকে আঘাত করেনি? (ক)। তবে যে তেমন প্রশ্ন রাখে, তার এ জানা উচিত যে, দিয়াবল যে ছিল সেই শক্তির অধিকারী তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরই দিয়াবলের হাতে পরীক্ষা করার ভার তুলে দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, সে কোন কিছু করার অক্ষম ছিল বিধায় তেমনটা যাচনা করেছিল, ও যখন তার যাচনা মঞ্জুর করা হল, তখন সে কাজে লাগল। তাই এক্ষেত্রেও শত্রু নিন্দিত হওয়ার যোগ্য, কেননা সে যখন বাসনা করেছিল, তখনও ধর্মপ্রাণ সেই মানুষের উপর জয়ী হতে পারল না। কেননা তার যদি সেই অধিকার থাকত, তাহলে সে সেই যাচনা উপস্থাপন করত না। কিন্তু যাচনা করায়, একবার শুধু নয়, দু’ দু’ বারই, সে নিজেকে একেবারে দুর্বল ও অক্ষম দেখিয়েছিল। এবং সে যে যোবের উপরে কোন অধিকার রাখছিল না, তা তত বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, কেননা ঈশ্বর অনুমতি না দিলে তবে বিনাশ সেই মানুষের গবাদি পশুর উপরেও পড়তে পারত না। শূকরদের উপরেও দিয়াবল কোন অধিকার রাখে না, কেননা সুসমাচারে লেখা আছে, তারা মিনতি করে প্রভুকে বলল, *ওই শূকরদের মধ্যে আমাদের পাঠিয়ে দিন* (খ)। কিন্তু তারা যখন শূকরদের উপরে অধিকার রাখেনি, তখন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষদের উপরে সেটার চেয়ে আরও কম অধিকার রাখে।’

৩০। ‘তাই সেই অপদূতদের অবজ্ঞা ক’রে ও সেগুলোকে আদৌ ভয় না ক’রে আমাদের কেবল ঈশ্বরকে ভয় করা প্রয়োজন। এমনকি, তারা এধরনের কিছু যতই সাধন করে, এসো, যে সাধনা তাদের বিরোধিতা করে সেই সাধনা বৃদ্ধিতে নিজেদের তত বেশি নিয়োজিত করি, কেননা তাদের বিরুদ্ধে মহৎ যে অস্ত্র, তা হলো সৎজীবন ও ঈশ্বরে আস্থা। তারা নানা ক্ষেত্রে সাধকদের ভয় পায় যেমন উপবাস, রাত্রিজাগরণ, প্রার্থনা, কোমলতা ও শালীনতা, অর্থ-অবজ্ঞা, অভিলাষ-শূন্যতা, বিনম্রতা, গরিবদের প্রতি ভালবাসা, অর্থদান, ক্রোধ থেকে মুক্তি, ও সর্বোপরি খ্রিষ্টের প্রতি ভক্তি। ঠিক

একারণেই তারা এসব কিছু করে, যাতে এমন কেউই না থাকে যে তাদের পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেয়; কেননা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য ত্রাণকর্তা তাঁর বিশ্বস্তদের যা মঞ্জুর করেছেন, তারা সেই অনুগ্রহের কথা জানে; তিনি তো বলেছিলেন, *দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার, ও সেই শত্রুর সমস্ত পরাক্রমের উপরে কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছি* (ক)।'

৩১। 'তাই তারা ভবিষ্যদ্বাণী দিতে ভান করলে কেউই যেন তাতে মনোযোগ না দেয়। এমনটা প্রায়ই ঘটে যে, আমাদের যে ভ্রাতারা যাত্রা করতে উদ্যত, যাত্রাটা শুরু হওয়ার বেশ কিছু দিন আগেই সেই অপদূতেরা সেই ভ্রাতাদের যাত্রার কথা আমাদের জানায়, ও সেই ভ্রাতারা সত্যিই আসে। অপদূতেরা যে তাদের শ্রোতাদের জন্য চিন্তিত বিধায় তেমনটা করে তা নয়, কিন্তু সেই শ্রোতারা যেন তাদের উপর আস্থা রাখে, এবিষয়ে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যেই তারা তেমনটা করে, ও তেমনটা করার পর সেই ভ্রাতাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের বিনাশ ঘটায়। সুতরাং তাদের মনোযোগ দিতে নেই, বরং তারা তেমন কথা বলতে বলতেই আমাদের তাদের উল্টিয়ে দিতে হয়, কেননা আমাদের পক্ষে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এতে তত আশ্চর্যের কিবা আছে যখন তারা মানুষদের দেহের চেয়ে সত্তায় সূক্ষ্ম দেহ ব্যবহার করে বিধায় যারা রওনা হতে যাচ্ছে তাদের উপর নজর রেখে যাত্রা শুরু হলেই তাদের চেয়ে দ্রুত বেগে ছুটে তাদের আগমনের কথা আমাদের জানায়? তেমন কিছু একজন ঘোড়া চড়েই সাধন করতে পারে যখন যারা পায়ে যাত্রা করছে তাদের আগে আগে গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছে। না, যা এখনও ঘটেনি, তেমন ঘটনার উপরে তাদের কোন পূর্বজ্ঞান নেই: ঈশ্বরই সেই একমাত্রজন, যিনি সমস্ত কিছু জন্মাবার আগে সেই সমস্ত কিছু জানেন। কিন্তু এরা চোরের মত আগে আগে ছোটে ও যা দেখেছে সেটার খবর দেয়। আমরা যে এখানে সমবেত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলছি, আমাদের একজন রওনা হয়ে খবর দেওয়ার আগে তারা কতজনকেই না এই মুহূর্তে আমাদের চলাফেরা বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে পারে! কিন্তু দ্রুতগামী একটা ছেলেও ধীরগতি অন্য ছেলেকে ছাড়িয়ে গিয়ে একই কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

আমি যা বলতে চাই তা এ। কোন একজন থেবাইস অঞ্চল থেকে বা অন্য স্থান থেকে যাত্রা শুরু করলে সে যদিও রওনা হয়, তবু সে না হাঁটা পর্যন্ত সেই অপদূতেরা কিছুই জানে না; সে যে হাঁটছে তা দেখবার পরেই তারা আগে আগে ছুটে তার আগমনের আগে সেবিষয়ে খবর দেয়। আর আসলে এমনটা ঘটে যে, সেই যাত্রীরা কিছু দিন পরে গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু বহুবার এমনটাও ঘটে যে, যাত্রাকালে যাত্রী ফিরে যায়, আর তখন অপদূতেরা মিথ্যাবাদী বলে ধরা পড়ে।'

৩২। 'তেমনটাও তখন ঘটে যখন তারা [নীল] নদের জল সম্পর্কে মাঝে মাঝে নির্বোধের মত কথা বলে। কেননা যখন তারা ইথিওপিয়ার কোন না কোন স্থানে অনেক বৃষ্টি লক্ষ করে, তখন, যেহেতু তারা জানে যে, নদীর বন্যার উদ্ভব সেইখানে হয়, সেজন্য জল মিশরে ঢুকবার আগে তারা আগে আগে ছুটে সেবিষয়ে খবর দেয়। কিন্তু মানুষেরাও তেমনটা করতে পারত যদি অপদূতদের মত দ্রুতবেগে ছুটতে পারত। দাউদের সেই প্রহরী যখন উচ্চস্থানে উঠেছিল, তখন যে লোকটা এগিয়ে আসছিল, যে কেউ নিচে থেকে গেছিল তার চেয়ে সে-ই তাকে আরও স্পষ্ট ভাবে দেখতে পেয়েছিল (ক), এবং অন্যান্যরা আসবার আগে, যে আগে আগে দৌড়োচ্ছিল, সে এমন কিছু বলেনি যা তখনও ঘটেনি, কিন্তু যা ঘটতে যাচ্ছিল ও ঘটেছিল সেবিষয়ে খবর দিল। একই প্রকারে, এই অপদূতেরাও আগে আগে ছুটতে ও অন্যান্যদের ইঙ্গিত দিতে সিদ্ধান্ত নেয় তাদের শ্রোতাদের প্রবঞ্চিত করার লক্ষ্যে। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এমনটা হয় যে [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান সেই জল বা সেই যাত্রীদের বিষয়ে আলাদা কোন কিছু পরিকল্পনা করে (কেননা তেমনটা করা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানের অধিকারে রয়েছে), তাহলে অপদূতেরা মিথ্যা বলল, ও যারা তাদের কথা শুনল তারা প্রবঞ্চিত হল।'

৩৩। 'এইভাবেই গ্রীকদের দৈববাণীর উদ্ভব হয়েছিল ও তারা পুরাকালে অপদূতদের দ্বারা পথভ্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু এইভাবেও এসময় থেকে এই প্রবঞ্চনা শেষ পরিমাণ হল, কেননা সেই প্রভু এলেন যিনি অপদূতদের দুষ্কর্মের সঙ্গে খোদ অপদূতদেরও শূন্যতায় আনলেন। কেননা সেই অপদূতেরা নিজেদের প্রভাবে কিছুই জানে না, কিন্তু চোরের মত যা পরের কাছ থেকে পায় তা অন্যদের হাতে তুলে দেয় ও পূর্বঘোষকের চেয়ে তারা হলো আন্দাজ সংবাদদাতা মাত্র। তাই যখন তারা মাঝে মাঝে সত্য বলে, তখন কেউই

যেন তাতে বিস্মিত না হয়। এমনটাও হয় যে, রোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা ভিন্ন ভিন্ন লোকদের মধ্যে একই রোগ লক্ষ ক'রে তাদের কাছে যা ইতিমধ্যে জানা তা-ই ভিত্তি ক'রে আরোগ্যসম্ভাবনা প্রদান করে। আরও, জাহাজের কর্ণধার ও কৃষকেরাও অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা লক্ষ ক'রে আগে থেকে বলতে পারে আবহাওয়া ঝোড়ো বা পরিষ্কার হবে কিনা। তবে এক্ষেত্রে এমন কেউই নেই যে এমনটা সমর্থন করবে যে, তারা দিব্য অনুপ্রেরণার প্রভাবেই পূর্বঘোষণা করছে, বরং সবাই এতে একমত হবে যে, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা গুণেই খবর দিচ্ছে। তাই যখন অপদূতেরাও মাঝে মাঝে আন্দাজ ক'রে একই কথা বলে থাকে, তখন এভিত্তিতে কেউই যেন তাদের বিষয়ে বিস্মিত না হয় বা তাদের মনোযোগ না দেয়। কেননা যা ঘটতে যাচ্ছে, তা তাদের কাছ থেকে কিছু দিন আগে জানা, শ্রোতাদের কী লাভ? আর যদিও একজন সত্যিকারে তেমন কিছু জানতে পারত, তবে তেমন কিছু জানায় তত আনন্দের কারণ কী? এসব কিছু সদ্‌গুণ উৎপন্ন করে না, সচ্চরিত্র বিষয়েও তা আদৌ প্রমাণ নয়। আমরা যা জানি না, সেবিষয়ে আমরা কেউই বিচারিত হই না, যেইভাবে একজন সুখী বলে পরিগণিত নয় এই ভিত্তিতে যে, সে শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ। বরং এই প্রশ্নের ক্ষেত্রেই এক একজন বিচারাধীন হয়, তথা, সে বিশ্বাস রক্ষা করেছে কিনা ও আজ্ঞাগুলো সত্যিকারে পালন করেছে কিনা।'

৩৪। 'এজন্য এসমস্ত বিষয়ে আমাদের তত গুরুত্ব আরোপ করতে নেই; এবং ভাবী ঘটনাসমূহ আগে থেকে জানবার লক্ষ্যেই যে আমরা সাধনা করি ও শ্রম করি এমন নয়, বরং আমরা যেভাবে নিজেদের জীবন চালনা করি সেইভাবেই যেন ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে পারি, সেজন্যই তা করি। এবং ঘটনাসমূহ ঘটবার আগে সেগুলো বিষয়ে জ্ঞান পাবার প্রভাব লাভ করার লক্ষ্যেই যে আমরা প্রার্থনা করি, তাও নয়, ও আমাদের সাধনার মজুরি হিসাবেই যে আমরা সেই প্রভাব যাচনা করি, তাও নয়, বরং আমরা যাচনা করি যাতে দিয়াবলের উপর জয়লাভ ক্ষেত্রে প্রভু যেন আমাদের সহায়ক হন। কিন্তু যদি কোন সময় ভাবী ঘটনাসমূহ আগে থেকে জানাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়, তাহলে এসো, আমাদের মন যেন বিশুদ্ধ হয়। কেননা এ আমার বিশ্বাস যে, যখন এক প্রাণ সবদিক দিয়ে ও নিজের প্রকৃতিগত অবস্থায় বিশুদ্ধ থাকে, তখন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার

ফলে সেই প্রাণ অপদূতদের চেয়ে আরও বেশি ক'রে ও আরও বেশি দূরে দেখবার সক্ষম হয়ে ওঠে, কেননা প্রভু নিজেই তাকে সেবিষয়গুলো প্রকাশ করেন। এলিশেয়ের প্রাণ ঠিক সেইমত ছিল যখন গেহজি সংক্রান্ত ব্যাপার ও নিকটস্থ সেনাবাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপার দেখেছিল (ক)।'

৩৫। 'তাই যখন অপদূতেরা রাতে এসে তোমাদের কাছে ভাবী ঘটনার কথা বলতে ইচ্ছা করে, অথবা যখন তারা বলে, "আমরাই সেই দূত", তখন তাদের প্রতি মনোযোগ দিয়ো না, কেননা তারা মিথ্যা বলছে। এবং তারা তোমাদের সাধনার প্রশংসা করলে ও তোমাদের সুখী বললেও তাদের কথা শোনো না ও তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না, বরং নিজেদের ও তোমাদের ঘর [ক্রুশের চিহ্নে] চিহ্নিত করে প্রার্থনা কর, ও তখনই দেখতে পাবে, তারা মিলিয়ে গেছে। সত্য কথা আসলে এ যে, তারা কাপুরুষ, ও প্রভুর ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা একেবারে আতঙ্কিত, কেননা সেই ক্রুশেই প্রভু তাদের ক্ষমতা-বঞ্চিত করে সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা দেখিয়েছিলেন (ক)। কিন্তু তারা যদি তোমাদের ঘিরে নাচানাচি ক'রে ও নানা আত্মপ্রদর্শনী জাগিয়ে নির্লজ্জ ভাবে নিজেদের প্রচেষ্টায় জেদ দেখায়, তবে তাদের ভয় করো না, ভয়েও সঙ্কুচিত হয়ো না, তাদের মনোযোগও দিয়ো না একথা ভেবে যে হয় তো তারা সৎ দূত। কেননা প্রভু তেমনটা মঞ্জুর করলে, তবে ভাল ও মন্দ উপস্থিতিদ্বয় নির্ণয় করা সহজ। পবিত্রজনদের দর্শন এলোমেলোতায় বশীভূত নয়, কেননা *তিনি জোরে কথা বলবেন না, চিৎকারও করবেন না, আর কেউই তাঁর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাবে না* (খ), কিন্তু সেই দর্শন এমন শান্তশিষ্টতা ও শালীনতার সঙ্গে আসে যে, প্রাণে সাথে সাথেই আনন্দ, সুখ ও সৎসাহস প্রবেশ করে, কেননা যিনি আমাদের আনন্দ ও পিতা ঈশ্বরের পরাক্রম (গ), সেই প্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাতে প্রাণের চিন্তা শান্ত ও সুস্থির থাকে, যার ফলে উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিময় হয়ে উঠে সেই প্রাণ তার নিজের আলো দ্বারা তাঁদেরই দেখতে পায় যাঁরা আবির্ভূত হন। সেসময় প্রাণ দিব্য ও ভাবী বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আবিষ্ট হয় ও সেই প্রাণীদের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হতে বাসনা করে—যদি তাঁদের সঙ্গে বিদায় নিতে পারত। কিন্তু মানুষ হওয়ায় যদি কেউ না কেউ ভাল আত্মাদের দর্শনে ভয়ে অভিভূত হয়, যাঁরা আবির্ভূত হন তাঁরা ভালবাসার মাধ্যমে সেই ভয় সরিয়ে দেন, যেমন জাখারিয়ার বেলায়

গাব্রিয়েল করেছিলেন (ঘ), সেই স্ত্রীলোকদের বেলায় সেই দূত করেছিলেন যিনি পবিত্র সমাধিস্থানে দেখা দিয়েছিলেন (ঙ), ও সেই দূত করেছিলেন যিনি সুসমাচারে রাখালদের বলেছিলেন, *ভয় করো না* (চ)। সেই লোকদের ভয় কাপুরুষতা জনিত নয়, কিন্তু এমন ভয় যা উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের উপস্থিতি জনিত। তেমনটাই পবিত্রজনদের দর্শনদান।'

৩৬। 'অপরদিকে, অপদূতদের আক্রমণ ও দর্শন এলোমেলোতা, তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ, চেঁচামেচি ও চিৎকারে চিহ্নিত, অর্থাৎ সেই ধরনের বিরক্তিতে চিহ্নিত যা অভদ্র ছেলেমেয়েরা বা চোরেরা ঘটায়। এথেকে সাথে সাথে নেমে আসে প্রাণের আতঙ্ক, চিন্তা-ভাবনার গন্ডগোল ও এলোমেলোতা, নিরাশা, সাধকদের প্রতি বিরোধিতা ভাব, উদাসীনতা, মনের কষ্ট, আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতি ও মৃত্যু-ভয়; অবশেষে আসে অনিষ্টের আকাঙ্ক্ষা, সদ্‌গুণ অবজ্ঞা ও চরিত্রের অস্থিরতা। সুতরাং, কাউকে দেখে যদি তোমরা ভয় পাও, তাহলে যদি সেই ভয় সাথে সাথে মিলিয়ে যায় ও সেটার বদলে আসে অনির্বচনীয় আনন্দ, প্রফুল্লতা, স্বনির্ভরশীলতা, নবীকৃত শক্তি, চিন্তা-ভাবনার স্থিরতা ও সেই সমস্ত কিছু যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি তথা সৎসাহস ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, তাহলে সাহস ধর ও প্রার্থনা কর। কেননা প্রাণের আনন্দ ও স্থিরতা তাঁদেরই পবিত্রতা প্রমাণ করে যাঁরা তোমাদের সামনে রয়েছেন। সেই অনুসারে আব্রাহাম প্রভুকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন ও ঈশ্বরজননী মারীয়ার কণ্ঠে যোহন আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অন্যদের আগমনে যদি এলোমেলোতা, বাইরে থেকে আগত অদ্ভুত শব্দ, জাগতিক ধরনের দৃশ্য, মৃত্যুর হুমকি ও সেই অন্যান্য কিছু যা আমি উপরে উল্লেখ করেছি, তাহলে জেনে নাও, সেটা হলো অপদূতদের আক্রমণ।'

৩৭। 'তোমাদের জন্য এটাও লক্ষণ হোক: যখন প্রাণ ভয়ের মধ্যে অবস্থান করে, তখন এর অর্থ এ হলো যে, শত্রুরা উপস্থিত। কেননা অপদূতেরা দর্শন জনিত সেই ভয় সরিয়ে দেয় না যেভাবে সেই মহান দূত গাব্রিয়েল মারীয়া ও জাখারিয়ার বেলায় করেছিলেন ও সেই স্ত্রীলোকদের বেলায় করেছিলেন সেই দূত যিনি সমাধিস্থানে দেখা দিয়েছিলেন। বরং তারা যখন ভীরু মানুষকে দেখে, তখন নিজেদের দর্শন শত শত গুণে বৃদ্ধি করে যাতে করে সেই মানুষদের আরও বেশি করে আতঙ্কিত করতে পারে, এবং অবশেষে তাদের আক্রমণ ক'রে এই বলে তাদের বিদ্রূপ করে, *ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার*

সামনে প্রণিপাত কর (ক)। তারা ঠিক এইভাবে সেই গ্রীকদের প্রতারিত করল যারা তাদের উপর ঈশ্বর নাম আরোপ করল, নামটা এমন যা তাদের বেলায় মিথ্যা। কিন্তু প্রভু এমনটা চাননি আমরা দিয়াবলের দ্বারা প্রতারিত হব, ও দিয়াবল যেইখানে তেমন বিভ্রম ঘটাত না কেন, তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, *দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে ও কেবল তাঁরই সেবা করবে* (খ)। সেজন্য সেই প্রতারক আমাদের দ্বারা আরও বেশি করে অবজ্ঞাত হোক, কেননা প্রভু যা বলেছেন, তা তিনি আমাদের খাতিরেই করেছেন যাতে করে যখন অপদূতেরা আমাদের কাছ থেকে এধরনের উক্তি শোনে, তখন যেন সেই প্রভু দ্বারা তাড়িত হতে পারে যিনি সেই উক্তি দ্বারা তাদের ধমক দিয়েছিলেন।’

৩৮। ‘অপদূত বের করে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের বড়াই করা উচিত না, সম্পাদিত আরোগ্যদান ক্ষেত্রেও গর্বে স্ফীত হওয়া উচিত না; একটা অপদূতকে যে তাড়ায়, তার বিষয়ে বিস্মিত হতে নেই, ও যে বের করে দেয় না, তাকে অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। বরং একজন অন্য একজনের সাধনা ভাল মত শিখুক, সে সেই সাধনার অনুকরণ করুক, সেই সাধনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক বা সংশোধন করুক। কেননা চিহ্নকর্ম সম্পাদনা আমাদের অধিকারের বস্তু নয়, তা হলো ত্রাণকর্তারই কর্ম; এবং তিনি ঠিক তাই বলেছিলেন শিষ্যদের কাছে, *অপদূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে* (ক)। নামগুলো যে স্বর্গে লেখা আছে, তা আমাদের সদ্‌গুণ ও জীবনধারণ বিষয়ে সাক্ষ্য, কিন্তু অপদূতদের বের করে দেওয়ার যে ক্ষমতা, তা হলো সেই ত্রাণকর্তার দান যিনি তা মঞ্জুর করেছেন। তাই যারা সদ্‌গুণে নয়, কিন্তু চিহ্নকর্মে বড়াই করে বলেছিল, *প্রভু, আপনার নামে কি অপদূত তাড়াইনি? আপনার নামে কি বহু পরাক্রম-কর্ম সাধন করিনি?*(খ), তিনি উত্তরে তাদের বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি তোমাদের জানি না* (গ)। কেননা প্রভু ভক্তিহীনদের পথ জানেন না (ঘ)। আমি যেমন আগেও বলেছি, আত্মগুলো নির্ণয় করার অনুগ্রহদান পাবার জন্য একজনের পক্ষে অবশ্যই প্রার্থনা করা দরকার, যাতে যেভাবে লেখা রয়েছে সেই অনুসারে আমরা যেন *যে কোন আত্মাকেই বিশ্বাস না করি* (ঙ)।’

৩৯। ‘আমার ইচ্ছা ছিল, যা বলে এসেছি, তাতে তুষ্ট হয়ে আমি এবার নীরব থাকব ও আমার নিজের সংগ্রাম বিষয়ে কিছু বলব না। তথাপি, পাছে তোমরা এমনটা মনে কর যে, আমি এবিষয়ে সাধারণ ভাবে কথা বলছি, এবং যাতে তোমরা এতে নিশ্চিত হতে পার যে আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ও বাস্তবরূপেই এবিষয়ের বিবরণ দিচ্ছি, সেজন্য যদিও আমি নির্বোধ বলে গণ্য হই (যিনি আমার কথা শুনছেন, সেই প্রভু জানেন যে আমার বিবেক পরিষ্কার, এও জানেন যে, নিজের পক্ষে কথা বলছি না, বরং তোমাদের ভালবাসা ও অগ্রগতির খাতিরেই কথা বলছি), সেজন্য অপদূতদের যে ফন্দি-ফিকির নিজেই দেখেছি, সেবিষয়েই কথা বলছি (ক)। সেই অপদূতেরা কতবারই না আমাকে সুখী বলল, ও আমি প্রভুর নামে তাদের অভিশাপ দিলাম! কতবারই তারা [নীল] নদের জল বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিল ও আমি তাদের বললাম, এতে তোমাদের কি আসে-যায়? একদিন তারা এসে নিজেদের হুমকি দিয়ে যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত বাহিনীর মত আমাকে চারদিকে ঘিরে ফেলল। আর এক সময়, তারা আমার ঘর ঘোড়া, জন্তু ও সাপে পূর্ণ করল, ও আমি গাইলাম, *কেউ যুদ্ধরথে, আবার কেউ অশ্বে বড়াই করে, আমরা কিন্তু আমাদের ঈশ্বর প্রভুর নামেই বড়াই করব* (খ); এবং তেমন প্রার্থনায় তারা প্রভু দ্বারা বিতাড়িত হল। একদিন তারা আলোর বেশে অন্ধকারে এসে বলছিল, আন্তনি, আমরা তোমাকে আলো দিতে এসেছি। কিন্তু আমি চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করলাম ও সাথে সাথে সেই ভক্তিহীনদের আলো নিভিয়ে গেল। এবং কয়েক মাস পর তারা গায়কদের বেশে ও শাস্ত্রের নানা বচন আবৃত্তি করতে করতে এল, *কিন্তু বধিরের মত আমি শুনিনি* (গ)। একদিন তারা আমার মঠ কাঁপিয়ে তুলল, কিন্তু আমি আমার সঙ্কল্পে অবিচল থেকে প্রার্থনা করলাম। এবং এসমস্ত কিছুর পর তারা পুনরায় আমাকে দেখতে এসে তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ ধ্বনিত করল, শিস্ দিল ও চারদিকে লাফাতে লাগল। কিন্তু আমি প্রার্থনা করা মাত্র ও মনে মনে সামসঙ্গীত গাওয়া মাত্রই তারা সাথে সাথে কাঁদতে ও চিৎকার করতে লাগল কেমন যেন ভীষণভাবে দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে, এবং আমি সেই প্রভুর গৌরবকীর্তন করলাম যিনি এসেছিলেন ও তাদের দুঃসাহস ও পাগলামির শেষ দশা দেখিয়েছিলেন।’

৪০। 'একদিন খুবই উঁচুলম্বা একটা অপদূত এক দর্শনে দেখা দিয়ে "আমি ঈশ্বরের পরাক্রম" ও "আমি ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান; তুমি কী চাও আমি তোমাকে দেব?" এধরনের কথা বলার দুঃসাহস দেখাল। কিন্তু সেসময়ই আমি বিশেষভাবে ফুঁ দিয়ে ও খ্রিষ্টের নামে কথা বলে তাকে আঘাত করতে চেষ্টা করলাম। মনে করছিলাম আমি তাকে ঠিকই মেরেছি, ও সাথে সাথে, আমি খ্রিষ্টনাম উচ্চারণ করতে করতে তত বড় আত্মা তার সমস্ত অপদূতদের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। একদিন আমি উপবাস করছি এমন সময়ে সেই চালাক সন্ন্যাসীর বেশেও এল, সঙ্গে করে রুটি নিয়ে আসছিল, ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে বলল, খাও ও তোমার সমস্ত শ্রম বন্ধ কর; তুমিও তো মানুষ, ও দুর্বল হতে যাচ্ছ। কিন্তু তার মতলব উপলব্ধি করে আমি আমার প্রার্থনা বলার জন্য উঠে দাঁড়ালাম ও সে তেমনটা সহ্য করতে পারল না, কেননা সে পালিয়ে গেল ও তখন তার রূপ ছিল এমন ধোঁয়ার মত যা দরজার ভিতর দিয়ে যায়। আহা, কতবারই না সে মরুপ্রান্তরে আমাকে সোনার বিভ্রম দেখাল এই আশায় যে আমি সেটা স্পর্শ করি ও সেদিকে তাকাই। কিন্তু আমি তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সামসঙ্গীত গান করলাম ও সে মিলিয়ে গেল। সে বহুবার আমাকে কশা দিল, কিন্তু আমি বললাম, *খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কিছুই আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে না* (ক), তাতে তারা একে অন্যকেই কশা দিতে লাগল। কিন্তু আমিই যে তাদের রোধ করলাম ও তাদের কাজ বিনাশ করলাম এমন নয়, সেই প্রভুই তা-ই করলেন যিনি বলেন, *আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম* (খ)। কিন্তু, হে আমার সন্তানেরা, প্রেরিতদূতের কথা স্মরণ করেই আমি *এই সমস্ত কিছু আমার নিজের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি* (গ) যেন তোমরা সাধনায় হোঁচট না খেতে ও দিয়াবলকে ও তার অপদূতদের আবির্ভাবে ভয় না পেতে শিখতে পার।'

৪১। 'এবং যেহেতু এসমস্ত ঘটনা বিবরণ দেওয়ায় আমি নির্বোধ হলাম, সেজন্য তোমাদের নিজেদের রক্ষা ও অভয়ের জন্য এটাও গ্রহণ করে নাও; এবং আমাকে বিশ্বাস কর, কেননা আমি মিথ্যা বলছি না। একদিন কে যেন একজন আমার মঠের দরজায় ঘা দিল; আমি বাইরে গিয়ে এমন একজনকে দেখলাম যে অতিকায় ও উঁচুলম্বা ছিল। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? সে তখন বলল, আমি শয়তান। আমি বললাম, তুমি এখানে কী করছ? সে জিজ্ঞাসা করল, কেন সন্ন্যাসীরা ও অন্য সকল

খ্রিষ্টিয়ান আমাকে অকারণে দোষ আরোপ করে? কেন তারা প্রতিটি ঘণ্টায় আমাকে অভিশাপ দেয়? যখন আমি উত্তরে বললাম, তুমি কেন তাদের পিড়ন কর? সে উত্তরে বলল, আমি যে তাদের পিড়ন করি তা নয়, কিন্তু তারাই নিজেদের পিড়ন করে, কেননা আমি দুর্বল হয়েছি; তারা কি একথা পড়েনি যে, *শত্রুর খড়্গ একেবারে ব্যর্থ হল ও তুমি তাদের নগরগুলো বিলুপ্ত করেছ?*(ক)। আমার কোন স্থানও আর নেই, কোন খড়্গও আর নেই, কোন নগরও আর নেই। সর্বস্থানে খ্রিষ্টিয়ানেরাই রয়েছে, এবং মরুপ্রান্তরও সন্ন্যাসীতে ভরে গেছে; তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকুক ও অকারণে আমাকে দোষ দেওয়া বন্ধ করুক। তখন প্রভুর তেমন অনুগ্রহে বিস্মিত হয়ে আমি তাকে বললাম, যদিও তুমি সবসময় মিথ্যাবাদী ও কখনও সত্য বল না, তাসত্ত্বেও এইবার নিজে ইচ্ছা না করলেও সত্যিকথা বলেছ। কেননা খ্রিষ্ট নিজের আগমনে তোমাকে দুর্বলতায় পরিণত করলেন, ও তোমাকে ভূপাতিত করার পর তোমাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে গেলেন। ত্রাণকর্তার নাম শোনা মাত্র ও সেই নাম থেকে নির্গত জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সে অদৃশ্য হল।’

৪২। ‘সুতরাং, যখন দিয়াবল নিজে এমনটা স্বীকার করে যে, সে আর কিছুই করতে পারে না, তখন তার সঙ্গে ও তার অপদূতদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। এদিকে তার নিজের কুকুরদের সঙ্গে শত্রু সেই সমস্ত ফন্দি-ফিকিরের অধিকারী যা আমি বর্ণনা করেছি, কিন্তু তাদের দুর্বলতার কথা জানতে পেরে আমরা তাদের বিদ্রূপ করতে সক্ষম। সেজন্য এসো, আমরা এই ব্যাপারে যেন মনে নিরাশামগ্ন না হই, প্রাণে যত বিভীষিকা রয়েছে তার দিকেও যেন হা করে না তাকাই, নিজেদের জন্যও যেন অনর্থক ভয় কল্পনা না করি এধরনের কথা ব’লে ‘যখন অপদূতেরা আসে, তখন আমি আশা করি সে আমাকে উল্টিয়ে দেবে না, বা আমাকে ধরে মাটিতে ফেলে দেবে না, অথবা সে হঠাৎ করে আমার পাশে পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলবে না। না, তেমন চিন্তা-ভাবনায় বসে থাকা আমাদের আদৌ উচিত নয়, যারা মরতে বসেছে তাদের মত হাহাকার করাও উচিত নয়। বরং এসো, সাহস ধরে সবসময়ই উল্লাস করি, তাদেরই মত যারা বিমুক্ত হচ্ছে; এবং মনে মনে এমনটা ভাবি যে, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভু আছেন যিনি সেই অপদূতদের পালাতে বাধ্য

করলেন ও তাদের প্রভাব শূন্যতায় পরিণত করলেন। একইপ্রকারে এসো, আমরা যেন সবসময় এমনটা উপলব্ধি করি ও মনে রাখি যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে থাকতে শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। কেননা তারা যখন আসে, তখন তারা আমাদের যে অবস্থায় পায়, তাদের কর্ম ঠিক সেই অনুযায়ী, কেননা তারা আমাদের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ীই নিজেদের বিভ্রান্তি তৈরি করে। আমাদের ভীত ও নিরাশ পেলে তারা সাথে সাথে দস্যুর মত আমাদের আক্রমণ করে যেহেতু জায়গাটা অরক্ষিত অবস্থায় পেয়েছে। মনে মনে আমরা যা ভাবি, তা-ই, এমনকি তার চেয়ে আরও বেশি তারা করতে অভিপ্রায় করে। কেননা যখন তারা দেখে, আমরা ভীত ও আতঙ্কিত, তখন তাদের দর্শনগুলোতে ও হুমকিতে যা ভয়ঙ্কর, তারা তার বৃদ্ধি ঘটায় ও সেই কষ্টভোগী প্রাণ ঠিক সেই অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করে। তথাপি, তারা এমনটা দেখলে যে আমরা ভাবী বিষয়ের কথা ভেবে, প্রভুর সম্পর্কিত বিষয়ে চোখ নিবদ্ধ রেখে ও এবিষয়ে নিশ্চিত যে সবকিছু প্রভুর হাতে রয়েছে ও একটা অপদূত একজন খ্রিষ্টিয়ানের উপর কোন প্রভাব রাখে না ও কারও উপরেও কোন অধিকার রাখে না বিধায় আমরা প্রভুতে আনন্দিত, তারা যখন দেখে যে সেই প্রাণ তেমন চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত, তখন লজ্জিত হয়ে দূরে সরে যায়। ঠিক একারণেই শত্রু যোবকে এসব কিছুতে সুরক্ষিত অবস্থায় দে'খে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছিল, কিন্তু যুদাকে এসব কিছুতে অরক্ষিত অবস্থায় পেয়ে তাকে বন্দি করেছিল। তাই, যদি আমরা শত্রুকে অবজ্ঞা করতে চাই, তাহলে এসো, সেই সমস্ত বিষয়ে চোখ নিবদ্ধ রাখি যা প্রভু সংক্রান্ত, ও আমাদের প্রাণ সর্বদাই উল্লসিত হোক। তখন আমরা দেখতে পাব, অপদূতদের ফন্দি-ফিকির আসলে ধোঁয়ার মত, ও এমনটাও দেখতে পাব যে, তারা যুদ্ধ করছে না বরং পালাচ্ছে। কেননা, আমি যেমন আগেও বলেছি, তারা একেবারে কাপুরুষ, ও সবসময় সেই আগুনের অপেক্ষায় রয়েছে যা তাদের জন্য গচ্ছিত।'

৪৩। 'সেই অপদূতদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভয় ক্ষেত্রে তোমাদের নিজেদের জন্য নিশ্চিত এই চিহ্নও রয়েছে। যখনই কোন দর্শন হয়, তখনই ভয়ে ভূপাতিত হয়ো না, কিন্তু সেটা যাই হোক না কেন তোমরা সর্বপ্রথমে সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কে, ও কোথা থেকে আসছ?" এবং তেমনটা পবিত্রজনদের একটা দর্শন হলে তাঁরা

তোমাদের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেবেন ও তোমাদের ভয় আনন্দে পরিণত করবেন। কিন্তু তেমনটা দিয়াবলেরই দর্শন হলে তবে দর্শনটা সাথে সাথে দুর্বল হয় যেহেতু তোমাদের মনের দৃঢ়তা দেখে। কেননা "তুমি কে, ও কোথা থেকে আসছ" শুধু এটুকুও জিজ্ঞাসা করলে তোমরা নিজেদের স্থিরতার প্রমাণ দাও। এভাবে প্রশ্ন রাখলেই নূনের সন্তান শিখলেন (ক); ও দানিয়েল প্রশ্ন রাখলে শত্রু তাঁকে এড়াতে পারল না (খ)।'

৪৪। আন্তনি এসমস্ত বিষয়ে কথা বলতে বলতে সবাই আনন্দিত ছিল: কারও কারও অন্তরে সদ্‌গুণের ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্য কারও উদাসীনতা দূর করা হচ্ছিল, আবার অন্য কারও অহঙ্কার নিঃশেষিত হচ্ছিল; এবং আত্মা-নির্ণয়ের জন্য প্রভু দ্বারা আন্তনিকে যে অনুগ্রহ দান করা হয়েছিল, সেবিষয়ে বিস্মিত হয়ে সবাই সেই ধূর্তজনের আক্রমণ ঘৃণা করা ক্ষেত্রে দৃঢ়মনা হচ্ছিল। তাই পর্বতে পর্বতে তাদের মঠগুলো ছিল দিব্য সেনাদলে পূর্ণ শিবিরের মত: লোকে সামসঙ্গীত গান করছিল, অধ্যয়ন করছিল, উপবাস করছিল, প্রার্থনা করছিল, ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশায় আনন্দ করছিল, অর্থদান বিতরণে ব্যস্ত ছিল ও নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও সঙ্গতিময় সম্পর্ক রক্ষা করছিল। ব্যাপারটা এমনটা ছিল, কেমন যেন একজন এমন দেশ দেখতে পাচ্ছিল যা সত্যিই স্বতন্ত্র, এমন দেশ যা ভক্তি ও ধর্মময়তারই দেশ। কেননা সেখানে অপকর্মাও ছিল না, ক্ষতিগ্রস্তও ছিল না, কোন কর-আদায়কারী বিষয়েও অভিযোগ ছিল না (ক)। আরও, সেখানে সাধকদের অগণন ভিড় ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে সবাই ছিল একমন, এমন একমন যা সদ্‌গুণে স্থিত, যার ফলে যে কেউ পুনরায় সেই মঠগুলো দেখত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে তেমন সুবিন্যস্ততাও দেখত, তখন সে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের কণ্ঠ উত্তোলন করে বলত, *যাকোব, তোমার তাঁবুগুলো, ইস্রায়েল, তোমার তাঁবুগুলো কেমন মনোরম। সেগুলো প্রসারিত উপত্যকার মত, নদীর কূলে উদ্যানের মত, প্রভুর রোপিত তাঁবুর মত, জলাশয়ের ধারে এরসগাছের মত* (খ)।

৪৫। তখন আন্তনি নিজের অভ্যাসমত নিজ থেকে নিজের মঠের অভ্যন্তরে প্রত্যাহার ক'রে নিজের সাধনা বৃদ্ধি করলেন ও স্বর্গীয় সেই আবাসগুলোর কথা ভেবে সেগুলোর জন্য ব্যাকুল হয়ে ও মানবজীবন যে কেমন ক্ষণস্থায়ী তা লক্ষ ক'রে দিনে দিনে নিশ্বাস

ফেলতেন। কেননা যখন তিনি খেতে বা ঘুমাতে ও দৈহিক অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে উদ্যত ছিলেন, তখন প্রাণের আত্মিক অংশের কথা ভেবে লজ্জাবোধ করবেন। যখন তিনি অন্য বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে উদ্যত ছিলেন, তখন আত্মিক খাদ্যের কথা স্মরণ ক'রে প্রায়ই ক্ষমা চেয়ে তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে যেতেন, একথা ভেবে যে, অন্যেরা তাঁকে খেতে দেখলে তিনি লজ্জায় লাল হয়ে যাবেন। তিনি একাকী হয়ে খেতেন, অবশ্যই তাঁর দেহের প্রয়োজনীয়তা অনুসারেই খেতেন; কিন্তু বারে বারে ভ্রাতাদের সঙ্গেও খেতেন, তেমনটা তিনি তাদের প্রতি সম্মানের খাতিরেই করতেন ও তাদের সহায়তায় কথা বলায় উত্তরোত্তর সৎসাহসী হতেন। তিনি প্রায়ই একথা বলতেন যে, আমাদের পক্ষে দেহের চেয়ে আত্মারই জন্য বেশি সময় দেওয়ায় শোভা পায়। তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন যেন আমরা দেহের জন্য কম সময় দিই, ও শুধু প্রয়োজনের জোরেই যেন তেমনটা করি, কিন্তু অধিকাংশ সময় যেন আত্মা ক্ষেত্রে ও আত্মার জন্য যা উপকারী তা-ই যেন অন্বেষণ করায় ব্যস্ত থাকি, যাতে করে আত্মা দৈহিক তৃপ্তি দ্বারা নিচের দিকে আকর্ষিত না হয়ে বরং দেহই আত্মার বশীভূত হয়; কেননা ঠিক তা-ই ছিল যা ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *কী খাব বলে প্রাণের বিষয়ে, কিংবা কী পরব বলে শরীরের বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না; … তাই তোমরা কী খাবে বা কী পান করবে, এই বিষয়ের তত অন্বেষা করো না, ব্যস্তও হয়ো না, কেননা এই সংসারের বিজাতীয়রাই এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত থাকে; বাস্তবিকই তোমাদের পিতা জানেন যে, তোমাদের এ সবকিছুর প্রয়োজন আছে। তোমরা বরং তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে* (ক)।

নির্যাতিত খ্রিষ্টিয়ানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ

৪৬। এসমস্ত কিছুর পর, [রোম সম্রাট] মাক্সিমিনুসের আমলে ঘটিত নির্যাতন মণ্ডলীকে অত্যাচার করল (ক); এবং যখন পবিত্র সাক্ষ্যদাতারা আলেক্সান্দ্রিয়ায় চালিত হলেন, তখন তিনিও নিজের মঠ ছেড়ে তাঁদের পিছনে পিছনে চললেন, তিনি বললেন, 'এসো, আমরাও যাই, যেন সেই সংগ্রামে যোগ দিতে পারি অথবা যারা সেই সংগ্রামে রয়েছে যেন তাদের দেখাশুনা করতে পারি।' তিনি সাক্ষ্যমরণ আকাঙ্ক্ষা করতেন, কিন্তু যেহেতু

নিজেকে তুলে দিতে ইচ্ছা করতেন না (খ), সেজন্য তিনি খনিতে ও কারাগারে সাক্ষ্যদাতাদের সেবা করতেন। আদালতে তিনি এমন মহৎ উৎসাহ দেখালেন যে, যাঁরা প্রতিযোগী হতে আহূত হচ্ছিলেন তাঁদের তিনি উদ্দীপিত করতেন ও যাঁরা সাক্ষ্যমরণ বরণ করছিলেন, তাঁরা *সিদ্ধতায় উন্নীত* না হওয়া পর্যন্ত (গ) তিনি তাঁদের গ্রহণ করে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। যখন বিচারপতি আন্তনির সাহস ও যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাদেরও সাহস দেখলেন, তখন এমন হুকুম জারি করলেন যা অনুসারে সন্ন্যাসীরা আদালতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি শহরেও তারা থাকতে পারবে না। সবাই এমনটা যুক্তিসঙ্গত মনে করল, সেদিন নিজেদের লুকোবে, কিন্তু আন্তনি হুকুমে এতই কম গুরুত্ব দিলেন যে নিজে নিজের কাপড় ধুয়ে পরদিন সবার সামনে উচ্চ এক স্থানে দাঁড়ালেন ও শহরপতি তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। সবাই এতে বিস্মিত হতে হতে যখন শহরপতি নিজের প্রহরীদলের সঙ্গে সেদিকে যেতে যেতে তাঁর দিকে তাকালেন, তখন আন্তনি সেখানে স্থির হয়ে থাকলেন; তাতে তিনি সেই সঙ্কল্পপূর্ণ প্রস্তুতি দেখালেন যা খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের বিশেষ চিহ্ন। কেননা, যেমন আগেও বলেছি, তিনি যাতে সাক্ষ্যমর হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেন। তাই তাঁকে এমন একজন মনে হচ্ছিল যে এখনও সাক্ষ্যমর হয়নি বলে মনে কষ্ট পাচ্ছিল; কিন্তু প্রভু আমাদের ও অন্যান্যদের উপকারের জন্য তাঁকে রক্ষা করছিলেন, যাতে তিনি সেই কৃচ্ছ্র সাধনায় অনেকের গুরু হতে পারেন যা তিনি শাস্ত্র থেকে শিখেছিলেন। কেননা কেবল তাঁর আচরণ লক্ষ করলেই অনেকে তাঁর জীবনধারণেন অনুকারী হতে বাসনা করত। তাই তিনি পুনরায় সেই সাক্ষ্যদাতাদের তাঁর নিয়মমত সেবা করে চললেন ও সেই সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে বাঁধা এমন একজনের মত তাদের সেবা করায় তাদের সঙ্গে একই কষ্ট ভোগ করতেন।

মরুপ্রান্তরে প্রত্যাহার

৪৭। অবশেষে যখন নির্যাতনকাল শেষ হল ও ধন্য বিশপ পিতর (ক) নিজের সাক্ষ্যমরণ বহন করলেন, তখন আন্তনি রওনা হলেন ও পুনরায় মঠে প্রত্যাহার করলেন, ও সেখানে প্রতিদিন তাঁর নিজের বিবেক দ্বারা সাক্ষ্যমরণ বহন করতেন ও বিশ্বাস-লড়াইতে

সংগ্রামরত থাকতেন। তিনি আগের চেয়ে মহত্তর ও আরও কঠোর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন, কেননা তিনি সর্বদাই অনাহারে থাকতেন, ও তাঁর কাপড়ের ভিতরকার অংশে লোম ছিল ও বাইরেকার অংশে চামড়া; এ কাপড় এমন যা তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খাতিরেও তিনি দেহকে কখনও জল দিয়ে ধৌত করতেন না, পাও কখনও আধৌ ধৌত করতেন না, এবং একেবারে প্রয়োজন না হলে তিনি পা জলে রাখতেও সম্মত ছিলেন না। কেউই কখনও তাঁকে বস্ত্রহীন অবস্থায দেখেনি, এমনকি, যখন তিনি মারা গেলেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হল, সেদিন পর্যন্ত কেউই তাঁর দেহ উলঙ্গ অবস্থায় দেখেনি।

৪৮। এদিকে, যখন তিনি প্রত্যাহার করলেন ও সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এমন সময় কাটাবেন যখন নিজেও বাইরে যাবেন না, কাউকেও গ্রহণ করবেন না, তখন মার্তিনিয়ানুস নামক একজন সেনা-কর্মকর্তা এসে আন্তনিকে বিরক্ত করল। তার একটা মেয়ে ছিল যে অপদূতগ্রস্তা। তাই সেই কর্মকর্তা যথেষ্ট সময় সেখানে থেকে দরজায় ঘা দিচ্ছিল ও তাঁকে বাইরে আসতে ও মেয়েটির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করছিল। তিনি দরজা খুলতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু দরজার উপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কেন আমার কাছে, একটা মানুষেরই কাছে চিৎকার করছ? আমিও তোমার মত একটা মানুষ মাত্র, কিন্তু আমি যাঁর সেবা করি, তুমি সেই খ্রিষ্টে বিশ্বাস রাখলে তবে যাও, ও তুমি যেইভাবে বিশ্বাস কর, সেইভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর, তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' লোকটা সাথে সাথে রওনা হল, সে খ্রিষ্টে বিশ্বাস রেখে তাঁকে ডাকছিল ও তার মেয়ে সেই অপদূত থেকে শুচীকৃতা হল। আন্তনির মধ্য দিয়ে আরও বহু কিছু সেই প্রভু দ্বারা সাধন করা হল যিনি বলেন, *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে* (ক)। কেননা তিনি দরজা না খুললেও অনেক অনেক কষ্টভোগী এমনি তাঁর মঠের বাইরে রাত কাটাত, ও তারা বিশ্বাস করলে ও সরলভাবে প্রার্থনা করলে শুচীকৃত হত।

অভ্যন্তরীণ পর্বতে প্রত্যাহার

৪৯। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, অতিরিক্ত মানুষ তাঁকে আবিষ্ট করছিল ও তিনি তাঁর সঙ্কল্প ও ইচ্ছামত প্রত্যাহার করতে আর পারতেন না, তখন তাঁর মধ্য দিয়ে প্রভু যা সাধন করছিলেন সেবিষয়ে সঙ্কাকুল হয়ে যে, তিনি গর্বস্ফীত হবেন ও কেউ না কেউ তাঁর বিষয়ে উচিতের চেয়ে উচ্চতর ধারণা ধারণ করতে পারবে, সেজন্য তিনি যত্ন সহকারে বিচার-বিবেচনা করে রওনা হয়ে থেবাইসের উচ্চ অঞ্চলে প্রস্থান করলেন, এমন লোকদেরই দিকে যারা তাঁকে চিনত না (ক)। এবং ভ্রাতাদের কাছ থেকে রুটি পেয়ে তিনি নদীর কূলে বসতেন, লক্ষ করতেন কোন না কোন নৌকা সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল কিনা, যাতে সেই নৌকায় উঠে তিনি তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারতেন। তিনি তেমন কিছুর জন্য নজর রাখছিলেন, এমন সময় কার্ যেন কণ্ঠ ঊর্ধ্ব থেকে তাঁর কাছে এসে বলল, ‘আন্তনি, তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ? এবং কেনই বা চলে যাচ্ছ?’ তাতে তিনি বিরক্তি বোধ করলেন না, কিন্তু লোকেরা যে প্রায়ই সেইভাবে তাঁকে ডাকবে যেহেতু তাতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্য তা শুনবার পর তিনি এ বলে উত্তর দিলেন, ‘যেহেতু লোকদের ভিড় আমাকে একা থাকতে দিচ্ছে না, সেজন্য আমি থেবাইসের উচ্চ অঞ্চলে এই কারণে যেতে চাই যে, যারা আমাকে আবিষ্ট করে তারা আমাকে যথেষ্টই বিরক্ত করে, এবং বিশেষভাবে এই কারণেই যেতে চাই যে, তারা আমার কাছে যা যাচনা করে, তা আমার শক্তির ঊর্ধ্বে।’ কিন্তু কণ্ঠটা তাঁকে বলল, ‘যদিও তুমি উচ্চ থেবাইসে চলে যাও, ও তোমার বিবেচনা মত যদিও তুমি চারণভূমিতে (খ) নেমে যাও, তবে সহ্য করার মত তোমার দ্বিগুণ এমনকি তিনগুণ বেশি কষ্ট থাকবে। তুমি যদি সত্যিকারে একাকি হয়ে থাকতে ইচ্ছা কর, তাহলে এক্ষুণি অভ্যন্তরীণ পর্বতে যাও’ (গ)। আন্তনি বললেন, ‘কে আমাকে পথ দেখাবে? সেবিষয়ে আমার তো কোন জানা নেই।’ এবং সাথে সাথে তাঁর চোখে এমন সারাকেনীয়দের দেখা দিল যারা সেই পথ ধরে যাত্রা করতে উদ্যত ছিল। তাদের দিকে যেতে যেতে ও তাদের কাছাকাছি এসে আন্তনি তাদের সঙ্গে মরুপ্রান্তরে যাত্রা করার জন্য তাদের অনুমতি চাইলেন। এবং কেমন যেন [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞানের আদেশক্রমে তারা আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করে নিল। তিন দিন তিন রাত তাদের সঙ্গে পথ চলার পর তিনি খুবই উচ্চ একটা পর্বতে গিয়ে পৌঁছলেন। পর্বতের নিচে জল

ছিল, একেবারে পরিষ্কার, মিষ্ট ও যথেষ্ট ঠাণ্ডা জল, এবং পর্বতের ওপারে সমতল ভূমি ও অযত্নে ফেলানো কয়েকটা খেজুরগাছ ছিল।

৫০। তখন আন্তনি কেমন যেন ঈশ্বর দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে সেই স্থান ভালবেসে ফেললেন, কেননা স্থানটা ঠিক সেটাই ছিল যা সেই কণ্ঠ নদীর কূলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ে নির্দেশ করেছিল। পরে, তাঁর সেই যাত্রাসঙ্গীদের কাছ থেকে রুটি গ্রহণ করে নিয়ে তিনি একাকি হয়ে সেই পর্বতের অভ্যন্তরে রইলেন, তাঁর সঙ্গে বাস করার মত কেউই ছিল না। নিজস্ব বাড়ি বলে পর্বতকে গণ্য করে তিনি সেদিন থেকে সেইখানে থাকলেন। সেই সারাকেনীয়রাও আন্তনির আগ্রহ উপলব্ধি করে সিদ্ধান্ত করল, তারা সেদিকে যাত্রা করবে ও খুশি মনে তাঁর জন্য রুটি ব্যবস্থা করবে; অন্যদিকে তিনি খেজুরগাছ থেকেও কিছুটা আরাম পেতেন। কালক্রমে ভ্রাতাগণ সেই স্থান বিষয়ে অবগত হলেই তাঁর কাছে দরকারী কিছু পাঠাতে আগ্রহী হল, তারা তো ছেলেদের মত পিতাকে স্মরণ করছিল। কিন্তু আন্তনি এমনটা দেখে যে, সেখানে বেশ কয়েকজনের জন্য সেই রুটি ছিল সমস্যা ও কষ্টের কারণ, তখন এব্যাপারে সন্ন্যাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মনে মনে বিবেচনা ক'রে, যারা তাঁর কাছে আসত, তাদের বললেন যেন একটা কোদাল, একটা কুড়াল ও কিছুটা গম নিয়ে আসে। সেসব কিছু পেয়ে তিনি পর্বতের চারদিকের ভূমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, ও সুবিধাজনক এক স্থান পেয়ে তাতে লাঙল চালালেন, এবং জলের উৎস থেকে তাঁর প্রচুর জল থাকায় তিনি বীজ বুনলেন। এবং প্রতি বছর তেমনটা করে তিনি সেসময় থেকে রুটি পেলেন; এতে তিনি আনন্দিত ছিলেন কেননা এক্ষেত্রে তাঁকে আর কাউকে বিরক্ত করতে হবে না; এতেও আনন্দিত হলেন যে, তাঁকেও সবকিছুর জন্য পরের বোঝা আর হতে হবে না। কিন্তু তারপর তিনি যখন দেখলেন, কেউ না কেউ আসছিল, তখন তিনি কিছু শাকসবজিও পুঁতলেন যাতে যে কেউ তাঁকে দেখতে আসত, তারা কষ্টকর যাত্রার কঠোরতার পরে কিছুটা আরাম পেতে পারে। তথাপি, শুরুতে, যখন মরুভূমি থেকে বন্যজন্তু জলের জন্য আসত, তখন প্রায়ই তাঁর ফসল ও তাঁর বোনা শাকসবজি নষ্ট করত। কিন্তু সেগুলোর একটাকে কোমলভাবে ধরে সবগুলোকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি যখন তোমাদের ক্ষতি করিনি, তখন তোমরা আমার ক্ষতি করছ কেন?

চলে যাও, ও প্রভুর নামে এখানে আর এসো না।’ সেসময় থেকে সেই জন্তুগুলো কেমন যেন সেই আদেশের ভয়তে সেই স্থানের কাছে আর এল না।

৫১। তাই তিনি প্রার্থনা ও সাধনায় নিয়োজিত থেকে সেই অভ্যন্তরীণ পর্বতে একাকি থেকে গেলেন। এবং যে ভ্রাতারা তাঁর সেবা করছিল, তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, যখন তারা প্রতি মাসে আসবে, তখন জলপাই, ডাল ও তেল নিয়ে আসতে পারবে কিনা, কেননা সেসময়ে তিনি বৃদ্ধই ছিলেন। তাছাড়া, যারা তাঁকে দেখতে যেত, তাদের কাছ থেকে আমরা জানি, সেখানে থাকাকালে তাঁকে *রক্তমাংসের বিরুদ্ধে নয়* (ক), ধ্বংসনকারী অপদূতদেরই বিরুদ্ধেই কতই না লড়াই বহন করতে হল। কেননা সেখানে লোকে তীব্রতম অদ্ভুত শব্দ, বহু বহু কণ্ঠস্বর ও অস্ত্রশস্ত্রের আওয়াজের মত ভয়ানক শব্দ শুনছিল; এবং রাতে পর্বতকে বন্যপশুতে ভরা দেখছিল। কিন্তু তিনি যে দৃশ্যগত বস্তুর বিরুদ্ধেই যেন লড়াই করছিলেন ও প্রার্থনা করছিলেন, তারা তাও দেখছিল; এবং যারা তাঁকে দেখতে যেত, তিনি তাদের উৎসাহিত করতেন ও একই সময়ে নতজানু হয়ে ও প্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে করতে সংগ্রাম করছিলেন। এ সত্যিকারে আশ্চর্যের বিষয় যে, তেমন মরুপ্রান্তরে একাকি হয়েও তিনি আক্রমণকারী অপদূতদের ব্যাপারে ভীত ছিলেন না, তখনও তাদের হিংস্রতায়ও আতঙ্কিত ছিলেন না যখন তত চতুষ্পদ জন্তু ও সরিসৃপ সেখানে ছিল। কিন্তু তিনি সত্যিই এমন একজন ছিলেন যিনি নিজের মন অবিচল ও স্থিতমূল রেখে শাস্ত্রের বাণী অনুসারে “প্রভুতে ভরসা রেখেছিলেন” বিধায় ছিলেন *সিয়ন পর্বতের মত* (খ); বরং অপদূতেরাই পালাত ও বন্যপশু, যেইভাবে লেখা আছে, তাঁর সঙ্গে শান্তি ভোগ করত (গ)।

৫২। সেজন্য দিয়াবল, যেইভাবে দাউদ গান করেন, সেই অনুসারে আন্তনির উপরে নজর রাখত ও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘষত (ক), কিন্তু আন্তনি তার ফন্দি-ফিকির ও নানাবিধ মতলবে অপ্রভাবিত হয়ে ত্রাণকর্তা থেকে সান্ত্বনা পেতেন। তিনি নিদ্রাহিত অবস্থায় শুয়ে থাকতে থাকতে দিয়াবল রাতে তাঁর কাছে নানা পশু পাঠাত; এবং প্রায়ই যত হায়না মরুপ্রান্তরে ছিল, সেগুলোও আস্তানা থেকে বেরিয়ে তাঁকে চারদিকে ঘিরে ফেলত, ও তিনি সেগুলোর মধ্যে আটকানো থাকতেন। কিন্তু সেগুলো এক একটা মুখ

খুললে ও কামড়াতে হুমকি দিলেই তিনি শত্রুর চালাকি বুঝে সেগুলোকে বলতেন, ‘আমার উপর তোমাদের সত্যিই অধিকার থাকলে, তবে আমি তোমাদের দ্বারা গ্রাস হতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমরা অপদূত দ্বারা পাঠানো হলে তবে পিছটান দেওয়ার জন্য আর দেরি করো না, কেননা আমি খ্রিষ্টের দাস।’ আন্তনি একথা বললেই সেগুলো তাঁর কথা দ্বারা একটা চাবুক দ্বারাই যেন তাড়িত হয়ে পালিয়ে যেত।

৫৩। কিছু দিন পর তিনি কাজ করছেন (কেননা শ্রমেও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন) এমন সময় তিনি বেণীতে ব্যস্ত থাকতেই কে যেন একজন দরজায় দাঁড়িয়ে সেই বেণী টানল, কেননা তিনি ঝুড়ি বানাতেন, ও যারা মাল আনত, তাদের সেই মালের বদলে সেই ঝুড়ি দিতেন। তখন উঠে তিনি এমন পশু দেখতে পেলেন যা উরু পর্যন্ত মানুষের মত দেখতে ছিল ও যার পা ও পায়ের পাতা ছিল গাধার পা ও পায়ের পাতার মত। কিন্তু আন্তনি এমনি ক্রুশের চিহ্ন করে বললেন, ‘আমি প্রভুর দাস। কেউ যদি তোমাকে আমার বিরুদ্ধে পাঠিয়ে থাকে, তবে এই দেখ, আমি এখানে আছি।’ কিন্তু সেই পশু নিজের অপদূতদের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল যে সেটা পড়ে মারা গেল। এবং সেই পশুর মৃত্যু হলো অপদূতদের পতন, কেননা তারা মরুভূমি থেকে তাঁকে দূরে তাড়াবার জন্য সবকিছুই করতে আগ্রহী ছিল ও তেমনটা করতে অক্ষম ছিল।

৫৪। একদিন সন্ন্যাসীরা তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি কিছুদিনের মত তাদের কাছে গিয়ে তাদের ও তাদের বাসস্থান দেখাশোনা করেন। যারা তাঁর কাছে এসেছিল, তিনি তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন, ও একটা উট তাদের রুটি ও জল বহন করছিল, কেননা সেই সমস্ত মরুপ্রান্তর জলহীন, ও কোথাও জল নেই; যে পর্বতে তাঁর মঠ অবস্থিত ছিল, কেবল সেই পর্বতে জল ছিল, এবং তারা সেইখানে জল তুলে আনত। তখন এমনটা হলো যে, গরম অসহ্য হওয়ায় ও পথে চলতে চলতে জল ফুরিয়ে গেলে তারা বিপন্ন অবস্থায় পড়ল। নানা জায়গায় গিয়ে কিন্তু কোথাও জল না পেয়ে তারা আর এগোতে পারছিল না, বরং নিজেদের জীবন বিষয়ে হতাশ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও উটকে ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই বৃদ্ধজন যখন দেখলেন, তারা প্রত্যেকে বিপদের সম্মুখীন রয়েছে, তখন মনে কষ্ট পেয়ে ও গভীর নিশ্বাস ফেলে তাদের কাছ থেকে একটু দূরে গেলেন, ও

হাঁটু পাত করে ও হাত প্রসারিত করে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এবং তিনি যেখানে প্রার্থনা করছিলেন, প্রভু সাথে সাথে সেস্থান থেকে জল উৎসারিত করলেন। তারা প্রত্যেকে পেট ভরে জল খাওয়ার পর সবাই সঞ্জীবিত হল। নিজেদের চামড়ার ভিস্তি পূরণ করার পর পরেই তারা সেই উটের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল ও তাকে পেল, কেননা এমনটা হয়েছিল যে, দড়িটা কোন একটা পাথরে বেঁধে গেছিল বলে জোরেই আটকানো ছিল। উটকে ফিরিয়ে এনে ও তাকে জল খাওয়ানোর পর তারা চামড়ার ভিস্তি উটের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে নিরাপদে যাত্রা সমাপন করল। তিনি পর্বতের বাইরেকার মঠগুলোতে গিয়ে পৌঁছলে, যারা তাঁকে দেখতে পেল তারা প্রত্যেকে তাঁকে পিতাই যেন আলিঙ্গন করল। এবং তিনিও, কেমন যেন পর্বত থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় আনছেন ঠিক সেইভাবেই উপদেশ দানে তাদের আপ্যায়ন করলেন ও নিজের সহায়তা মঞ্জুর করলেন। পর্বতে পর্বতে পুনরায় আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল, অগ্রগতির আগ্রহ উদ্দীপিত হল, ও সেইসঙ্গে তাদের একক বিশ্বাসের ফলে পারস্পরিক উৎসাহদান বিরাজ করল। এবং সন্ন্যাসীদের উদ্দীপনা দে'খে ও তাও দে'খে যে, তাঁর বোন বড় হয়েছিলেন ও চিরকুমারিত্ব পালন করছিলেন এবং অন্য চিরকুমারীদের পরিচালনা করছিলেন, তখন তিনিও আনন্দিত হলেন।

৫৫। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় নিজের পর্বতে ফিরে গেলেন, এবং সেসময় থেকে অনেকে তাঁকে দেখা করতে গেল, ও অন্যান্যরা যারা কষ্টে ভুগছিল, তারা তাঁর কাছে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহস পাচ্ছিল। তাই যে সমস্ত সন্ন্যাসী তাঁর কাছে যেত, তিনি অবিরতই তাদের এই আদেশ দিতেন, 'প্রভুতে বিশ্বাস রাখ ও তাঁকে ভালবাস; অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা ও মাংসের আত্মতৃপ্তি বিষয়ে সতর্ক থেক, এবং প্রবচন পুস্তকে যেমন লেখা রয়েছে, *পেট ভরে খাওয়া দ্বারা প্রবঞ্চিত* (ক) হয়ো না, অসারতা থেকে দূরে পালাও, অবিরত প্রার্থনা কর, ঘুমাবার আগে ও পরে পবিত্র সঙ্গীত গান কর, শাস্ত্রের আদেশমালা হৃদয়ে গেঁথে রাখ, পবিত্রজনদের কর্মকীর্তি মনে রাখ যাতে প্রাণ আজ্ঞাবলি সবসময় স্মরণে রেখে সেই পবিত্রজনদের উদ্দীপনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।' কিন্তু তিনি বিশেষভাবে প্রেরিতদূতের এই বাণী অবিরত পালন করতে উপদেশ দিতেন, *তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে*

যেন সূর্যাস্ত না হয় (খ), ও তারা যেন এমনটা বিবেচনা করে যে, সেই কথা প্রতিটি আজ্ঞা মনে রেখেই বলা হয়েছিল, যার ফলে আমরা ক্রুদ্ধ থাকতে ও যে কোন পাপে লিপ্ত থাকতেও যেন সূর্যাস্ত না হয়। তিনি বলে চলেছিলেন, 'কেননা এটাই মঙ্গলকর, এমনকি জরুরীই যে, সূর্য যেন দিনের কোন অনিষ্ট বিষয়ে আমাদের নিন্দা না করে; আর সূর্য শুধু নয়, চন্দ্রও যেন রাতের কোন পাপ এমনকি কোন পাপময় প্রবণতা বিষয়েই আমাদের নিন্দা না করে। তেমনটা যাতে আমাদের অন্তরে সুরক্ষিত থাকে, সেজন্য প্রেরিতদূতের বাণী শোনা ও তাতে বাধ্য হওয়া উত্তম, কেননা তিনি বলেন, *নিজেদের পরীক্ষা কর ও নিজেদের যাচাই কর* (গ)। তাই এক একজন যেন প্রতিদিন দিন ও রাতে নিজের সাধিত কর্ম পুনঃপুনঃ গণনা করে; ও সে যদি পাপ করে থাকে, তাহলে সে তেমন পাপ করা বন্ধ করুক; কিন্তু পাপ করে না থাকলে তবে সে বড়াই না করুক, বরং সে যা মঙ্গলকর তাতে নিষ্ঠাবান থাকুক, তাতে যেন অবহেলা না করে, প্রতিবেশীকেও যেন নিন্দা না করে, ও নিজেকে ধার্মিক বলেও ঘোষিত না করে যতক্ষণ না, যেইভাবে ধন্য প্রেরিতদূত পল বললেন, *সেই প্রভু আসেন" যিনি "অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছু* (ঘ) অনুসন্ধান করেন। কেননা আমরা যা সম্পাদন করি, সেবিষয়ে প্রায়ই সচেতন নই, কিন্তু যদিও আমরা সেবিষয় না জানি, তবু প্রভু সবকিছু দেখেন। তাই তাঁর উপর বিচার সঁপে দিয়ে, এসো, একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যবহার করি, ও একে অন্যের বোঝা বহন করি (ঙ)। তথাপি, এসো, নিজেদের পরীক্ষা করি, ও যা কিছুতে আমরা অভাবী, তা পূরণ করতে ত্বরা করি। এবং আমার একথা সতর্ক-বাণী হিসাবে কার্যকর হোক যাতে আমরা পাপ না করি। এসো, আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমস্ত কর্ম ও প্রাণের সমস্ত আবেগ গণনা করি ও লিখে রাখি, কেমন যেন আমাদের একে অন্যের কাছে হিসাব দিতে হত। এবং তোমরা এতে নিশ্চিত হতে পার যে, আমাদের অপকর্ম প্রকাশিত করা হলে আমরা যদি একেবারে লজ্জাবোধ করতাম, তবে পাপ করা এমনকি অনিষ্টকর কিছুটা ভাবাও বন্ধ করে দিতাম। কেননা এমন কেইবা আছে যে এমনটা চায়, পাপ করার সময়ে লোকে তাকে দেখবে? অথবা, কেইবা আছে যে, নিজেকে অজ্ঞাত করার জন্য পাপ করার পর মিথ্যা বলতে পছন্দ করবে না? তাই, আমরা একে অন্যকে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করলে যেমন ব্যভিচার করতাম না, তেমনি, যদি কেমন যেন একে অন্যের কাছে আমাদের

চিন্তা-ভাবনা বর্ণনা ক'রে সেই চিন্তা-ভাবনা লিখে রাখি, তাহলে আমাদের অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা প্রকাশিত হলে পাছে লজ্জাবোধ করি, সেই মর্মে আমরা নিঃসন্দেহেই অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা থেকেও নিজেদের দূরে রাখতাম। তবে তেমন লেখাটা আমাদের সহ-সন্ন্যাসীদের চোখের স্থান নিক, যাতে করে, লেখায় যেমন, তেমনি কার চোখে ধরা পড়ায় লজ্জায় লাল হয়ে আমরা যেন অনিষ্ট কোন বিষয় না ভাবি। এইভাবে নিজেদের গড়ে তুলে আমরা দেহকে নিজেদের অধীনে বশীভূত রাখতে পারব [চ], ও সেইসঙ্গে প্রভুকে তুষ্ট করব ও শত্রুর সমস্ত প্রতারণা পায়ের নিচে মাড়িয়ে দেব।'

৫৬। তেমন কথা তিনি তাদেরই শেখাতেন যাদের সঙ্গে দেখা করতেন। এবং তিনি কষ্টভোগীদের প্রতি সহনশীল হতেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন; এবং অনেকের হয়ে তিনি যে প্রার্থনা নিবেদন করতেন, প্রভু সেই প্রার্থনা প্রায়ই শুনতেন। যখন লোকে তাঁর কথা শুনত, তখন আন্তনি বড়াই করতেন না; ও যখন লোকে তাঁর কথা শুনত না, তখনও তিনি অসন্তুষ্ট হতেন না; তিনি বরং সবসময় প্রভুকে ধন্যবাদ জানাতেন। কষ্টভোগী যারা, তাদের তিনি উৎসাহিত করতেন যেন তারা সহিষ্ণু হয় ও যেন জানতে পারে যে, আরোগ্য তাঁর নিজেরও বা কোন মানুষেরও অধিকার নয়, তা কেবল সেই ঈশ্বরেরই অধিকার যিনি যখনই ইচ্ছে ও যার প্রতি ইচ্ছা করেন সেই অনুসারে কাজ করেন। তাই কষ্টভোগীরা সেই বৃদ্ধজনের কথা আরোগ্য বলে গ্রহণ করে নিত, ও সেইসঙ্গে নিরাশ না হতে বরং সহিষ্ণু হতে শিখত। এবং যারা নিরাময় হত, তারা এ শিক্ষা পেত যে, আন্তনিকে নয়, কেবল ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

৫৭। একদিন এমনটা ঘটল যে, পালাতিউম থেকে আগত ফ্রন্তো নামক একজন লোক ভয়ানক রোগে আক্রান্ত ছিল, কেননা সে জিহ্বাও কামড়াত ও সেইসঙ্গে চোখও হারাতে যাচ্ছিল। যখন সে পর্বতে গেল, তখন সে আন্তনিকে অনুরোধ করল যেন তার মঙ্গল প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা করার পর আন্তনি ফ্রন্তোকে বললেন, 'যাও, তুমি নিরাময় হবে।' কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হলে ও সে সেখানে বেশ কয়েক দিন ধরে থাকলে আন্তনি বলতে থাকলেন, 'তুমি এখানে থাকতে নিরাময় হতে পারবে না। যাও, ও যখন মিশরে গিয়ে পৌঁছবে, তখন তুমি দেখতে পাবে যে, চিহ্নকর্মটা তোমাতে সিদ্ধি লাভ করেছে।'

তেমন কথা বিশ্বাস করে সে চলে গেল, ও যেই মাত্র মিশর দেখতে পেল তার কষ্ট শেষ হল ও সে সুস্থ হল, ঠিক সেই বাণী অনুসারে যা প্রার্থনাকালে ত্রাণকর্তা দ্বারা আন্তনিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫৮। ত্রিপোলিস অঞ্চলে বুসিরিস শহরের একটি যুবতী ভয়ঙ্কর ও সেইসঙ্গে অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত ছিল, কেননা যখন শ্লেষ্মা সহ তার চোখের জল ও তার কানের স্রাব মাটিতে পড়ত, সেইসব সাথে সাথে পোকা হয়ে যেত। আর শুধু তা নয়, তার দেহ ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও তার চোখ দু'টো টেরা ছিল। যুবতীর পিতামাতা একথা জানতে পেরে যে, সন্ন্যাসীরা আন্তনির কাছে যেত, ও সেই প্রভুতে বিশ্বাস রেখে যিনি রক্তস্রাবে আক্রান্ত সেই স্ত্রীলোককে নিরাময় করেছিলেন (ক), সেই সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিজেদের মেয়েকে নিয়ে নিজেরাও যাবে বলে তাদের অনুরোধ করল, আর সেই সন্ন্যাসীরা সম্মত হল। নিজের মেয়ের সঙ্গে সেই পিতামাতা পর্বতের বাইরে সাক্ষ্যদাতা ও সন্ন্যাসী সেই পাফ্‌নুতিউসের (খ) সঙ্গে থাকছিল, কিন্তু অন্যান্যরা ভিতরে গেল, ও যখন তারা আন্তনিকে সেই যুবতীর কথা বলতে ইচ্ছা করছিল, ঠিক তখনই তিনি মেয়েটির রোগ বর্ণনা ক'রে ও মেয়েটি যে তাদের সঙ্গে যাত্রা করেছিল তাও বর্ণনা ক'রে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অথচ, যখন তারা এমনটা অনুরোধ করল যেন সেই লোকদের তাঁর কাছে আসতে দেওয়া হয়, তখন তিনি অসম্মত হয়ে তাদের বললেন, 'যাও, আর সে যদি না মরে থাকে তবে তোমরা দেখতে পাবে, সে নিরাময় হয়েছে। কেননা এই কর্ম আমার এমন নয় যে সে আমার কাছে আসতে বাধ্য, বরং তার নিরাময় সেই প্রভু থেকেই আসে যিনি, যারা তাঁকে ডাকে, সর্বস্থানে তাদের নিজের দয়া দেখান। তাই এক্ষেত্রেও প্রভু সেই যুবতীর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন ও তাঁর মঙ্গলময়তা আমাকে দেখাল যে, মেয়েটি যেখানে রয়েছে, সেইখানে তিনি তার রোগ নিরাময় করবেন'। প্রকৃতপক্ষে সেই আশ্চর্য কাজ সম্পাদিত হল, ও বাইরে গিয়ে তারা দেখতে পেল, সেই পিতামাতা উল্লসিত ও মেয়েটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।

৫৯। একদিন দু'জন সন্ন্যাসী তাঁর কাছে আসছিল ও পথিমধ্যে তাদের জল ফুরিয়ে গেল; তাতে একজন মারা গেল ও দ্বিতীয়জন ছিল মৃত্যুর সম্মুখীন। পথ চলার মত তার

শক্তি না থাকায়, সে মৃত্যুর অপেক্ষায় মাটিতে বসে পড়ল। কিন্তু পর্বতের অভ্যন্তরে বসে আন্তনি দু’জন সন্ন্যাসীকে ডাকলেন (কেননা দৈবাৎ সেই দু’জন সেখানে ছিল) ও তাদের অনুরোধ করে বললেন, ‘একটা জলের কলসি নিয়ে মিশরের পথে ছুটে চল। কেননা যে দু’জন এখানে আসছিল, তাদের একজন এইমাত্র প্রাণ হারিয়েছে, ও তোমরা তাড়াতাড়ি না গেলে অপর একজনও মরবে। কেননা একটু আগে আমি প্রার্থনা করতে করতে একথা আমাকে প্রকাশ করা হয়েছে।’ তাই সেই সন্ন্যাসীরা গেল ও দেখল, একজন মৃত অবস্থায় শুয়ে আছে, তাই তাকে কবর দিল; অপর একজনকে তারা জল খাইয়ে সঞ্জীবিত করল ও বৃদ্ধজনের কাছে নিয়ে এল, কেননা দূরত্ব ছিল পুরা এক দিনের যাত্রাপথ। কিন্তু যদি এমন একজন জিজ্ঞাসা করে, কেনই বা প্রথমজন প্রাণ হারাবার আগে তিনি ব্যাপারটা ব্যক্ত করেননি, তাহলে সে নিজের জিজ্ঞাস্য সঠিক ভাবে উপস্থাপন করেনি। কেননা অবশ্যই মৃত্যু সংক্রান্ত বিচার আন্তনি থেকে নয়, সেই ঈশ্বর থেকেই উদ্গত হল যিনি একজনের জন্য বিচার সম্পাদন করলেন ও সেইসঙ্গে অপরজন সম্পর্কে দর্শন প্রেরণ করলেন। কিন্তু এই বিস্ময়কর কাজ কেবল আন্তনি ক্ষেত্রেই ঘটল, কেননা পর্বতের অভ্যন্তরে বসতে বসতে তিনি নিজের হৃদয় জাগ্রত রাখছিলেন, ও প্রভু তাঁকে দূরের ঘটনা দেখালেন।

৬০। আর এক সময় তিনি পর্বতের অভ্যন্তরে বসে ছিলেন, ও ঊর্ধ্বের দিকে তাকিয়ে এমন একজনকে দেখলেন যাকে আকাশে-বাতাসে ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল, আবার দেখলেন, যারা তার সঙ্গে দেখা করছিল তাদের মধ্যে মহা আনন্দ বিরাজ করছিল। বিস্ময়ে পূর্ণ হয়ে ও তেমন মহৎ সঙ্ঘ সুখী বলে গণ্য ক’রে তিনি প্রার্থনা করলেন যেন জানতে পারেন এসব কিছুর অর্থ কি। এবং সাথে সাথে একটা কণ্ঠস্বর তাঁর কাছে এসে তাঁকে বলল, ‘সেটা সেই আমুনের প্রাণ, যিনি নিত্রিয়ায় (ক) সন্ন্যাসী।’ সেই আমুন বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনায় নিষ্ঠাবান হয়েছিলেন। এদিকে, আন্তনি যেখানে ছিলেন, সেই পর্বত থেকে নিত্রিয়ার দূরত্ব হল তের দিনের যাত্রাপথ। তাই আন্তনির সঙ্গীরা সেই বৃদ্ধজনকে আশ্চর্যান্বিত দে’খে তার কারণ জানতে অনুরোধ করল, ও তারা শুনল, আমুন তখনই মারা গেছেন। যেহেতু সেই আমুন সেখানে প্রায়ই দেখা করতে এসেছিলেন,

সেজন্য বেশ পরিচিত ছিলেন, ও তাঁর মধ্য দিয়ে অনেক চিহ্নকর্ম সাধন করা হয়েছিল। সেগুলোর একটা এ। একদিন যখন তাঁকে লিকুস নামক নদী পার হতে হচ্ছিল (নদীটা সেসময় বন্যায় ভরা ছিল), তখন তাঁর সঙ্গী থেওদরসকে তাঁর কাছ থেকে কিছু দূরে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন যাতে নদীতে সাঁতার দিতে দিতে দু'জনে একে অন্যের উলঙ্গতা না দেখেন। পরে সেই থেওদরস দূরে গেলেই তিনি নিজেকে বস্ত্রহীন দেখে লজ্জাবোধ করেছিলেন, ও লজ্জার মধ্যে তেমনটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করে তাঁকে নদীর ওপারে স্থানান্তর করা হল। যখন সেই থেওদরস, যিনি নিজে ভক্তপ্রাণ মানুষ ছিলেন, অগ্রসর হয়ে দেখলেন, আমুন তাঁর আগে আগে এসে পৌঁছেছিলেন ও তাঁর দেহ থেকে একবিন্দু জলও পড়ছিল না, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে তিনি পার হয়েছিলেন। কিন্তু এমনটা দে'খে যে আমুন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সম্মত ছিলেন না, তিনি আমুনের পা ধরে হুমকি দিলেন, যা ঘটেছিল তা তাঁর কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত তিনি তাঁকে মুক্ত করবেন না। থেওদরসের দৃঢ়তা দেখে, বিশেষভাবে থেওদরস যা বলেছিলেন তা লক্ষ ক'রে আমুন তাঁর কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা দাবি করলেন যে, তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত থেওদরস তাঁর কথা কাউকে বলবেন না। তারপর তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁকে উচ্চ করে নেওয়া হয়েছিল ও ওপারে নামানো হয়েছিল; এবং তিনি যে জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন এমন নয়, কেননা তেমনটা করা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, কেবল প্রভুর পক্ষে ও তিনি যাদের তা করতে দেন কেবল তাদের পক্ষেই তেমনটা করা সম্ভব, যেইভাবে তিনি মহান প্রেরিতদূত পিতরের বেলায় করেছিলেন (খ)। তাই আমুনের মৃত্যুর পরে থেওদরস এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু আন্তনি আমুনের মৃত্যু সম্পর্কে যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তারা তারিখের কথা লক্ষ করল, ও যখন নিত্রিয়া থেকে ভ্রাতাগণ তের দিন পর এল, তখন জিজ্ঞাসা করলে এমনটা জানতে পারল যে, আমুন ঠিক সেই দিন ও দিনের সেই সময়ই মারা গেছিলেন যখন বৃদ্ধজন দেখেছিলেন, তাঁর প্রাণকে ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল। তারা ও অন্যান্যরাও আন্তনির আত্মার বিশুদ্ধতা বিষয়ে আশ্চর্য হল, তিনি যে অবিলম্বেই তা-ই জানতে পেরেছিলেন যা তের দিনের যাত্রাপথের দূরত্বে ঘটেছিল। তারা সবাই এতেও আশ্চর্য হল যে, তিনি দেখেছিলেন, তাঁর প্রাণকে ঊর্ধ্বে চালনা করা হচ্ছিল।

৬১। অন্য দিনের ঘটনা। সম্ভ্রান্ত বংশের সেই আর্খেলাওস তাঁকে পর্বতের বাইরে পেয়ে তাঁর কাছে শুধু এ চেয়েছিলেন, তিনি যেন লাওদিকেয়ার উত্তম খ্রিষ্টিয়ান যুবতী সেই পলিক্রাতেইয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, কেননা অধিক কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার কারণে সেই পলিক্রাতেইয়া পেটে ও পাশে ভয়ঙ্কর ব্যথা ভোগ করছিল ও তার পুরা দেহটা দুর্বল হয়ে গেছিল। তাই আন্তনি প্রার্থনা করলেন, ও সম্ভ্রান্ত বংশের সেই মানুষ সেই দিনের নাম লিখে রাখলেন যেদিনে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছিল। লাওদিকেয়ার দিকে রওনা হয়ে তিনি সেই যুবতীকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন। যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ সময় ও কোন্ দিনে সে দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়েছিল, তখন সেই কাগজ বের করলেন যেখানে তিনি প্রার্থনার সময়ে লিখে রেখেছিলেন, ও সেটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা দেখালেন ও সবাই আশ্চর্য হলো এমনটা উপলব্ধি ক'রে যে, যখন আন্তনি প্রার্থনা করছিলেন ও ত্রাণকর্তার মঙ্গলময়তার কাছে সেই যুবতীর হয়ে অনুরোধ রাখছিলেন, ঠিক সেই সময়ই প্রভু সমস্ত ব্যথা থেকে যুবতীকে মুক্ত করেছিলেন।

৬২। যারা আন্তনির সঙ্গে দেখা করতে যেত, তাদের বিষয়ে তিনি প্রায়ই বেশ কিছু দিন আগেই, এমনকি সময় সময় কয়েক মাস আগেও সেই কারণ ব্যক্ত করতেন যার জন্য তাদের আসার কথা ছিল। বাস্তবিকই কেউ এমনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, অন্য কেউ অসুস্থতার কারণে, অন্য কেউ অপদূতগ্রস্ত হওয়ায়ই তাঁর কাছে আসত; এবং এরা সবাই কেউই যাত্রার কষ্ট বিরক্তিকর ও লোকসান বলে গণ্য করত না, কেননা প্রত্যেকে উপকৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেত। এবং যদিও তিনি এসব কিছু বলতেন ও শুনতেন, তবু এমনটা অনুরোধ করতেন যেন কেউই তেমন ব্যাপারে তাঁর বিষয়ে বিস্মিত না হয়, বরং যেন প্রভুর বিষয়ে বিস্মিত হয়, কেননা প্রভুকে জানবার আমাদের ক্ষমতার অনুপাতেই তিনিই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখান।

৬৩। আর এক সময় তিনি বাইরেকার মঠগুলোতে নেমে এলে ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে একটা নৌকায় উঠতে অনুরোধ করা হলে, কেবল তিনিই অপ্রীতিকর ও তীব্র কটুগন্ধ টের পেলেন। এদিকে, নৌকায় যারা ছিল, তারা বলছিল, নৌকায় মাছ ও শুক্না মাংস ছিল বিধায় গন্ধটা সেগুলো থেকে আসছিল, কিন্তু তিনি জোর

দিয়ে বলছিলেন, দুর্গন্ধটা অন্য কিছু থেকে আসছিল। এমনকি তিনি কথা বলতে বলতেই এমন অপদূতগ্রস্ত যুবক যে আগে নৌকায় উঠেছিল ও নিজেকে লুকিয়েছিল, সে হঠাৎ করে চিৎকার করল। কিন্তু প্রভু যিশুখ্রিষ্টের নামে ধমক পেয়ে অপদূত চলে গেল ও যুবকটি সুস্থতা ফিরে পেল। তাতে সবাই এটা মেনে নিল যে, সেই দুর্গন্ধ অপদূত থেকেই আসছিল।

৬৪। সম্ভ্রান্ত বংশের অন্য একজনও এল, সেও অপদূতগ্রস্ত ছিল। সেই অপদূত এতই ভয়ানক ছিল যে, অপদূতগ্রস্ত লোকটা এমনটাও জানত না, সে আন্তনির কাছে যাচ্ছে; তার অবস্থা এমন ছিল যে, সে নিজের মলমূত্র খেত। যারা তাকে বহন করে নিল, তারা আন্তনিকে লোকটার জন্য প্রার্থনা করতে অনুরোধ করল, এবং আন্তনি যুবকের প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে তার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলেন ও সারা রাত তার পাশে পাশে জেগে কাটালেন। ভোর প্রায়ই হয়েছে এমন সময় যুবকটি হঠাৎ করে আন্তনির গায়ে লাফ দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিল। যারা যুবকটিকে নিয়ে এসেছিল তারা তার উপর একেবারে রুষ্ট হলেও আন্তনি বললেন, 'যুবকটির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ো না, কেননা সে দায়ী নয়, তার অন্তরে উপস্থিত অপদূতই দায়ী। তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে ও শুষ্ক মরুজায়গায় চলে যেতে আদেশ করা হয়েছে বিধায়ই সে ক্রুদ্ধ হয়ে তেমনটা করল। তাই প্রভুর গৌরবকীর্তন কর, কেননা এইভাবে আমার উপরে তার আক্রমণ হয়ে উঠল অপদূতের চলে যাওয়ার চিহ্ন।' আন্তনি একথা বলার সাথে সাথে যুবকটি প্রকৃতস্থ অবস্থায় ফিরে এল ও অবশেষে সচেতনতা ফিরে পেয়ে উপলব্ধি করল সে কোথায় আছে, তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে বৃদ্ধজনকে আলিঙ্গন করল।

৬৫। আন্তনি সম্পর্কে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী অন্য বহু কর্মের কথা বলেছে যা তাঁর মধ্য দিয়ে ঘটেছিল, এবং তাদের বিবরণী সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যে পূর্ণ। অথচ এগুলো অন্য কতগুলোর মত তত বিস্ময়কর মনে হচ্ছে না। একদিন যখন তিনি খেতে উদ্যত ছিলেন, তখন আনুমানিক বিকেল তিনটে প্রার্থনা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে তিনি এমনটা অনুভব করলেন তাঁকে আত্মায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এবং যা বিস্ময়কর, তা এটা ছিল যে, সেখানে সেই দাঁড়ানো অবস্থায় তিনি নিজেকে কেমন যেন নিজের বাইরে দেখলেন ও তাঁকে

অচেনা প্রাণীদের দ্বারা বায়ুমণ্ডলে চালনা করা হচ্ছে। তারপর তিনি বায়ুমণ্ডলে দাঁড়ানো এমন কয়েকটা জঘন্য ও ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখতে পেলেন যেগুলো তাঁকে পিছনে ধরে রাখছিল যেন তিনি ওদিকে পার হতে না পারেন। কিন্তু যখন তাঁর পথপ্রদর্শকেরা তাদের প্রতিরোধ করল, তখন সেই প্রাণীরা এ দাবি রাখল যে, তিনি তাদের কাছে দায়ী না হলে তারা যেন কমপক্ষে তাঁর যাওয়ার কারণ জানতে পারে। এবং যখন সেই প্রাণীরা আন্তনির জন্মলগ্ন থেকে তাঁর সারা জীবনের একটা বিবরণ পেতে ইচ্ছা করছিল, তখন আন্তনির পথপ্রদর্শকেরা এই বলে ব্যাপারটা প্রতিরোধ করল, 'তাঁর জন্মলগ্ন থেকে যত কিছু ঘটেছে তা প্রভু মুছিয়ে দিলেন, কিন্তু যে সময় থেকে তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন ও ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, সেসময় থেকে তোমরা একটা বিবরণী দাবি করতে পার।' তাই তারা অভিযোগ তুলতে তুলতে কিন্তু একটাও প্রমাণসিদ্ধ করতে না পারতেই পথ উন্মুক্ত হল ও তিনি নিজেকে মুক্ত ও প্রতিরোধ শূন্য বোধ করলেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি নিজেকে নিজের সঙ্গে আসতে ও থাকতে দেখলেন, ও পুনরায় আগেকার আন্তনি হলেন।

একদিন, খাওয়া-দাওয়া করতে ভুলে গিয়ে তিনি দিনের অবশিষ্ট সময় ও সারা রাত আর্তনাদ ও প্রার্থনা করতে করতে কাটালেন। কেননা আমাদের লড়াইতে যে কতগুলো শত্রু জড়িত, ও বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পার হবার জন্য একজনকে যে কত শ্রম ভোগ করতে হয় তা দেখে তিনি আশ্চর্য হলেন; তখন তাঁর মনে পড়ল যে, তা ঠিক তা-ই ছিল যা প্রেরিতদূত বলেছিলেন, *বায়ুমণ্ডলের কর্তৃত্ব-রাজ্যের সেই অপরাজের অনুসরণে চ'লে…* (ক) ইত্যাদি। কেননা সেই বায়ুমণ্ডলে শত্রু যুদ্ধ করার, ও যারা সেটার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে তাদের প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করার ক্ষমতা রাখে। এজন্যই প্রেরিতদূত বিশেষভাবে আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, *ঈশ্বরের রণসজ্জা হাতে তুলে নাও, যেন সেইদিনে সেই শত্রুকে প্রতিরোধ করার মত শক্তি পাও … , যেন আমাদের নামে অপবাদ দেওয়ার মত কিছু না পেয়ে সেই শত্রু দিশেহারা হয়ে পড়ে* (খ)। এবং তেমনটা শিখে, এসো, আমরা প্রেরিতদূতের এ বচন মনে রাখি, *শরীরে কিনা, জানি না; অশরীরে কিনা, জানি না; ঈশ্বর জানেন* (গ)। পলকে *তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল* ও অকথনীয় এমন কথা শুনে *যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই* (ঘ) তিনি ফিরে এসেছিলেন,

কিন্তু আন্তনি নিজেকেই বায়ুমণ্ডলে ঢুকতে ও মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে দেখেছিলেন।

৬৬। তিনি এই অনুগ্রহদানেরও অধিকারী ছিলেন: যখন তিনি পর্বতে একাকি হয়ে বসতেন, যদি এমনটা ঘটত যে, নিজে থেকে কোন সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে নিজেই জটিলতায় জড়িত হতেন, তাহলে সমাধানটা প্রার্থনাকালে [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান দ্বারা তাঁকে দেওয়া হত। তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যার বিষয়ে শাস্ত্রে বলে, *ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত* (ক)। অনেক দিন পর, যখন তিনি একদা এমন একজনের সঙ্গে কথাবার্তা করছিলেন, যে প্রাণের উত্তরণ সম্পর্কে ও এজীবনের পরে প্রাণের অবস্থান সম্পর্কে তাঁকে দেখতে যেত, তখন, পর দিন রাতে, কে যেন একজন ঊর্ধ্ব থেকে এ বলে তাঁকে ডাকল, 'আন্তনি, ওঠ, বাইরে গিয়ে লক্ষ কর।' তাই বাইরে গিয়ে তিনি (যেহেতু জানতেন তিনি বাধ্য হলে ব্যাপারটা কার্ উপকারে আসবে) চোখ তুলে মহাকায়, বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর এমন একজনকে দেখতে পেলেন যে দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল ও মেঘলোকে পৌঁছত; তিনি দেখলেন, পাখা-বিশিষ্টই যেন অন্য অন্য কেউ আরোহণ করছিল, আরও দেখলেন, সেই মহাকায়জন হাত বাড়াচ্ছিল, ও কাউকে তার দ্বারা পিছনে ধরে রাখা হচ্ছিল, কিন্তু অন্য কেউ ঊর্ধ্বে উড়তে উড়তে অবশেষে সেই জনকে পার হয়ে নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় আরোহণ করে চলছিল। যারা আরোহণ করেছিল, তাদের দিকে সেই মহাকায়জন দাঁতে দাঁত ঘষত, কিন্তু যারা পিছনে পড়েছিল, সে তাদের উপর ফুর্তি করত। এবং অবিলম্বেই একটা কণ্ঠস্বর আন্তনির কাছে এল, 'যা দেখেছ, তা উপলব্ধি কর।' তখন তাঁর উপলব্ধি-পরদা উন্মুক্ত হল ও তিনি বুঝতে পারলেন যে, দর্শনটা ছিল প্রাণগুলোর উত্তরণ সংক্রান্ত, ও সেই মহাকায়জন ছিল সেই শত্রু যে বিশ্বস্তজনদের হিংসা করে। তিনি বুঝতে পারলেন, সেই জন তাদেরই ধরে ও পার হতে রোধ করে যারা তার অধিকারে রয়েছে, কিন্তু যারা তার বশীভূত হয় না, তারা পার হতে হতে সে তাদের ধরতে অক্ষম। তাই তেমনটা দেখে ও এবিষয় মনে রাখতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি *সামনে যা রয়েছে* (খ) সেইদিকে প্রত্যেকদিন অগ্রসর হতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তিনি স্বেচ্ছায় এসমস্ত বিষয়ের বিবরণী দিতেন না, কেননা তিনি প্রার্থনায় অনেক সময় কাটাতেন ও

একা একা সেবিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতেন; কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা যখন চাপ দিত, তখন, পিতা যেমন নিজ সন্তানদের কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখতে পারেন না, তেমনি তিনি সেবিষয়ে কথা বলতে বাধ্য হতেন। অন্য দিকে তিনি নিজের বিবেক পরিষ্কার মনে করতেন, এও মনে করতেন যে, সেই বিবরণী তাদের উপকারে আসত যেহেতু তা দ্বারা তারা এ শিখতে পারত যে, সাধনা উত্তম ফল ফলায়, ও দর্শন প্রায়ই শ্রমের আরাম হিসাবে আসে।

৬৭। তাছাড়া তিনি স্বভাবে সহনশীল ও আত্মায় বিনম্র ছিলেন। কেননা তেমন মানুষ হয়েও তিনি অধিক যত্ন সহকারে মণ্ডলীর নিয়ম সম্মান করতেন ও এমনটাও চাইতেন যেন মণ্ডলীর সেবাকর্মীরা তাঁর চেয়ে বেশি সম্মানের পাত্র হন। বিশপ ও পুরোহিতদের সামনে মাথা নত করতে লজ্জাবোধ করতেন না; কোন পরিসেবকও তাঁর কাছে সহায়তার জন্য এলে, তিনি যা উপকারী সেবিষয়ে কথাবার্তা করতেন ও তাঁর জন্য নিজের প্রার্থনায় স্থান দিতেন, এতে বিব্রত না হয়ে যে, তাঁর পক্ষেও কিছুটা শেখার দরকার আছে। কেননা তিনি প্রায়ই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে, যারা তাঁর সঙ্গে ছিল, তাদের কাছ থেকে কিছুটা শুনতে বাসনা করতেন। এবং এও স্বীকার করতেন যে, যখন কেউ উপকারী কিছু বলত, তখন তিনি সাহায্য পেতেন। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল মহৎ ও বিস্ময়কর অনুগ্রহে চিহ্নিত, ও তেমন আত্মিক অনুগ্রহদান তিনি ত্রাণকর্তার কাছে থেকে পেয়েছিলেন, কেননা যখন তিনি বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীদের মধ্যে ছিলেন ও তাঁকে আগে কখনও দেখেনি এমন কেউ থাকলে যে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করত, তখন তিনি আসামাত্র অন্যান্য সকলকে পার হয়ে, কেমন যেন তার চোখ দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সরাসরি তার কাছে ছুটে যেতেন। তাঁর দৈহিক গঠনই যে অন্যান্যদের মধ্য থেকে তাঁকে পৃথক করত তা নয়, কিন্তু তাঁর চরিত্রের স্থৈর্য ও আত্মার শুচিতাই তাঁকে পৃথক করত। কেননা তাঁর আত্মা বিভ্রামমুক্ত হওয়ায় তিনি বাহ্যিক বাকি ইন্দ্রিয়গুলোকেও নিরুদ্বিগ্ন রাখছিলেন, ফলত আত্মার আনন্দ থেকে তাঁর মুখমণ্ডলও উৎফুল্ল হত, এবং তাঁর দেহের অঙ্গভঙ্গি থেকে তাঁর আত্মার অবিচল অবস্থা উপলব্ধি ও অনুভব করা সম্ভব ছিল, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *আনন্দিত হৃদয় মুখকে উৎফুল্ল করে তোলে; কিন্তু হৃদয়ের ব্যথায় আত্মা ভেঙে*

পড়ে [ক]। এইভাবেই তো যাকোব বুঝতে পেরেছিলেন, লাবান মতলব করছিলেন ও নিজের স্ত্রীদ্বয়কে বলেছিলেন, *তোমাদের পিতার মুখ গতকালের মতও নয়, আগেকার দিনের মতও নয়* [খ]। একই প্রকারে শামুয়েল দাউদকে চিনতে পেরেছিলেন যেহেতু তাঁর চোখ উজ্জ্বল, ও *তাঁর দাঁত দুধের মত শুভ্র* [গ] ছিল। সেইভাবে আন্তনিকেও চেনা যেতে পারত, কেননা তাঁর মন সবসময় উৎফুল্ল হওয়ায় তিনি কখনও উদ্বিগ্ন ছিলেন না, তাঁর প্রাণ শান্ত ছিল, ও তাঁর চেহারা কখনও বিষণ্ন ছিল না।

৬৮। বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি সত্যিই ছিলেন বিস্ময়কর ও সত্যশিক্ষাবাদী। আগে থেকে মেলেতিউস-পন্থীদের শঠতা ও বিশ্বাসত্যাগের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন বিধায় তিনি শুরু থেকেই সেই বিচ্ছিন্নতা-অবলম্বী মেলেতিউস-পন্থীদের [ক] সঙ্গে সহভাগিতা রাখেননি। মানিপন্থীদের বা অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গেও তিনি কোন বন্ধুসুলভ সম্পর্ক স্বীকার করেননি; শুধু এক্ষেত্রেই সম্পর্ক রাখা যেতে পারত যাতে সত্যবিশ্বাসে ফিরে আসা সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেওয়া হত, কেননা তিনি ভাবতেন ও শেখাতেন যে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মেলামেশা আত্মার ক্ষতি ও বিনাশ ঘটাবেই। তাই, একইপ্রকারে, তিনি আরিউসপন্থীদের ভ্রান্তমত জঘন্য বলে গণ্য করতেন, ও আজ্ঞা দিয়েছিলেন যেন কেউই তাদের কাছে না যায় ও তাদের ভ্রান্তমতের সহভাগী না হয়। একদিন, যখন আরিউসপন্থী উন্মাদদের কয়েকজন তাঁর কাছে গিয়েছিল, তখন তিনি তাদের যাচাই করে ও এমনটা বুঝতে পেরে যে তারা ভক্তিহীন, পর্বত থেকে তাদের তাড়িয়ে দিলেন একথা বলে যে, তাদের ধর্মতত্ত্ব সাপের বিষের চেয়ে আরও খারাপ।

আরিউস-পন্থীদের বিপক্ষে

৬৯। আর একদিন, যখন আরিউসপন্থীরা মিথ্যায় এমনটা রটিয়ে বেড়াল যে, তিনি তাদের মতো একই মতবাদী, তখন তাদের নিয়ে যথেষ্ট অসন্তোষ ও রাগ দেখালেন। পরে, বিশপদের ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের দ্বারা আহূত হয়ে তিনি পর্বত থেকে নেমে এসে ও আলেক্সান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করে প্রকাশ্যেই আরিউসপন্থীদের প্রত্যাখ্যান করলেন একথা বলে যে, তাদের ভ্রান্তমত ছিল সর্বশেষ ভ্রান্তমত ও খ্রিষ্টবৈরীর অগ্রদূত। তিনি লোকদের

শেখাতেন যে, ঈশ্বরের পুত্র সৃষ্টজীব নন, ও তিনি অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আসেননি বরং তিনি ছিলেন পিতার সত্তা থেকে উদ্ভূত অনন্তকালস্থায়ী বাণী ও প্রজ্ঞা। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'সুতরাং, "এমন সময় ছিল যখন তিনি ছিলেন না" তেমনটা বলা ঈশ্বরনিন্দা স্বরূপ, কেননা বাণী সবসময়ই পিতার সঙ্গে সহ-অস্তিত্বমণ্ডিত (ক)। তাই ভক্তিহীন সেই আরিউসপন্থীদের সঙ্গে তোমাদের কোন সহভাগিতা রাখতে হবে না, কেননা *অন্ধকারের সঙ্গে আলোর কোন সহভাগিতা নেই* (খ)। তোমরা ঈশ্বরভীরু খ্রিষ্টিয়ান, কিন্তু "পিতা ঈশ্বরের পুত্র ও বাণী একটা সৃষ্টজীব মাত্র" ওরা একথা বলায় সেই পৌত্তলিকদের চেয়ে ভিন্ন নয় যারা স্রষ্টা ঈশ্বরের চেয়ে বরং সৃষ্টবস্তুকে পূজা করে (গ)। এতে নিশ্চিত হও যে, গোটা সৃষ্টিও ওদের প্রতি ক্রুদ্ধ, কেননা ওরা সৃষ্টবস্তুদের মধ্যে নিখিলের সেই স্রষ্টা ও প্রভুকে তালিকাভুক্ত করে যাঁর মধ্যে সবকিছু হয়েছে।'

৭০। যখন লোকে শুনল, খ্রিষ্টের বিরুদ্ধ সেই ভ্রান্তমত তেমন মানুষ দ্বারা নিন্দিত হচ্ছে, তখন তারা সবাই আনন্দিত হল, ও শহরে সবাই আন্তনিকে দেখবার জন্য ছুটে গেল। গ্রীকেরা ও তাদের মধ্যে যারা 'যাজক' বলে অভিহিত, তারাও মিলে প্রভুর গৃহে এসে বলল, 'আমরা ঈশ্বরের সেই মানুষকে দেখবার দাবি করছি', কেননা সেই নামেই সবাই তাঁকে ডাকত। সেখানেও প্রভু তাঁর মধ্য দিয়ে অপদূতগ্রস্ত বহু মানুষকে শুচীকৃত করলেন ও উন্মাদ যারা তাদের নিরাময় করলেন। অনেক গ্রীক শুধু এটাই ইচ্ছা করছিল, তারা সেই বৃদ্ধজনকে স্পর্শ করতে পারবে, একথা বিশ্বাস করে যে, তাতে তারা উপকৃত হবেই। এটা নিঃসন্দেহের বিষয় যে, একজন এক বছরে যত মানুষকে দেখতে পেত, তত মানুষ কেবল সেই কয়েক দিনেই খ্রিষ্টিয়ান হল। কেননা, যদিও কেউ না কেউ ভাবছিল যে, তিনি ভিড়ের জন্য বিরক্তি বোধ করছিলেন ও সেই কারণে নিজের কাছ থেকে সকলকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, তবু তিনি নিরুদ্বিগ্নই থাকতেন, ও বলতেন, 'পর্বতে আমরা যে অপদূতদের সঙ্গে লড়াই করি, সেই অপদূতদের চেয়ে এগুলো তত বহুসংখ্যক নয়।'

পর্বতে প্রত্যাগমন

৭১। তিনি চলে যাচ্ছিলেন ও আমরা (ক) তাঁর সঙ্গে চলছিলাম; আমরা নগরদ্বারে এসে পৌঁছেছি এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আমাদের পিছনে চিৎকার করে বলল, 'হে ঈশ্বরের মানুষ, অপেক্ষা করুন। একটা অপদূত আমার মেয়েকে ভয়ঙ্করভাবে বিরক্ত করছে। ভিক্ষা রাখছি, আপনি থামুন, যেন ছুটতে ছুটতে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকির সম্মুখীন না হতে হয়।' যখন সেই বৃদ্ধজন তার কথা শুনলেন ও আমরাও তাঁকে তেমনটা করতে অনুরোধ করছিলাম, তখন থামতে সম্মত হলেন। স্ত্রীলোকটি কাছে এগিয়ে এলে মেয়েটিকে মাটিতে ছুড়ে ফেলা হল, কিন্তু যখন আন্তনি প্রভুর নাম করতে করতে প্রার্থনা করলেন, তখন মেয়েটিকে সুস্থ অবস্থায় তুলে নেওয়া হল যেহেতু সেই অশুচি অপদূত তাকে ছেড়ে চলে গেছিল। এবং তার মা ঈশ্বরের প্রশংসা করল ও সবাই ধন্যবাদ জানাল। তিনিও তাঁর আপন বাড়ির দিকেই যেন সেই পর্বতের দিকে রওনা হতে হতে আনন্দিত ছিলেন।

৭২। তাছাড়া আন্তনি অধিকতক প্রজ্ঞাবানও ছিলেন। এটাই আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েও তবু ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ মানুষ। উদাহরণ স্বরূপ, একদিন দু'জন গ্রীক দার্শনিক তাঁকে দেখতে এল; তারা মনে করছিল, তারা তাঁকে পরীক্ষা করতে পারবে। সেসময় তিনি বাইরেকার পর্বতে থাকতেন, ও সেই দু'জনের পোশাকে তাদের [দার্শনিক] পরিচয়ের ইঙ্গিত পেয়ে, বাইরে, তাদের দিকে গেলেন ও একজন দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, 'আপনারা যখন দার্শনিক মানুষ, তখন নির্বোধ একজনকে দেখবার জন্য কেন তত কষ্টভোগ করতে সম্মত হলেন?' যখন তারা উত্তরে বলল, তিনি আসলে নির্বোধ নন, বরং ছিলেন অধিক প্রজ্ঞাবান, তখন তিনি তাদের বললেন, 'আপনারা যদি একজন নির্বোধ মানুষের কাছে এসে থাকেন, তাহলে আপনাদের কষ্ট অতিরিক্ত; কিন্তু যদি আপনারা আমাকে প্রজ্ঞাবান গণ্য করেন, তাহলে আমার মত হোন, কেননা যা উত্তম, আমাদের পক্ষে সেটারই অনুকরণ করা দরকার। আমি যদি আপনাদের কাছে যেতাম, তবে আপনাদের অনুকরণ করতাম; কিন্তু আপনারা যখন আমার কাছে এসেছেন, তখন আমার মত হোন, কেননা আমি খ্রিষ্টিয়ান।' সেই

দু'জন বিস্মিত হয়ে চলে গেল, কেননা তারা দেখতে পেল যে, অপদূতেরাও আন্তনিকে ভয় পেত।

৭৩। আর এক সময়, সেই দু'জনের মত অন্যান্য লোক বাইরেকার পর্বতে তাঁর সঙ্গে দেখা করল; মনে করছিল, তিনি উচ্চশিক্ষিত না হওয়ায় তারা তাঁকে নিয়ে বেশ মজা করবে। আন্তনি তাদের বললেন, 'এবিষয়ে আপনারা কী বলেন? কোন্‌টা প্রধান, মন নাকি উচ্চশিক্ষা? এবং সেই দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা হলো অপরটার কারণ? মন কি উচ্চশিক্ষার কারণ, নাকি উচ্চশিক্ষা মনের কারণ।' যখন তারা বলল, মনই প্রধান ও উচ্চশিক্ষার উদ্ভাবক, তখন আন্তনি বললেন, 'এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, যার মন পাক্কা, তার পক্ষে উচ্চশিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই।' উত্তরটা উপস্থিত সকলকে ও যে দু'জন এসেছিল তাদেরও বিহ্বল করল। সেই দু'জন চলে গেল এতে বিস্মিত হয়ে যে, তারা প্রশিক্ষিত নয় এমন মানুষের মধ্যে তেমন উপলব্ধি-ক্ষমতা দেখতে পেয়েছিল, কেননা তাঁর ব্যবহার এমন একজনের উগ্র ব্যবহারের মত নয় যে পর্বতে মানুষ হয়েছিল ও সেইখানে বৃদ্ধ হয়েছিল। বরং তিনি ছিলেন শালীন ও ভদ্র, এবং তাঁর কথন ছিল ঐশলবণে পরিণত, যার ফলে কেউই ক্ষুব্ধ হত না, বরং যারা তাঁর কাছে আসত, তারা সবাই তাঁর বিষয়ে আনন্দ করত।

৭৪। তারপরে আরও অনেকে এলেন, এবং তাঁরা ছিলেন সেই ধরনের মানুষ যাঁরা গ্রীকদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে খ্রিষ্টে আমাদের বিশ্বাস বিষয়ে একটা ব্যাখ্যা অনুরোধ করলেন, কিন্তু যখন তাঁরা দিব্য ক্রুশ সম্পর্কে তর্কবিদ্যা অনুযায়ী যুক্তি তৈরি করতে ও ক্রুশটিকে মজার বিষয় করতে চেষ্টা করলেন, তখন আন্তনি সর্বপ্রথমে তাঁদের অজ্ঞতার জন্য তাঁদের প্রতি অনুকম্পা বোধ ক'রে কিছুক্ষণ ধরে চুপচাপ থাকলেন, পরে সঠিক ভাবে তাঁর কথা অনুবাদ করবে এমন একজন দোভাষীর মাধ্যমে তিনি বললেন, 'কোন্‌টাই ভাল, ক্রুশকে স্বীকার করা, নাকি আপনারা যাদের দেবতা বলে ডাকেন তাদের উপর ব্যভিচার ও বালকপ্রীতি আরোপ করা? কেননা আমাদের দ্বারা যা বেছে নেওয়া হয়, তা সৎসাহসের চিহ্ন ও মৃত্যুর প্রতি অবজ্ঞার প্রমাণ, অন্যদিকে আপনাদের তত্ত্বসমূহ কামুকতা নিয়ে সম্পর্কিত। তবে আবার

বলছি, কোন্‌টা বলা উত্তম, ঈশ্বরের বাণী-লোগোস যে তাঁর পরিবর্তন হয়নি বরং তিনি যেমন ছিলেন সেইমত হয়ে থেকে মানবজাতির পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য মানবদেহ ধারণ করলেন যাতে করে মানবজন্মের অংশী হয়ে তিনি মানবজাতিকে ঐশ ও আত্মিক স্বরূপের অংশী হবার সক্ষম করতে পারেন, নাকি যা দিব্য তা একেবারে যুক্তিক্ষমতাহীন পশুদের মত করা ও এই ভিত্তিতে চতুষ্পদ সৃষ্টজীবদের ও সরিসৃপ ও মানুষের প্রতিকৃতি পূজা করা? কেননা আপনারা যাঁরা প্রজ্ঞাবান, আপনাদের কাছে সেগুলোই হলো উপাসনার বস্তু। যখন আমরা বলি খ্রিষ্ট মানুষ রূপে আবির্ভূত হলেন, তখন কেমন করে আপনারা আমাদের মজার পাত্র করবার দুঃসাহস করেন যখন আপনারা প্রাণকে স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এমনটা বলেন যে, প্রাণ পথভ্রষ্ট হয়ে আকাশ-পরদা থেকে একটা দেহে পতিত হল? আহা, আশা করি সেই দেহ ছিল মানবই দেহ এবং এমন দেহ নয় যার পরিবর্তন হয় ও যা চতুষ্পদ সৃষ্টজীবে ও সরিসৃপে রূপান্তরিত হয়। আমাদের বিশ্বাস খ্রিষ্টের সেই আগমন ঘোষণা করে যা মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য হয়েছিল, কিন্তু অসৃষ্ট প্রাণ বিষয়ক আপনাদের বিশ্বাসে আপনারা প্রবঞ্চিত। আমাদের বেলায়, আমরা [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান ও মঙ্গলময়তা জানি, অর্থাৎ আমরা জানি যে, খ্রিষ্টের এই আগমন ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য ছিল না (ক)। অন্য দিকে আপনারা একথা ঘোষণা ক'রে যে, প্রাণ হলো মনের প্রতিমূর্তি (খ), তাতে প্রাণকে পতন আরোপ করেন ও এমন পুরাণ রটিয়ে বেড়ান যা অনুসারে প্রাণ পরিবর্তনশীল, ও এর ফলে আপনারা এমন ধারণা অনুপ্রবেশ করান যে, প্রাণের কারণেই মন নিজে পরিবর্তনশীল; কেননা যা প্রতিমূর্তির বেলায় সত্য, তা অবশ্যই, তা যার প্রতিমূর্তি সেটার বেলায়ও সত্য। কিন্তু আপনারা যখন তেমন কিছু মনের বিষয়ে ভাবেন, তখন এটা উপলব্ধি করুন যে, খোদ মনের পিতা যিনি, আপনারা তাঁরও নিন্দা করেন।'

৭৫। 'এবং সেই ক্রুশ বিষয়ে [আপনারা কোন্‌টা উত্তম ঘোষণা করবেন?] যখন অপকর্মাদের দ্বারা একটা মতলব অনুপ্রবেশ করানো হয় তখন সেই ক্রুশ সহ্য করা ও যেকোন ধরনের মৃত্যুর সামনে ভয়তে কোন প্রকার কাপুরুষতা না দেখানো, নাকি অসিরিস ও ইসিসের উদ্দেশবিহীন বিচরণ সম্পর্কে, তিফোনের ফন্দি-ফিকির ও ক্রনোসের পলায়ন সম্পর্কে, ও ছেলেদের খেয়ে ফেলা ও পিতাদের হত্যাকণ্ড সম্পর্কে

পুরাণের বিবরণী দেওয়া, এ দু’টোর মধ্যে আপনারা কোন্‌টা উত্তম ঘোষণা করবেন? কেননা এসব কিছুই আপনারা প্রজ্ঞাবান বলে গণ্য করেন। এবং এটাও কেমন হতে পারে যে, আপনারা ক্রুশের কথা বিদ্রূপ করতে করতে পুনরুত্থানের বিষয়ে বিস্মিত হন না? কেননা যারা প্রথমটা [অর্থাৎ ক্রুশের কথা] বর্ণনা করেছেন, তাঁরা অপর একটাও [অর্থাৎ পুনরুত্থানের কথা] বর্ণনা করেছেন। অথবা, যখন আপনারা ক্রুশের কথা মনে রাখছেন, তখন যে মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল, যে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল, যে পক্ষাঘাতগ্রস্তরা নিরাময় হয়েছিল, সংক্রামক চর্মরোগে আক্রান্ত যে লোকেরা শুচীকৃত হয়েছিল, সাগরের উপর দিয়ে যে হাঁটাফেরা, এসমস্ত বিষয় ও সেই অন্যান্য চিহ্ন ও বিস্ময়কর কাজ যা এমন প্রমাণ দেয় যে, খ্রিষ্ট আর মানুষ নন কিন্তু ঈশ্বর, তখন এসমস্ত বিষয়ে আপনারা নীরব থাকেন কেন? আসলে আমার এমনটা মনে হচ্ছে, আপনারা নিজেদেরই অন্যায্য ভাবে বিচার করছেন ও যত্ন সহকারে আমাদের শাস্ত্র পড়েননি। কিন্তু আসুন, সেই শাস্ত্র পড়ুন ও এমনটা দেখুন যে, খ্রিষ্ট যা সাধন করলেন, তা তাঁকে সেই ঈশ্বর বলে প্রকাশ করে যিনি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন।’

৭৬। ‘কিন্তু এখন আপনারাই আপনাদের ধারণাসমূহ সম্পর্কে আমাদের অবগত করুন। যুক্তিক্ষমতাহীন প্রাণীদের সম্পর্কে আপনারা যুক্তিহীন ও অধিক পাশবিক কথা ছাড়া আর কি বলবেন? কিন্তু, যেমন আমি শুনি, সেই অনুসারে আপনারা যদিও এমনটা বলতে ইচ্ছা করেন যে, এসমস্ত কিছু আপনারা পৌরাণিক দিক দিয়ে বর্ণনা করেন, ও রূপক পদ্ধতি অনুসারে পের্সেফোনেকে ধর্ষণ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক’রে ব্যাখ্যা করেন, এবং হেফেস্তুসের পঙ্গুতা আগুনের সঙ্গে, হেরাকে হাওয়ার সঙ্গে, আপল্লোসকে সূর্যের সঙ্গে, আর্তেমিসকে চাঁদের সঙ্গে, পসেইদোনকে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ক’রে ব্যাখ্যা করেন, তাসত্ত্বেও আপনারা স্বয়ং ঈশ্বরকে উপাসনা না করে বরং যিনি সবকিছু সৃষ্টি করলেন সেই ঈশ্বরের বদলে সৃষ্টবস্তুর সেবা করেন। এমনটা হতে পারে যে, সৃষ্টির সৌন্দর্যের জন্যই আপনারা তেমন রূপকথা তৈরি করলেন। তথাপি আপনাদের বেলায় এমনটা সমীচীন যে, সৃষ্টবস্তুতে বিস্মিত হওয়ার পর আপনারা আর বেশি দূরে না এগিয়ে গিয়ে তা ঈশ্বরীকৃত করবেন না, পাছে যে সম্মান নির্মাতাকে দেয়, তা নির্মিত বস্তুতে আরোপ করেন। অন্যথা, আপনাদের জন্য সেই সময় এসেছে যখন নির্মাতাকে দেয়

সম্মান তার নির্মিত ঘরে বা সেনাপতিকে দেয় সম্মান সৈন্যতে স্থানান্তর করা হয়। এখন আপনারাই এবিষয়ে আপনাদের উত্তর উপস্থাপন করুন, যাতে আমরা জানতে পারি, ক্রুশ মজার যোগ্য কিছু ধারণ করে কিনা।'

৭৭। যখন সেই লোকেরা হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক মুখ ফেরাতে লাগলেন, তখন আন্তনি মৃদু হেসে পুনরায় একজন দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, 'এসমস্ত কিছু খোদ দৃষ্টি দ্বারাই প্রমাণিত, কিন্তু যেহেতু আপনারা প্রমাণ-বিশিষ্ট যুক্তির উপরে নির্ভর করতে পছন্দ করেন ও যেহেতু তেমন নৈপুণ্য আপনাদের আছে, সেজন্য আপনারা ইচ্ছা করেন আমরাও যুক্তি-বিশিষ্ট প্রমাণসিদ্ধ ধারণা দ্বারা ছাড়া ঈশ্বরকে উপাসনা করব না। তাই, প্রথমত, আমাকে বলুন বিষয়বস্তুসমূহ, বিশেষভাবে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান কেমন করে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞাত হয়: তা কি যুক্তির প্রমাণের মাধ্যমে নাকি বিশ্বাসের স্বকর্মের মাধ্যমে জ্ঞাত হয়? এবং স্বকর্মসূচিত বিশ্বাস ও যুক্তির প্রমাণ, এ দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা আগে আসে?' যখন তাঁরা বললেন যে, স্বকর্মসূচিত বিশ্বাস আগে আসে, ও সেটাই সূক্ষ্ম জ্ঞান, তখন আন্তনি বললেন, 'আপনাদের উত্তর সঠিক, কেননা বিশ্বাস প্রাণের মনোভাব থেকে উদ্গত, কিন্তু তর্কবিদ্যা তাদেরই নৈপুণ্যের ফল যারা সেই তর্কবিদ্যা তৈরি করেছে। সুতরাং, যাদের অন্তরে বিশ্বাসজনিত কর্ম উপস্থিত, তাদের জন্য যুক্তির প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না, এমনকি তা হয় তো অনর্থকও; কেননা আমরা যা বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধি করি, আপনারা তা যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেন। এমনকি, আমরা যা দেখি, আপনারা সময় সময় তা ব্যক্ত করতেও অক্ষম; তাই এটাই স্পষ্ট যে, আপনাদের যুক্তি-বিশিষ্ট সিদ্ধান্তের চেয়ে স্বকর্মসূচিত বিশ্বাস উত্তম।'

৭৮। 'তবে খ্রিষ্টিয়ান এই আমরা গ্রীক তর্কবিদ্যার একটা প্রজ্ঞায় নিহিত রহস্যের অধিকারী নই, কিন্তু যিশুখ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর দ্বারা আমাদের মঞ্জুর করা একটা প্রতাপেই নিহিত রহস্যের অধিকারী। এই সিদ্ধান্ত যে সত্য, তার প্রমাণ হিসাবে আপনারা এখন নিজেরাই এটাই দেখুন যে, উচ্চশিক্ষার অধিকারী না হয়েও আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কেননা তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত কিছুর উপরে বিস্তৃত তাঁর পূর্বজ্ঞানের কথা জানি। এবং আমাদের বিশ্বাস যে কার্যকর, এটার প্রমাণ হিসাবে আপনারা এখন এটা

দেখুন যে, আমরা সেই আস্থার উপরেই নির্ভর করি যা খ্রিষ্টে রয়েছে, কিন্তু আপনারা আপনাদের তর্কযুক্তির শব্দ-সংগ্রামের উপর নির্ভর করেন। আপনাদের মাঝে প্রতিমাগুলোর দর্শন বাতিল করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সর্বস্থানে বিস্তৃত হচ্ছে। এবং আপনাদের তর্কযুক্তি ও যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে আপনারা কারও মন গ্রীক ধারণায় জয় করতে পারেন না, কিন্তু আমরা খ্রিষ্টে বিশ্বাস শিক্ষাদানের মাধ্যমে যত কুসংস্কার থেকে আপনাদের মুক্ত করি, কেননা সবাই এটা মেনে নিচ্ছে যে, খ্রিষ্টই ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্র। আপনাদের অলঙ্কারপূর্ণ ভাষ্যের মাধ্যমে আপনারা খ্রিষ্টের দেওয়া শিক্ষা প্রতিরোধ করেন না, কিন্তু আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টের নাম করার মাধ্যমে সেই সমস্ত অপদূত তাড়িয়ে দিই যেগুলোকে আপনারা ঈশ্বর বলে ভয় পান। এবং যেখানে ক্রুশের চিহ্ন রয়েছে, সেখানে জাদুবিদ্যা দুর্বল ও জাদুকর্ম ফলহীন।’

৭৯। ‘তবে, আমাদের বলুন, আপনাদের সেই সমস্ত দৈববাণী এখন কোথায়? মিশরীয়দের জাদুমন্ত্র কোথায়? মন্ত্রজালিকদের ঘটিত বিভ্রম কোথায়? যে সময়ে খ্রিষ্টের ক্রুশ এসেছিল, সেসময় ছাড়া কবেই বা এসমস্ত কিছু নিঃশেষিত হল ও শক্তিহীন হল? তবে ক্রুশই কি সেই বস্তু যা মজার যোগ্য? নাকি আপনাদের এই সমস্ত কিছুই বরং মজার যোগ্য যা আমরা নিঃশেষ করেছি ও দুর্বল বলে প্রমাণিত করেছি? কেননা এটাও বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আপনাদের ধর্ম কখনও নির্যাতিত হয়নি, ও শহরে শহরে মানুষদের মধ্যে তা এখনও সম্মানের বিষয়; অথচ আমাদের তত্ত্বসমূহ সমৃদ্ধি লাভ করছে ও আপনাদের ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি যদিও সর্বস্থানে প্রশংসিত ও সম্মানিত, তবু বিনাশের পথে চলছে; কিন্তু খ্রিষ্টের প্রতি যে বিশ্বাস ও তাঁর যে শিক্ষা আপনারা মজার বিষয় গণ্য করেন ও শাসনকর্তারা প্রায়ই নির্যাতন করে এসেছেন, জগৎ এখন সেই বিশ্বাস ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। কেননা ঈশ্বরজ্ঞান কবেই বা এত উজ্জ্বল হয়েছিল? কবেই বা আত্মসংযম ও কৌমার্য-সদ্‌গুণ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ পেয়েছিল? অথবা, যখন খ্রিষ্টের ক্রুশ এল, সেই সময় ছাড়া কবেই বা মৃত্যু এত অবজ্ঞার বিষয় হল? এবিষয়ে এমন কেউই সন্দেহ পোষণ করে না, যখন সে সেই সাক্ষ্যমরদের দেখে যারা খ্রিষ্টের খাতিরে মৃত্যু অবজ্ঞা করেন, ও যখন সে এমনটা দেখে যে, মণ্ডলীর চিরকুমারীরা খ্রিষ্টের খাতিরে নিজেদের দেহ শুচি ও নিষ্কলঙ্ক রাখেন।’

৮০। ‘ঈশ্বরকে উপাসনার জন্য যে কেবল খ্রিষ্টে আমাদের বিশ্বাসই প্রকৃত উপায়, তা দেখাবার জন্য উপরে আমার দেওয়া প্রমাণসমূহ যথেষ্ট। কিন্তু ওই দেখ! আপনারা আমাদের উক্তি থেকে তর্কযুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ খোঁজ করে এখনও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আমাদের ধর্মগুরু যেমন বলেছিলেন, আমরা গ্রীকদের *প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপরে* (ক) আমাদের প্রমাণ নির্ভর করাই না, বরং আমরা লোকদের মন জয় করি সেই বিশ্বাস দ্বারা যা স্পষ্টভাবেই যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের আগে আসে। দেখুন, এখানে বেশ কয়েকজন রয়েছে যারা অপদূতগ্রস্ত’ (কেননা সেখানে এমন কেউ কেউ ছিল যারা অপদূতদের দ্বারা পীড়িত বলেই এসেছিল, এবং সেই লোকদের মাঝে তাদের এনে তিনি বললেন), আপনারা হয় আপনাদের তর্কযুক্তি, না হয় আপনাদের যেকোন নৈপুণ্য দ্বারা বা আপনাদের পছন্দমত জাদুমন্ত্র দ্বারা আপনাদের দেবমূর্তিগুলোকে আহ্বান করে এদের শুচীকৃত করুন। অথবা, আপনারা এতে অক্ষম হলে, তবে আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের যুদ্ধ শেষ করে দিন ও খ্রিষ্টের ক্রুশের পরাক্রম লক্ষ করুন।’ এবং এসমস্ত কথা বলার পর তিনি খ্রিষ্টকে আহ্বান করলেন ও যারা কষ্টে ভুগছিল, ক্রুশের চিহ্ন দ্বারা তাদের দু’বার ও তিনবার চিহ্নিত করলেন। সাথে সাথে সেই লোকেরা উঠে দাঁড়াল ও একেবারে সুস্থ হল, এবং চেতনা ফিরে পেয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিল। এবং তথাকথিত সেই দার্শনিকেরা বিস্মিত হলেন ও সেই মানুষের প্রজ্ঞা বিষয়ে ও যে আশ্চর্যকাজ সাধিত হয়েছিল সেবিষয়েও সত্যিকারে বিহ্বল হলেন। কিন্তু আন্তনি বললেন, ‘আপনারা কেন এতে বিস্মিত হন? আমরা যে তা করছি এমন নয়, সেই খ্রিষ্টই তা করছেন যিনি তাদেরই মধ্য দিয়ে এসমস্ত কিছু সাধন করেন যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাসী। তাই আপনারাও বিশ্বাস করুন, তবেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, আমাদের যা আছে তা কথনে নৈপুণ্য নয়, কিন্তু আমাদের যা আছে তা হলো সেই বিশ্বাস যা ভালবাসার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টের উদ্দেশে কার্যকর। আপনরাও তেমনটার অধিকারী হলে তবে তর্কযুক্তির মাধ্যমে আর কোন প্রমাণ খোঁজ করবেন না, কিন্তু এ উপলব্ধি করবেন যে, খ্রিষ্টে বিশ্বাসই যথেষ্ট।’ তেমনটাই ছিল আন্তনির উচ্চারিত কথা; এবং তাঁরা তাঁর বিষয়ে বিস্মিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করার পর ও তাঁরা যে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন তাও স্বীকার করার পর চলে গেলেন।

৮১। আন্তনির খ্যাতি শাসনকর্তাদের কাছে পর্যন্তও বিস্তার লাভ করল। যখন আউগুস্তুস কনস্তান্তিনুস এবং তাঁর পুত্রদ্বয় আউগুস্তুস কনস্তান্তিউস ও আউগুস্তুস কনস্তান্ত এসমস্ত বিষয় অবগত হলেন, তখন তাঁরা তাঁর কাছে পিতারই কাছে যেন পত্র লিখলেন ও তাঁর কাছ থেকে উত্তর পাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন (ক)। তথাপি তিনি পত্র লেখার ব্যাপারে তত গুরুত্ব দিলেন না, গৃহীত পত্রতেও তত আনন্দ প্রকাশ করলেন না; বরং সম্রাট তাঁকে লিখবার আগে তিনি যেমন ছিলেন, সেইমত থাকলেন। যখন পত্রগুলো তাঁর কাছে আনা হল, তিনি সন্ন্যাসীদের ডেকে বললেন, 'একজন সম্রাট যে আমাদের কাছে পত্র লিখে পাঠান তেমনটা বিস্ময়কর বলে গণ্য করো না, কেননা তিনি মানুষ। তোমরা বরং এতে বিস্মিত হও যে, ঈশ্বর মানবজাতির জন্য বিধান লিখলেন ও তাঁর আপন পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে কথা বললেন' (খ)। তিনি পত্রগুলো না পাওয়াই ভাল মনে করলেন, একথা বলে যে, তেমন কিছুতে যে কেমন উত্তর দেওয়া উচিত তা তিনি জানতেন না। কিন্তু যেহেতু শাসনকর্তাগণ ছিলেন খ্রিষ্টিয়ান ও পাছে তাঁরা কেমন যেন অবজ্ঞাত হয়ে অপমানিত হন, সেজন্য সন্ন্যাসীদের চাপে তিনি সেই পত্রগুলো পড়ার অনুমতি দিলেন। এবং খ্রিষ্টের প্রতি তাঁদের উপাসনার জন্য তাঁদের প্রশংসা করে উত্তর লিখলেন ও পরিত্রাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শও অর্পণ করলেন; অর্থাৎ, তাঁরা যেন এ বর্তমান বাস্তবতাকে মহৎ গণ্য না করেন, বরং আসন্ন বিচারের কথা বিবেচনা করেন ও এমনটা স্বীকার করেন যে, খ্রিষ্টই একমাত্র প্রকৃত ও অনন্তকালস্থায়ী শাসনকর্তা। তিনি তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন মানবদরদী হন এবং ন্যায়ের প্রতি ও গরিবদের প্রতি মনোযোগী হন। তাঁর উত্তর পেয়ে সম্রাটগণ আনন্দিত হলেন। তাই তিনি সকলের প্রীতির পাত্র হলেন, ও সকলে তাঁকে পিতা বলে গণ্য করতে বাসনা করতেন।

৮২। তবে, তেমন মানুষ বলে পরিগণিত হয়ে ও যারা তাঁকে খুঁজত তাদের এইভাবে উত্তর দিয়ে তিনি পুনরায় সেই অভ্যন্তরীণ পর্বতে ফিরে গেলেন ও যথারীতি নিজের সাধনা করে চললেন। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাদের সঙ্গে তিনি বহুবার হতবাক্ হয়ে পড়তেন, যেইভাবে দানিয়েল পুস্তকে লেখা রয়েছে (ক)। কিছুক্ষণ পরে,

তিনি তাঁর সঙ্গী ভ্রাতাদের সাথে যা বলছিলেন, সেবিষয়ে পুনরায় কথা বলতে শুরু করতেন; এবং তাঁর সঙ্গীরা এতে সচেতন ছিলেন যে, তিনি কোন না কোন দর্শন পাচ্ছিলেন। কেননা যখন তিনি পর্বতের অভ্যন্তরে ছিলেন, তখন মিশরে যা ঘটছিল তাও দেখতে পেতেন। এবং এবিষয়টা তিনি সেই বিশপ সেরাপিওনকে [খ] বলেছিলেন যিনি তাঁর সঙ্গে ভিতরে ছিলেন ও দর্শনে মগ্ন আন্তনিকে লক্ষ করছিলেন। একদিন তিনি কাজ করছেন, এমন সময়, বলতে গেলে, তাঁর ভাবসমাধি হল, ও দর্শনের সময়ে তিনি যথেষ্ট হাহাকার করছিলেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁর সঙ্গীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি কাঁপতে কাঁপতে বিলাপ করলেন; পরে প্রার্থনা করলেন ও হাঁটু পাত করে বহুক্ষণ ধরে সেইমত থাকলেন। যখন সেই বৃদ্ধজন উঠে দাঁড়ালেন, তখন কাঁদছিলেন, এবং সেসময়ে তাঁর সঙ্গীরা কাঁপতে লাগল ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর যে কি হচ্ছিল তা জানবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। তাঁরা এব্যাপারে তাঁকে এত চাপ দিচ্ছিল যে অবশেষে তিনি বাধ্য হয়ে কথা বললেন। তাই যথেষ্ট হাহাকার করতে করতে তিনি বললেন, 'হে আমার সন্তানেরা, দর্শনে যা ঘটল, তা বাস্তব রূপ লাভ করার আগে তোমাদের পক্ষে মরা অনেক ভাল।' তারা পুনরায় চাপ দিলে তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, 'ক্রোধ মণ্ডলীকে ধরে ফেলতে যাচ্ছে; হ্যাঁ, মণ্ডলীকে এমন মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে যারা যুক্তিক্ষমতাহীন পশুর মত। কেননা আমি প্রভুর গৃহের বেদি দেখলাম, ও সেটার চারদিকের বৃত্তের মাঝে এক দল খচ্চর দাঁড়িয়ে ভিতরের সমস্ত কিছুতে লাথি মারছিল, ঠিক এমন লাথি মারার মত যা তখনই ঘটে যখন জন্তুরা বিদ্রোহ করতে করতে চারদিকে লাফ দেয়।' তিনি বলে চললেন, 'আমি কেমন হাহাকার করছিলাম, তা তোমরা অবশ্যই জানতে, কেননা এমন কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম যা বলল, "আমার বেদি কলুষিত করা হবে।"' সেই বৃদ্ধজন তেমনটা বলেছিলেন, ও দুই বছর পর আরিউসপন্থীদের এই বর্তমান আক্রমণ শুরু হল ও সেই গির্জাগুলো-দখল আরম্ভ হল যা চলাকালে সেই আরিউসপন্থীরা পবিত্র পাত্রগুলো জোর করে কেড়ে নিয়ে এমনটা করল যেন পৌত্তলিকেরাই সেই পাত্রগুলো হাতে করে বহন করে। তারা পৌত্তলিকদের তাদের দোকান থেকেও ছিনিয়ে নিয়ে তাদের নিজেদের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল, এবং তাদের চোখের সামনে ভোজনপাটের উপরে যা খুশি তাই করল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, লাথি মারা

খচ্চরের দল সংক্রান্ত দর্শন আন্তনিকে আগে থেকে সেটাই জানিয়েছিল যা এখন ঘটছে তথা সেই আরিউসপন্থীদের ব্যবহার যারা এসময় পশুদের মত অযুক্তিকর ভাবে ঘটাচ্ছে। কিন্তু যখন তিনি সেই দর্শন পেয়েছিলেন, তখন নিজের সঙ্গীদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ‘সন্তানেরা, হতাশ হয়ো না। কেননা প্রভু যেমন ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি তেমনি পুনরায় নিরাময় করবেন। এবং মণ্ডলী পুনরায় তার নিজের সৌন্দর্য শীঘ্রই অর্জন করবে ও আগের মত উজ্জ্বল হবে। তোমরা দেখতে পাবে, নির্যাতিত যারা তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, অভক্তি তার নিজের আস্তানায় বিতাড়িত, ও ভক্তিময় বিশ্বাস সর্বস্থানে সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু সাবধান, আরিউসপন্থীদের সঙ্গে নিজেদের কলুষিত করো না, কেননা সেই শিক্ষা প্রেরিতদূতদের কাছ থেকে নয়, অপদূতদেরই কাছ থেকে ও তাদের পিতা সেই দিয়াবলের কাছে থেকে উদ্গত; হ্যাঁ, সেই শিক্ষা অনুর্বর, যুক্তিহীন ও উপলব্ধি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, ঠিক সেই যুক্তিক্ষমতাহীন খচ্চরের দলের মত।

৮৩। এটাই আন্তনির বাণী ও কর্মকাণ্ড। এবং তেমন ধরনের বিস্ময়কর কাজ যে একটি মানুষ দ্বারা সম্পাদিত হল, সেবিষয়ে আমাদের অবিশ্বাসী হতে নেই। এটা হলো সেই ত্রাণকর্তার অঙ্গীকার যিনি বলেন, *যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে ওখানে সরে যাও, আর তা সরে যাবেই; তোমাদের পক্ষে অসাধ্য কিছুই থাকবে না* (ক), আরও, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচনা কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন* (খ)। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি আপন শিষ্যদের ও যারা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরও বলেন, *পীড়িতদের নিরাময় কর, … অপদূত তাড়াও; তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর* (গ)।

৮৪। বাস্তবিকই আন্তনি কোন আদেশ না দিয়ে, কিন্তু প্রার্থনা করার মাধ্যমে ও খ্রিষ্টের নাম করার মাধ্যমেই নিরাময় করতেন; তাতে সবার কাছে এ স্পষ্ট ছিল যে, তিনিই যে তেমনটা করছিলেন তা নয়, কিন্তু প্রভুই আন্তনির মাধ্যমে নিজের মঙ্গলময়তা কার্যকর করছিলেন ও দুঃখক্লিষ্ট যারা তাদের নিরাময় করছিলেন। কেবল প্রার্থনা ও সেই সাধনাই আন্তনির ছিল, যার খাতিরে তিনি পর্বতের অভ্যন্তরে বসবাস করলেন ও ঐশবিষয়গুলো

সন্দর্শনে আনন্দ ভোগ করতেন, কিন্তু এতে কষ্ট ভোগ করতেন যখন তত সংখ্যক লোকদের আগমনের কারণে অস্থির হতেন; তখন বাইরেকার পর্বতে যেতে বাধ্য হতেন। কেননা সকল বিচারকগণও অনুরোধ করছিলেন যেন তিনি পর্বত থেকে নেমে আসেন, কেননা যে মামলাকারীরা তাঁদের পিছনে পিছনে যেত, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবু তাঁরা অনুরোধ করছিলেন যেন তিনি আসেন ও তাঁরা যেন তাঁকে দেখতে পান। তাই তিনি সরে গেলেন ও তাঁদের কাছে যেতে অসম্মত হলেন, কিন্তু তাঁরা এব্যাপারে স্থিতমূল থাকলেন, এমনকি, যারা প্রহরীদের হেফাজতে ছিল তাদের পাঠিয়ে দিলেন, যেন কমপক্ষে তাদের খাতিরেই তিনি নেমে আসতে সম্মত হন। তাঁদের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে ও লোকেরা হাহাকার করছে তা দেখে তিনি বাইরেকার পর্বতে চললেন। এবং এই উপলক্ষেও তাঁর কষ্ট উপকারী হল, কেননা তাঁর আগমন অনেকের সুবিধা ও কল্যাণের জন্য কার্যকর হল। তিনি বিচারকদের সহায়তা করতেন এমন পরামর্শ দিয়ে যেন তাঁরা সবকিছুর ঊর্ধ্বে ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেন; আরও, তাঁরা যেন ঈশ্বরকে ভয় করেন ও এটা উপলব্ধি করেন যে, তাঁরা যে বিচারে বিচার করবেন, সেই একই বিচারে তাঁদের নিজেদেরও বিচার করা হবে [ক]। তাসত্ত্বেও তিনি পর্বতের অভ্যন্তরে তাঁর জীবনধারাকেই সবকিছুর চেয়ে ভালবাসতেন।

৮৫। আর এক সময়েও তিনি, যাদের দরকার ছিল, তাদের এধরনের চাপের অধীন হলেন, এবং সেনাদলপতি বহু পীড়াপীড়ির পর তাঁকে আসতে অনুরোধ করলেন। তিনি এলে পরিত্রাণ সংক্রান্ত কয়েকটা উক্তি ও যাদের সাহায্য দরকার ছিল সেবিষয়ে কয়েকটা পরামর্শ দেবার পর চলে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তথাকথিত সেই সম্ভ্রান্ত বংশের লোক যখন তাঁকে থাকতে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন যে, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং সুন্দর শালীন হাসিমুখ দেখিয়ে সেই সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের মন জয় করে বললেন, 'অধিক সময়ে স্থলে ফেলে রাখা মাছ যেমন মরে, তেমনি আপনার সঙ্গে বিলম্ব ক'রে ও সময় কেটে সন্ন্যাসীরা নিজেদের সাধনায় শিথিল হয়। তাই, মাছ যেমন সমুদ্রের দিকে, তেমনি আমাদের পর্বতের দিকে ছুটে যেতে হয়, যাতে করে আপনাদের সঙ্গে থেকে গেলে আমরা আমাদের অভ্যন্তরের

বিষয়গুলো ভুলে না যাই।’ তাঁর কাছ থেকে একথা ও অন্য অন্য কথা শুনে ও স্তম্ভিত হয়ে সেই দলপতি বললেন, ‘সত্যিই, এই মানুষ ঈশ্বরের দাস, কেননা কেমন করে সাধারণ একটা মানুষ তেমন মহৎ উপলব্ধি-শক্তির অধিকারী হতে পারে যদি না সে ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র না হয়?’

৮৬। বালাকিওস নামক আর একজন সেনাদলপতি ছিলেন যিনি জঘন্য সেই আরিউসপন্থীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে খ্রিষ্টিয়ান এই আমাদের তীব্রভাবে নির্যাতন করতেন। এবং যেহেতু তিনি এত নির্মম ছিলেন যে, তিনি চিরকুমারীদের মারতেন ও সন্ন্যাসীদের বস্ত্রহীন করে কশাঘাত করতেন, সেজন্য আন্তনি তাঁর কাছে লোক পাঠালেন; এবং যে পত্র তিনি লিখেছিলেন, সেটার মূল কথা ছিল এ: ‘আমি দেখতে পাচ্ছি, [ঈশ্বরের] ক্রোধ আপনার উপরে আসছে, তাই খ্রিষ্টিয়ানদের নির্যাতন করাটা বন্ধ করে দিন, পাছে সেই ক্রোধ আপনাকে ধরে ফেলে; কেননা সেই ক্রোধ এক্ষুণি আপনার উপরে নেমে আসছে।’ কিন্তু সেই বালাকিওস হেসে পত্রটার উপর থুথু ফেলে তা মাটিতে ফেলে দিলেন ও পত্রের বাহকদের অপমান করতে করতে আন্তনিকে একথা বলতে আদেশ করলেন, ‘যেহেতু তুমি তোমার সন্ন্যাসীদের নিয়ে ব্যস্ত, সেজন্য আমি এখন তোমাকেও খুঁজে বের করব।’ কেননা সেই বালাকিওস ও মিশরের প্রদেশপাল সেই নেস্তরিওস আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রথম বিরতি-স্থলে যেতে উদ্যত ছিলেন যার নাম খাইরেউ, এবং দু’জনে ঘোড়ায় চড়ছিলেন। ঘোড়া দু’টো ছিল সেই বালাবিওসের, ও যত ঘোড়া তিনি প্রশিক্ষিত করেছিলেন, সেই দু’টো ছিল সবচেয়ে নম্র। কিন্তু স্থলে পৌঁছবার আগে ঘোড়া দু’টো এক একটার গায়ে সেইভাবে লাফালাফি করতে লাগল যেভাবে ঘোড়া এমনিই করে, ও হঠাৎ করে নেস্তরিওস যে ঘোড়ায় চড়ছিলেন, সেই অধিক নম্র ঘোড়া বালাকিওসকে কামড় দিয়ে মাটিতে ফিলে দিল ও আক্রমণ করল; সেই ঘোড়া দাঁত দিয়ে তাঁর উরু এমন গুরুতর ভাবে দীর্ণ-বিদীর্ণ করল যে, তাঁকে অবিলম্বে শহরে ফিরিয়ে আনতে হল, কিন্তু তিন তিন দিনের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। সবাই তাতে আশ্চর্য হলো যে, আন্তনি যা আগে থেকে ঘোষণা করেছিলেন, তা এত শীঘ্রই পূর্ণতা লাভ করল।

৮৭। যারা নির্মম ছিল, তিনি এইভাবে তাদের সতর্ক বাণী দিতেন। কিন্তু যারা তাঁর কাছে যেত, সেই অন্যান্যদের তিনি এমনভাবে সতর্ক বাণী দিতেন যে, তারা নিজেদের মামলা-মকদ্দমা ভুলে গিয়ে তাদেরই সুখী বলত যারা জাগতিক জীবন প্রত্যাহার করত। এবং যারা অন্যায্যতার শিকার ছিল, তিনি তাদের এত দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করতেন যে, এমনটা ভাবা সম্ভব ছিল, সেই অন্যান্যরা নয়, তিনি নিজেই ছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত জন। আরও, তিনি সকলের উপকার করায় এত দক্ষ ছিলেন যে, যারা সৈন্যগিরি করত ও যারা সম্পদশালী, তাদের মধ্যে অনেকেই জীবনের বোঝা বিসর্জন দিয়ে সেই মুহূর্ত থেকে সন্ন্যাসী হত। ব্যাপারটা এমন, তিনি যেন মিশরকে দেওয়া এক চিকিৎসক ছিলেন। কেননা কোন্ দুঃখার্ত মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে আনন্দিত মনে ফিরে যায়নি? মৃতজনের জন্য বিলাপ করত এমন কোন্ মানুষ অবিলম্বে নিজের মনের কষ্ট ছেড়ে দেয়নি? ক্রোধান্বিত কোন্ মানুষ তাঁকে দেখতে গিয়ে শান্তি-সম্প্রীতির মনোভাবে পরিণত হয়নি? কোন্ গরিব মানুষ নিঃশেষিত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর কথা শুনে ও তাঁকে দেখে ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করেনি ও নিজের দরিদ্রতায় সান্ত্বনা পায়নি? কোন্ সন্ন্যাসী নিরাশ হয়ে তাঁর কাছে গেলে মনে আরও দৃঢ় হয়ে উঠল না? কোন্ যুবক মানুষ পর্বতে গিয়ে ও আন্তনিকে দেখে সাথে সাথেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিসর্জন দিয়ে আত্মসংযম ভালবাসেনি? অপদূত দ্বারা পরীক্ষিত কোন্ মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে পুনরায় আরাম পায়নি? মর্মপীড়ায় পীড়িত কোন্ মানুষ তাঁর কাছে গিয়ে নিজের মন শান্তশিষ্ট অবস্থায় পায়নি?

৮৮। আন্তনির কৃচ্ছ্র সাধনায় এটাও মহৎ ব্যাপার ছিল যে, আগে যেমন বলেছি, আত্মাগুলোকে নির্ণয়-শক্তির অধিকারী হয়ে তিনি সেগুলোর গতি চিনতে পারতেন, ও জানতেন এক একটা আত্মা কোন্ কোন্ গতির প্রতি আকর্ষিত ও আসক্ত। তিনি যে সেই মন্দাত্মাগুলোর মজার বস্তু হতে সহ্য করতেন না, তা শুধু নয়, কিন্তু যারা মর্মপীড়িত ছিল, তাদের কাছে সৎসাহস অর্পণ করে তিনি শেখাতেন তারা কেমন করে অপদূতদের মতলব উল্টিয়ে দিতে পারবে, কেননা যে অপদূতেরা তেমন কাজ সম্পাদন করত, তিনি তাদের দুর্বলতা ও ফন্দি-ফিকির স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তাই যে কেউ তাঁর কাছে

যেত, সে কেমন যেন তাঁর দ্বারা লড়াইয়ের জন্য তৈলসিক্ত হয়েই দিয়াবল ও তার অপদূতদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধ সাহস ভরে ব্যবহার করে পর্বত থেকে নেমে যেত। এবং নিজ নিজ যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রত্যাশী কতই না যুবতীরা দূর থেকেও এমনিই আন্তনিকে দে'খে খ্রিষ্টের জন্য কুমারী হয়ে থাকল না? এবং বিদেশ থেকেও লোকেরা তাঁর কাছে আসত, এবং অন্যান্যদের সঙ্গে সহায়তা পেয়ে পিতা দ্বারা প্রেরিত সন্তানই যেন বাড়ির দিকে রওনা হত। বাস্তবিকই, তিনি যে ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন, সেই সকলে পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল তাঁর কথা স্মরণ করায়ই তাঁর উপদেশ ও সতর্কবাণী আঁকড়িয়ে ধরে একে অন্যকে সান্ত্বনা দেয়।

আন্তনির বিদায়, শেষ বাণী ও মৃত্যু

৮৯। তাঁর জীবনের সমাপ্তি কেমন হলো, আমার পক্ষে সেই বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও তোমাদের পক্ষে, ইচ্ছা করলে, তা শোনা সমীচীন, কেননা তাঁর মৃত্যুও এমন বিষয় যা অনুকরণযোগ্য।

তিনি নিজের অভ্যাসমত যেভাবে করতেন, সেইভাবে সেইদিনও তিনি সেই সন্ন্যাসীদের দেখাশোনা করতে এসেছিলেন যারা বাইরেকার পর্বতের অভ্যন্তরে বসবাস করত; এবং [ঈশ্বরের] পূর্বজ্ঞান দ্বারা নিজের মৃত্যু যে আসন্ন তা জানতে পেরে তিনি ভ্রাতাদের উদ্দেশ করে একথা বললেন, 'এ তোমাদের কাছে আমার শেষ আগমন, এবং আমি এমনটা মনে করি না যে, আমরা এজীবনে আবার একে অন্যকে দেখতে পাব। এখন সেসময় এসেছে যখন আমাকে স্থানান্তর করতে হবে, কেননা আমার বয়স প্রায় একশ' কুড়ি বছর।' তাঁর এই কথা শুনে তারা চোখের জল ফেলল ও সেই বৃদ্ধজনকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে লাগল। কিন্তু এমন একজনেরই মত যে বিদেশী কোন শহর ছেড়ে স্বদেশে জাহাজ-যাত্রা করছে তিনি সেইভাবে খুশি মনে কথা বলছিলেন ও তাদের উপদেশ দিলেন যেন তারা নিজেদের শ্রমেও নিরাশ না হয়, সাধনা সম্পাদনেও শিথিল না হয়, বরং প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেই যেন, সেইভাবে যেন জীবনযাপন করে। তিনি তাদের বললেন, 'আগেও যেমন বলেছি, বাজে চিন্তা-ভাবনা থেকে প্রাণকে সুরক্ষিত করায় আগ্রহী হও ও পবিত্রজনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর, কিন্তু বিশ্বাসে

বিচ্ছিন্ন সেই মেলেতিউস-পন্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না, কেননা তোমরা তো জান তারা কেমন অনিষ্টকর ও অভক্তিময় নাম অর্জন করেছে। আরিউসপন্থীদেরও সঙ্গে তোমাদের কোন সহভাগিতা থাকবে না, কেননা তাদের অভক্তি সকলের কাছে প্রকাশ্য। এবং তাদের অভিমত সমর্থনকারী বিচারকদের দেখলে তোমরা অস্থির হয়ো না, কেননা সেসব কিছু শেষ হবেই, তাদের দম্ভ এমন কিছু যা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। তোমরা বরং তাদের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের শুচী রাখ ও পিতৃগণের ঐতিহ্য ও বিশেষভাবে আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্টে সেই বিশ্বাস রক্ষা কর যা তোমরা শাস্ত্র থেকে শিখেছ ও আমার দ্বারাও তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

৯০। যখন ভ্রাতাগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ও সেইখানে মৃত্যুবরণ করার জন্য তাঁকে চাপ দিল, তখন তিনি নানা কারণে তাতে অসম্মত হলেন; তেমনটা তিনি নীরব থাকায় ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু বিশেষভাবে এই কারণে অসম্মত হলেন, তথা, মিশরীয়রা তাদের সুযোগ্য মৃত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে পবিত্র সাক্ষ্যমরদেরই নানাবিধ সমাধি অনুষ্ঠান দ্বারা সম্মানিত করতে ও তাঁদের দেহ কাপড়ে জড়াতে ভালবাসে; তাঁদের দেহ তারা মাটিতে না দিয়ে খাটিয়ার উপরে তুলে দেয় ও নিজের ঘরে রাখে এমনটা ভেবে যে, তেমনটা করায় তারা পরলোকগত ব্যক্তিদের সম্মান করে(ক)। এবিষয়ে আন্তনি বহুবার একজন বিশপকে অনুরোধ করেছিলেন যেন এক্ষেত্রে লোকদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং একইপ্রকারে নিয়োগপ্রাপ্ত নয় এমন মানুষদের সংশোধন করেছিলেন ও স্ত্রীলোকদের তিরস্কার করেছিলেন; তিনি বলছিলেন, 'তেমনটা করা বিধেয়ও নয়, শ্রোদ্ধাজনকও নয়। পিতৃকুলপতিদের ও নবীদের দেহ আজও কবরে সংরক্ষিত রয়েছে, প্রভুর নিজের দেহও কবরে রাখা হয়েছিল, ও সেটার উপরে দেওয়া একটা পাথর তা লুকিয়ে রাখল যতক্ষণ না তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন।' তেমনটা বলে তিনি দেখালেন যে, মৃত ব্যক্তি যতই পবিত্র হোন না কেন, যে কেউ তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দেহকে কবর দেয় না, সে বিধান লঙ্ঘন করে। কেননা প্রভুর দেহের চেয়ে মহত্তর ও আরও বেশি পবিত্র কিবা আছে? সেসময় যারা তাঁর একথা শুনেছিল, তারা সেসময়

থেকে নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের কবর দিয়েছিল ও সুশিক্ষা পেয়েছিল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিল।

৯১। কিন্তু আন্তনি এই প্রথা বিষয়ে সচেতন হওয়ায় ও এমনটা ভয় ক'রে যে তারা তাঁর দেহের জন্য সেই প্রথা পালন করতে পারে, দেরি না করে বাইরেকার পর্বতে নিবাসী সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে চলে গেলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ পর্বতে যথারীতি থাকবার জন্য প্রবেশ করলেন, ও অল্প মাসের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যারা তাঁর সঙ্গে ছিল (সেখানে সেই দু'জন ছিল [ক] যারা সেখানে, ভিতরে, পনের বছর ধরে সাধনা ক'রে ও আন্তনির বয়সের খাতিরে তাঁর দেখাশোনা ক'রে সেখানে থেকে গেছিল) তিনি তাদের ডেকে বললেন, 'যেইভাবে লেখা আছে [খ], আমি সেই অনুসারে পিতৃগণের পথে যাচ্ছি, কেননা নিজেই দেখতে পাচ্ছি প্রভু আমাকে ডাকছেন। সতর্ক থাক, তোমার দীর্ঘ সাধনা নষ্ট করো না, কিন্তু নব সূচনাই ক'রে যেন, তোমাদের উদ্দীপনা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাক। তোমরা তো সেই প্রবঞ্চনাকারী অপদূতদের জান; হ্যাঁ, তোমরা জান তারা কেমন প্রচণ্ড, যদিও প্রভাবে তারা এখন দুর্বল। সুতরাং তাদের ভয় পেয়ো না, বরং সবসময়ই খ্রিষ্ট থেকে অনুপ্রেরণা অর্জন কর ও সেই খ্রিষ্টে আস্থাবান হও। একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হয়ে ও আমাদের উপদেশ থেকে যা শুনেছ, তা মনে রেখে, তোমরা প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছ যেন, ঠিক সেইভাবেই জীবনযাপন কর। এবং [বিশ্বাসে] বিচ্ছিন্ন লোকদের সঙ্গে, এবং অবশ্যই ভ্রান্তমতবাদী সেই আরিউসপন্থীদেরই সঙ্গে যেন তোমাদের কোন সহভাগিতা না থাকে। কেননা তোমরা জান যে, তাদের খ্রিষ্ট-বিরোধিতা ও অদ্ভুত ভ্রান্তিময় শিক্ষার কারণে আমিও তাদের যুক্তি কেমন খণ্ডন করেছি। তোমরা বরং মিত্রই যেন প্রথমত প্রভুতে ও পরে পবিত্রজনদের মধ্যে একে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ হবার জন্য সবসময় লড়াই করে থাক, যেন মৃত্যুর পরে তারা বন্ধু ও সঙ্গীই যেন *সেই অনন্ত তাঁবুতে তোমাদের গ্রহণ করে নেয়* [গ]। এবিষয়ে বিবেচনা কর ও সেদিকে মন দাও, এবং যদি তোমরা আমার প্রতি যত্নশীল হও ও আমাকে তোমাদের পিতা বলে মনে রাখ, তাহলে কাউকেই আমার দেহ মিশরে নিয়ে যেতে দিয়ো না, পাছে তারা তা নিজেদের ঘরে সাজায়। এজন্যই আমি পর্বতের অভ্যন্তরে গিয়েছিলাম ও এখানে ফিরে

এসেছিলাম। যারা তেমন প্রথা পালন করে, তোমরা তো জান আমি তাদের কেমন সংশোধন করেছিলাম ও তেমন প্রথা বন্ধ করতে আজ্ঞা করেছিলাম। সুতরাং, তোমরা নিজেরা অনুষ্ঠানটা সম্পাদন কর ও আমার দেহ মাটিতে দাও। এবং আমার এই কথা তোমরা গোপন রাখ, যেন তোমরা ছাড়া অন্য কেউই সেই স্থান জানতে না পারে। কেননা মৃতদের পুনরুত্থানে আমি ত্রাণকর্তার কাছ থেকে পুনরায় আমার দেহ অক্ষয়শীল অবস্থায় গ্রহণ করব। আমার কাপড়-চোপড় ভাগ ভাগ করে বিতরণ কর। তোমরা আমার সেই ভেড়ার চামড়ার কাপড় ও যে আলোয়ানে আমি এখন শুয়ে আছি, তা বিশপ আথানাসিউসকে দাও, তিনিই তো সেটা আমাকে নতুন অবস্থায় দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সেটা ইতিমধ্যে জরাজীর্ণ করেছি। এবং অপর ভেড়ার চামড়ার কাপড় বিশপ সেরাপিওনকে দাও; নিজেদের জন্য তোমরা আমার সেই লোমজাতীয় কাপড় রাখ। এবং এখন, হে সন্তানেরা, ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুন, কেননা আন্তনি চলে যাচ্ছে ও তোমাদের সঙ্গে আর নেই।’

৯২। একথা বলার পর তারা তাঁকে আলিঙ্গন করল, তিনি পা দু’টো উচ্চ করলেন, ও তাঁর কাছে আসা এমন বন্ধুদের দে’খে যেন, ও তাদের দ্বারা গৃহীত হচ্ছিলেন যেন, (কেননা তিনি সেখানে শুয়ে থাকতে তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল) তিনি মারা গেলেন ও পিতৃগণের কাছে উপনীত হলেন। পরে, তিনি যে আদেশ তাদের দিয়েছিলেন, সেই দু’জন সেই অনুসারে প্রস্তুতি কর্ম সম্পাদন করল ও দেহটাকে মুড়িয়ে তা মাটিতে দিল; এবং সেই দেহ যে কোথায় লুকিয়ে রাখা হল, সেই দু’জন ছাড়া তা কেউই জানে না। এবং যাঁরা ধন্য আন্তনির ভেড়ার চামড়ার কাপড় ও জরাজীর্ণ সেই আলোয়ান পেয়েছিলেন, তাঁরা এক একজন তা মহৎ ধন বলে রক্ষা করে থাকেন। কেননা সেগুলোকে এমনিও দেখা, আন্তনিকে দেখার মত, ও সেগুলোকে পরা, সানন্দে তাঁর উপদেশ বহন করার মত।

সমাপ্তি

৯৩। এটা হলো দেহে আন্তনির জীবনের সমাপ্তি; এবং আমরা উপরে যা যা বর্ণনা করে এসেছি, তা হলো তাঁর সাধনার সূত্রপাত। যদিও এসমস্ত কিছু সেই মানুষের সদ্‌গুণের তুলনায় ক্ষুদ্র, তবু এথেকে তোমরা অনুমান করতে পার ঈশ্বরের মানুষ সেই আন্তনি কেমন ধরনের মানুষ ছিলেন, যিনি যৌবনকাল থেকে তেমন অসামান্য বয়স পর্যন্ত কৃচ্ছ্র সাধনার প্রতি নিজের উদ্দীপ্ত আগ্রহ বজায় রাখলেন। বার্ধক্যের খাতিরেও তিনি কখনও দামী খাদ্যের বাসনায় বশীভূত হননি, দেহের দুর্বলতার খাতিরেও কখনও পোশাকের ধরন পাল্টাননি, নিজের পাও জল দিয়ে ধোননি, অথচ সম্পূর্ণরূপে অক্ষত হয়ে থাকলেন। কেননা তাঁর চোখ ছিল উজ্জ্বল ও প্রবল, ও তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন। তিনি কোন দাঁত হারাননি; সেই বৃদ্ধজনের বিশিষ্ট বয়সের কারণে তাঁর দাঁত এমনিই মাড়ি পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে গেছিল। তিনি পায়ে ও হাতেও স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকলেন, ও যারা রীতিমত স্নান করে ও নানা ধরনের খাদ্য ও কাপড় ব্যবহার করে, তাদের তুলনায় তাঁকে উজ্জ্বল ও সমষ্টিগত দিক দিয়ে আরও বেশি বলবান মনে হচ্ছিল।

এবং তাঁর খ্যাতি যে সর্বস্থানে বিস্তৃত, সবাই যে তাঁকে বিস্ময়ের সঙ্গে সম্মান করে, ও যারা তাঁকে কখনও দেখেনি তারাও যে তাঁর দিকে চেয়ে আছে, তা হলো তাঁর সদ্‌গুণের প্রমাণ, ও তাঁর আত্মার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রমাণ। তাঁর লেখালেখি বা পৌত্তলিক প্রজ্ঞা বা অন্য যেকোনো শিল্পকর্মের জন্য নয়, কেবল তাঁর ঈশ্বরভক্তির জন্যই তিনি খ্যাতিমান হলেন। এসমস্ত কিছু যে ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহদান, তা কেউই অস্বীকার করবে না। কেননা যিনি একটা পর্বতে লুক্কায়িত অবস্থায় বসবাস করা সত্ত্বেও সবাই যে স্পেনে ও গাল্লিয়ায়, রোমে ও আফ্রিকায় তাঁর বিষয়ে কথা শুনল, তা আদৌ হতে পারে না, যদি-না যিনি নিজের মানুষদের সর্বত্রই জ্ঞাত করেন, সেই ঈশ্বর নিজেই আন্তনির সন্ন্যাস জীবনের সূত্রপাতে তাঁকে তেমন অঙ্গীকার না করে থাকেন। কেননা তাঁরা গুপ্ত অবস্থায় কাজ করলেও ও অনেকে বিস্মৃত হতে ইচ্ছা করলেও, তবু প্রভু তাঁদের প্রদীপের মত সবার কাছে প্রদর্শন করেন, যাতে করে যারা শোনে, তারা যেন এ জানতে পারে যে, [ঈশ্বরের] আজ্ঞাবলি জীবন-সংস্কারের জন্য প্রভাবশালী, ও এর ফলে তারা যেন সদ্‌গুণের পথে আগ্রহ যোগাড় করতে পারে।

৯৪। অতএব, তোমরা এখন এসমস্ত কিছু অন্যান্য ভ্রাতাদের কাছে পাঠ করে শোনাও, তারাও যেন জানতে পারে সন্ন্যাসীদের জীবন কেমন হওয়া উচিত, ও তারাও যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিষ্ট তাদেরই গৌরবান্বিত করেন যারা তাঁকে গৌরবান্বিত করে, ও যারা তাঁর সেবা করে, তিনি স্বর্গরাজ্যে তাদের চালনা করেন শুধু নয়, কিন্তু তারা নিজেদের লুক্কায়িত করলে ও প্রত্যাহার করতে চেষ্টা করলেও তিনি তাদের সদ্‌গুণ ও অন্যান্যদের প্রতি তাদের সহায়তা দানের জন্যই তাদের এখানেও সর্বস্থানে খ্যাতিমান ও জ্ঞাত করেন। এবং তেমনটা প্রয়োজন হলে তোমরা এটা পৌত্তলিকদেরও কাছে পাঠ করে শোনাও, যেন তারা এইভাবেও উপলব্ধি করতে পারে যে, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের পুত্র, ও তাছাড়া এও উপলব্ধি করতে পারে যে, যে খ্রিষ্টিয়ানেরা সত্যিকারে তাঁর সেবা করে ও ভক্তিভরে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে, তারা এমনটা প্রমাণিত করে যে, গ্রীকেরা যাদের ঈশ্বর মনে করে, সেই অপদূতেরা আসলে ঈশ্বর নয়, এবং তারা সেই অপদূতদের মানবজাতির প্রতারক ও বিনাশক বলে পায়ের নিচেও মাড়িয়ে দেয় ও তাদের দূরে বিতাড়িত করে, আমাদের প্রভু সেই যিশুখ্রিষ্টের দ্বারা, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

১ (ক) আদি ২৫:২৭ দ্রঃ।

২ (ক) মথি ৪:২০ দ্রঃ।

(খ) প্রেরিত ৪:৩৫ দ্রঃ।

(গ) মথি ১৯:২১ দ্রঃ।

(ঘ) মিশরীয় এক 'আরৌরা' পরিমাপ ছিল ১০০ বর্গ-হাত; ফলে তিনশটা আরৌরা জমি আনুমানিক ২০৭ একর জমির সমান।

৩ (ক) মথি ৬:৩৪ দ্রঃ।

(খ) গা ৪:১৮ দ্রঃ।

(গ) ২ থে ৩:১০।

(ঘ) ১ থে ৫:১৭ দ্রঃ।

৫ (ক) যোব ৪০:১১ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ২০ অধ্যায় দ্রঃ; এবং গ্রীকদের বিপক্ষে ৩০-৩১ দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১৫:১০ দ্রঃ।

৬ (ক) হোশেয়া ৪:১২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সাম ১১৮:৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৭ (ক) রো ৮:৩-৪।

(খ) ১ করি ৯:২৭ দ্রঃ।

(গ) ২ করি ১২:১০।

(ঘ) ফিলি ৩:১৩।

(ঙ) ১ রাজা ১৮:১৫ সত্তরী পাঠ্য।

৯ (ক) রো ৮:৩৫ দ্রঃ।

(খ) সাম ২৭:৩।

১৩ (ক) সাম ৬৮:১-২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সাম ১১৮:১০ সত্তরী পাঠ্য।

১৪ (ক) রো ৮:৩২।

১৫ (ক) আর্সিনোএ নামক খালটা আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে আনুমানিক ১৮০ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণে, অবস্থিত খাল; খালের অপর নাম 'কুমিরপুর'।

১৬ (ক) সাম ৯০:১০ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) ১ করি ১৫:৪২ দ্রঃ।

১৭ (ক) রো ৮:১৮।

(খ) উপ ৪:৮; ৬:২ দ্রঃ।

১৮ (ক) লুক ১৭:৭… দ্রঃ।

(খ) এজে ৩:২০; ৩৩:১২… ; ১৮:২৬ দ্রঃ।

১৯ (ক) রো ৮:২৮ দ্রঃ।

(খ) ১ করি ১৫:৩১ দ্রঃ।

২০ (ক) ফিলি ৩:১৩ দ্রঃ।

(খ) লুক ৯:৬২ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৭:২১।

(ঘ) যোশুয়া ২৪:২৩ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) মথি ৩:৩ দ্রঃ।

২১ (ক) যাকোব ১:২০, ১৫।

(খ) প্রবচন ৪:২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) এফে ৬:১২।

২২ (ক) ১ করি ১২:৭, ১০ দ্রঃ।

(খ) ২ করি ২:১১।

২৪ (ক) যোব ৪১:১০-১৩ সত্তরী পাঠ্য।

(খ) যোব ৪১:২৩-২৪ সত্তরী পাঠ্য।

(গ) যাত্রা ১৫:৯ সত্তরী পাঠ্য।

(ঘ) ইশা ১০:১৪ সত্তরী পাঠ্য।

(ঙ) 'সাদৃশ্য' : প্রাচীনকালীন গ্রীক দর্শনবিদ্যা অনুসারে বস্তুগত ও ধারণাগত সবকিছুর প্রকৃত নমুনা বা আদর্শ একপ্রকার স্বর্গে রয়েছে, এবং পৃথিবীতে বস্তুগত বা ধারণাগত সবকিছু হলো স্বর্গীয় সেই সবকিছুর 'সাদৃশ্য'।

২৬ (ক) হাবা ২:১৫ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) লুক ৪:৪১।

(গ) যুদা ৬ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ৫০:১৬।

২৭ (ক) সাম ৩৯:২-৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সাম ৩৮:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

২৮ (ক) যোহন ৮:৪৪।

(খ) সিরা ১:২৫।

(গ) ২ রাজা ১৯:৩৫ দ্রঃ।

২৯ (ক) যোব ২:৭; ১–২ অধ্যায় দ্রঃ।

(খ) মথি ৮:৩১ দ্রঃ।

৩০ (ক) লুক ১০:১৯।

৩২ (ক) ২ শামু ১৮:২৪।

৩৪ (ক) ২ রাজা ৫:২৬; ৬:১৭ দ্রঃ।

৩৫ (ক) কল ২:১৫ দ্রঃ।

(খ) মথি ১২:১৯ দ্রঃ; ইশা ৪২:২ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(গ) ১ করি ১:২৪।

(ঘ) লুক ১:১৩ দ্রঃ।

(ঙ) মথি ২৮:৫ দ্রঃ।

(চ) লুক ২:১০।

৩৭ (ক) মথি ৪:৯।

(খ) মথি ৪:১২।

৩৮ (ক) লুক ১০:২০ দ্রঃ।

(খ) মথি ৭:২২।

(গ) মথি ৭:২২ দ্রঃ।

(ঘ) সাম ১:৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(ঙ) ১ যোহন ৪:১ দ্রঃ।

৩৯ (ক) সাধু পলের মত (২ করি ১০–১২ অধ্যায় দ্রঃ) আন্তনিও নিজের কর্মকাণ্ড প্রত্যয়িত করেন ও সেইসঙ্গে বড়াই করার প্রলোভন এড়ান।

(খ) সাম ২০:৮।

(গ) সাম ৩৮:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪০ (ক) রো ৮:৩৫ দ্রঃ।

(খ) লুক ১০:১৮।

(গ) ১ করি ৪:৬ দ্রঃ।

৪১ (ক) সাম ৯:৭ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪৩ (ক) যোশুয়া ৫:১৩ দ্রঃ।

(খ) দানিয়েল ১৩:৫১-৫৯ অধ্যায় দ্রঃ।

৪৪ (ক) ‘কোন কর-আদায়কারী বিষয়েও অভিযোগ ছিল না’: বাস্তবিকই একসময় মরুপ্রান্তরে অপকর্মারাও পালিয়ে যেত ও তারাও পালিয়ে যেত যারা কর না দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত ছিল। কিন্তু এসময় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তরাই মরুপ্রান্তরে প্রত্যাহার করছিলেন।

(খ) গণনা ২৪:৫-৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৪৫ (ক) লুক ১২:২২, ২৯-৩১।

৪৬ (ক) মাক্সিমিনুস রোম সাম্রাজ্যের পুব অঞ্চলে ৩০৫ সাল থেকে ৩০৮ সাল পর্যন্ত ‘কায়েসার’ ও ৩০৮ থেকে ৩১৩ পর্যন্ত ‘আউগুস্তুস’ হন (টীকা ৮১ ক দ্রষ্টব্য)।

(খ) আন্তনি ‘নিজেকে তুলে দিতে ইচ্ছা করতেন না’, অর্থাৎ তিনি মণ্ডলীরই অভিমত সমর্থন করতেন যা অনুসারে মৃত্যুর হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া উচিত নয়। বাস্তবিকই সাধু পলিকার্পও নিজেকে তুলে দিতে অস্বীকার করেছিলেন ‘যেহেতু সুসমাচার এধরনের শিক্ষা দেয় না’ (প্রেরিতিক পিতৃগণ দ্রঃ)।

(গ) হিব্রু ১২:২৩। অবশ্যই, ‘সিদ্ধতায় উন্নীত’ হওয়া বলতে সাক্ষ্যমরণ বরণ করা বুঝায়।

৪৭ (ক) এই পিতর ৩০০ সাল থেকে ৩১১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁর শিরশ্ছেদ পর্যন্ত আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ হন; তিনি করাগারে থাকাকালেই বিশপ মেলেতিউস তাঁর ধর্মপ্রদেশ দখল করেন (৬৮ ক টীকা দ্রঃ)।

৪৮ (ক) লুক ১১:৯।

৪৯ (ক) ‘থেবাইসের উচ্চ অঞ্চলে’: সাধু আথানাসিউসের মতে সাধু আন্তনি দক্ষিণে, নীল নদের ধারে অবস্থিত প্রাচীন থেবেসের দিকে প্রত্যাহার করলেন।

(খ) ‘চারণভূমি’: চারণভূমিটা নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত।

(গ) ‘অভ্যন্তরীণ পর্বত’: সম্ভবত পর্বতটা হলো কল্‌জিম পর্বত যা আজকালেও ‘দের্‌ মার্‌ আন্তনিওস’ নামেও পরিচিত ও নীল নদ ও লোহিত সাগরের মাঝখানে অবস্থিত।

৫১ (ক) এফে ৬:১২ দ্রঃ।

(খ) সাম ১২৫:১।

(গ) যোব ৫:২৩ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

৫২ (ক) সাম ৩৫:১৬ দ্রঃ।

৫৫ (ক) প্রবচন ২৫:১৫ সপ্তরী পাঠ্য।

(খ) এফে ৪:২৬।

(গ) ২ করি ১৩:৫ দ্রঃ।

(ঘ) ১ করি ৪:৫; রো ২:১৬ দ্রঃ।

(ঙ) গা ৬:২ দ্রঃ।

(চ) ১ করি ৯:২৭ দ্রঃ।

৫৮ (ক) মথি ৯:২০ দ্রঃ।

(খ) 'সাক্ষ্যদাতা ও সন্ন্যাসী সেই পাফ্‌নুতিউস': পাফ্‌নুতিউস এই কারণে 'সাক্ষ্যদাতা' বলে অভিহিত যে, তিনি রোম সম্রাট মাক্সিমিনুসের আমলে ঘটিত নির্যাতনকালে (৪৬ অধ্যায় দ্রঃ) ডান চোখ হারিয়েছিলেন ও তাঁর বাঁ পা নষ্ট করা হয়েছিল। কেবল তাঁরাই 'সাক্ষ্যমর' বলে অভিহিত ছিলেন যাঁরা নির্যাতনকালে প্রাণ হারাতেন।

৬০ (ক) 'আমুন': আনুমানিক ৩৮০-৪৩৯ সালের খ্রিষ্টিয়ান লেখক কনস্তান্তিনোপলিসের সক্রেটিসের বিবরণ অনুসারে সন্ন্যাসী আমুনের অনুপ্রেরণায় মিশরে অবস্থিত নিত্রিয়া ও স্কেতে নামক পার্বত্য অঞ্চল দু'টোতে বহু মঠের উদ্ভব হয়।

(খ) মথি ১৪:২৮ দ্রঃ।

৬৫ (ক) এফে ২:২।

(খ) এফে ৬:১৩; তীত ২:৮ দ্রঃ।

(গ) ২ করি ১২:২।

(ঘ) ২ করি ১২:৪।

৬৬ (ক) যোহন ৬:৪৫ দ্রঃ।

(খ) ফিলি ৩:১৩।

৬৭ (ক) প্রবচন ১৫:১৩।

(খ) আদি ৩১:৫।

(গ) ১ শামু ১৬:১২ দ্রঃ।

৬৮ (ক) 'মেলেতিউস': ১০৫ খ্রিষ্টাব্দের নির্যাতনকালে আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ পিতরের অনুপস্থিতিতে লিকোপলিসের বিশপ মেলেতিউস আলেক্সান্দ্রিয়া মণ্ডলীর উপরে কর্তৃত্ব নিতে চেষ্টা করেন বিধায় মণ্ডলী দ্বারা নিন্দিত হয়ে সেই অঞ্চলের প্রশাস কর্তৃক পালেস্তাইনের

কনিতে নির্বাসিত হন; কিন্তু কনিতে থাকাকালে তিনি কারও অনুমতি ছাড়া ২৮জন বিশপ নিযুক্ত করেন; তাতে ৩২৫ সালে নিকেয়া ধর্মসভা তাঁকে দণ্ডিত করেন। কিন্তু তাঁর ভ্রান্তমত সম্পর্কে আজও তত স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই।

৬৯ (ক) 'বাণী সবসময়ই পিতার সঙ্গে সহ-অস্তিত্বমণ্ডিত': আরিউস-বাদীরা এমনটা সমর্থন করত যে, ঈশ্বরের পুত্র সেই বাণী পিতা ঈশ্বরের মত ও পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত ছিলেন না। সাধু আন্তনি নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র অনুসারে ঘোষণা করেন, ঈশ্বরের পুত্র সেই বাণী পিতা ঈশ্বরের মত ও পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে অনাদি ও অজনিত; অর্থাৎ তিনি প্রকৃত ঈশ্বর (ভূমিকায় উল্লিখিত নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্রের ঐশতাত্ত্বিক ভাষা অনুসারে, তিনি হলেন "পিতা থেকে, তথা পিতার সত্তা থেকে একমাত্র জনিত [পুত্র], ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, আলো থেকে আলো, প্রকৃত ঈশ্বর থেকে প্রকৃত ঈশ্বর; তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী")।

(খ) ২ করি ৬:১৪ দ্রঃ।

(গ) রো ১:২৫ দ্রঃ।

৭১ (ক) 'তিনি চলে যাচ্ছিলেন ও আমরা ...': এই 'আমরা' শব্দ থেকে অনুমান করা যায়, এসময়ে সাধু আথানাসিউস নিজেই ৩৩৭ বা ৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আন্তনির সঙ্গে ছিলেন।

৭৪ (ক) এক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য উপরে দেওয়া 'বাণীর মানবস্বরূপ-ধারণ' ১১–১৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(খ) 'প্রাণ হলো মনের প্রতিমূর্তি': এটা ছিল দার্শনিক প্লতিনুসেরই ধারণা।

৮০ (ক) ১ করি ২:৪।

৮১ (ক) আনুমানিক ২৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য অধিক প্রশস্ত হওয়ায় প্রশাসনিক সুবিধার্থে দু' ভাগে বিভক্ত হয়, তথা পুব ও পশ্চিম সাম্রাজ্য। পুব সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্তান্তিনোপলিস (বর্তমান ইস্তানবুল) যা বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত, ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইতালিতে অবস্থিত রোম। উভয় সাম্রাজ্যে দু'জন করে শাসক ছিলেন: প্রকৃত শাসক (বা সম্রাট) আউগুস্তুস বলে অভিহিত ছিলেন, ও তাঁর সহকারী শাসক কায়েসার বলে অভিহিত ছিলেন; তাই কনস্তান্তিনোপলিসে রাজত্ব করতেন একজন আউগুস্তুস ও একজন কায়েসার, ও রোমে রাজত্ব করতেন একজন আউগুস্তুস ও একজন কায়েসার। আউগুস্তুসের মৃত্যুতে কায়েসার যিনি, তিনি আউগুস্তুস পদ গ্রহণ করতেন।
সেই অনুসারে, কনস্তান্তিনুস ৩০৬ সাল থেকে ৩০৮ সাল পর্যন্ত কনস্তান্তিনোপলিসের কায়েসার হিসাবে, ও ৩০৮ সাল থেকে ৩৩৭ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস হিসাবে রাজত্ব করেন; কনস্তান্তিনুসের প্রথম ছেলে কনস্তান্তিউস ৩২৪ সাল থেকে ৩৩৭ সাল পর্যন্ত কায়েসার হিসাবে, ও ৩৩৭ সাল থেকে ৩৬১ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস হিসাবে রাজত্ব কেরন; ও কনস্তান্তিনুসের দ্বিতীয় ছেলে কনস্তান্ত ৩৩৩ সাল থেকে ৩৩৭ সাল পর্যন্ত কায়েসার হিসাবে, ও ৩৩৭ সাল থেকে ৩৫০ সাল পর্যন্ত আউগুস্তুস হিসাবে রাজত্ব করেন। সুতরাং, কনস্তান্তিউস ও কনস্তান্ত

দু'জনে ৩৩৩ সাল থেকে কায়েসার হিসাবে, ও ৩৩৭ সাল থেকে আউগুস্তুস হিসাবে একসাথে রাজত্ব করেন।

(২৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে রোম সাম্রাজ্যের শাসকগণ 'আউগুস্তুস কায়েসার' নাম গ্রহণ করে রাজত্ব করতেন সেই ইউলিউস কায়েসারের স্মরণে যিনি খ্রিঃপূঃ ৪৫ সালে রোমের একমাত্র শাসক পদ গ্রহণ করেছিলেন ও আপন উত্তরসূরী হিসাবে নিজের ভাগ্নে অক্তাবিয়ানুস আউগুস্তুসকে মনোনীত করেছিলেন। রোমের সেই শাসকগণ সেই অক্তাবিয়ানুস আউগুস্তুসের স্মরণেও 'আউগুস্তুস কায়েসার' নাম গ্রহণ করতেন যিনি খ্রিঃপূঃ ২৭ সালে রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিজের নাম ছাড়া নিজের মামা ইউলিউস কায়েসারের স্মরণার্থে 'কায়েসার' নামও নিয়েছিলেন, তথা 'আউগুস্তুস কায়েসার'। খ্রিঃপূঃ ২৭ পূর্বে রোমের শাসকগণ অন্য নাম গ্রহণ করতেন)।

(খ) হিব্রু ১:২ দ্রঃ।

৮২ (ক) দা ৪:১৬ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(খ) সেরাপিওন ৩৪০ থেকে ৩৬০ সাল পর্যন্ত নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত থ্‌মুইস শহরের বিশপ ছিলেন।

৮৩ (ক) মথি ১৭:২০।

(খ) যোহন ১৬:২৩।

(গ) মথি ১০:৮।

৮৪ (ক) মথি ৭:২ দ্রঃ।

৯০ (ক) এখানে মিশরের প্রাচীনকালীন ঐতিহ্যের দিকে তথা মমিকরণ প্রক্রিয়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয় যা পৌত্তলিক ও খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যো প্রচলিত ছিল অর্থাৎ, মিশরীয়রা মৃতব্যক্তির দেহ মমিকৃত করার পর মমিটাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটা ঘরে বসাত। সাধু আন্তনি তেমন ঐতিহ্যগত প্রথার বিরোধী।

৯১ (ক) পাল্লাদিউস-লিখিত 'লাউসীয় ইতিহাস' অনুসারে সেই দু'জন সন্ন্যাসীর নাম ছিল মাখারিওস ও আমাতুস।

(খ) যোশুয়া ২৩:১৪ দ্রঃ।

(গ) লুক ১৬:৯।